P 36131

COR-H04963-11-P36131

মোহনলাল।

কিছুদিন হইল, আমি "নবজীবনে" "বঙ্গে ইংরেজাধিকার" এই শিরোনামা দিয়া, কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধমালা শেষে স্বপ্রণীত "ভারত-গৌরব" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্যস্থাপন-প্রসঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, আমি উক্ত প্রবন্ধমালায় সেইরূপ পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এখন অনেকানেক লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, এক জন অতীতদর্শী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়া, প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। সিরাজের চরিত্র এখন যে ভাবেই চিত্রিত হউক না কেন, উহার একাংশে যে কলঙ্কের কালিমায় সমাচ্ছাদিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিরাজ ভরুণবয়স্ক যুবক। সুশিক্ষায় তাঁহার হৃদয় গঠিত হয় নাই, দূরদর্শনে তাঁহার বিচারশক্তি বলবতী হইয়া উঠে নাই, স্থিরতায় ও গাম্ভীর্য্যে তাঁহার সকল কার্য্যেরও সুশৃঙ্খলা ঘটে নাই। এই অপরিণতবুদ্ধি, অদূরদর্শী ও অস্থিরপ্রকৃতি যুবক যে ইংরেজের সহিত ব্যবহারে অনেক স্থলে ভ্রান্তি-মার্গের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়। তাঁহাতে অনেক গুণ সমাহিত ছিল, কিন্তু সুশিক্ষা ও চিত্তসংযম সহায় না হওয়াতে, তৎসমুদায় অধিকাংশে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি যদি সুশিক্ষিত সংযত-চিত্ত ও সুপথে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল, সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হইত। অকবর যে বয়সে সাম্রাজ্যশাসনে উদ্যত হয়েন, সিরাজও সেই বয়সে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করেন। বয়সের সমতা থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু বৈষম্য ছিল। কথিত আছে, যৌবনে অকবরের চরিত্র তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল না। অকবর ক্রোধী ও অসংযতচিত্ত ছিলেন। তিনি উপর্য্যুপরি সর্দারদিগকে হস্তীর পদে দলিত করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আদেশে এক জন সর্দারকে হস্তীর পদের সহিত শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া, বাহিরের রাজপথ দিয়া, লইয়া যাওয়া হয়। তিনি ক্রোধের আবেগে এক জন সামান্য ভৃত্যকে সামান্য অপরাধে প্রাসাদের উচ্চ চূড়া হইতে নীচে ফেলিয়া দেন। খোসরোজের উৎসব করিয়া তিনি নীতিশূন্য উদ্দাম চরিত্রের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন

নাই। তিনি রাজা মানসিংহকে মর্ত্যলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিষাক্ত মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন; শেষে ভ্রমক্রমে সেই মোদক স্বয়ংই নিজেই সাংসারিক ভোগসুখের ক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হয়েন। এরূপ হইলেও, সম্রাট্ অকবর ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার সৌম্য প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি মরু প্রান্তরে জন্মগ্রহণ করেন; ঘোরতর দুর্দশার মধ্যে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। এই দুর্দশা তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত পরিচিত করিয়া তুলে। এবং কষ্টসহিষ্ণুতার বলেই তাঁহার অপরিমীম সৌভাগ্যের উদয় হয়। সিরাজউদ্দৌলা কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হয়েন নাই। অত্যাদর ও অতিস্নেহে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বিলাসস্রোতে ভাসমান হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল ভাবের একশেষ প্রদর্শন করেন। সিরাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এই আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেকগুলি লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ ও ফিরঙ্গীদেশীয়গণ উভয়েই এসময়ে আপনাদের অদৃষ্টের পরীক্ষার জন্য এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছিল। উভয়েই আপনাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের আশা সমভাবে ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ আপনার বুদ্ধিকৌশলে রত্নসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন; অন্যদেশীয়গণ ইহাঁদের সহিত মিলিয়া কত দূর ন্যায়পরতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সহৃদয় ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য। আলালের ঘরের দুলাল আপনার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করিতে পারেন, অপরিণত বয়স, অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অসৎসংসর্গের বিষয় বিচার করিলে, তাঁহার এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কিয়ৎপরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ইংরেজ পুরুষ এই আলালের সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকাল কলঙ্কপঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়া থাকিবেন। এ বিষয়ে ইংরেজ যেমন কলঙ্কিত হইয়াছেন, অন্যদেশীয়গণও সেইরূপ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই এক জন আপনাদের অপূর্ব্ব প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দুই এক জনের নিষ্কলঙ্কতা নিবিড় তমোরাশির পূর্ণাঙ্ক স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়াছে। আবুল কজেল, তোড়ল মল্ল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ অক-

হইয়া। তিনি এইরূপ অপমানসূচক আদেশে এরূপ অসন্তুষ্ট হইলেন যে, সরাসরি সিরাজের নিকট গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সদাগরি কর্ম্মেই কিছু দিন লিপ্ত রহিলেন।

এ দিকে মোহনলাল নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। যদি পাণ্ডিত্য, বা বুদ্ধিমত্তা অবলম্বনস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে উন্নতপদযুক্ত অসামান্য প্রতাপ ও ক্ষমতা সহসা লোকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। মোহনলালেরও এইরূপ মতিভ্রম ঘটিল। অনুরাগীর অনুগ্রহে মোহনলাল উচ্চপদ লাভ করিয়া অসঙ্কুচিতভাবে আপনার ক্ষমতার পরিচালনায় উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার আত্মীয় স্বজন ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ অপসারিত হইলেন। মুতাক্ষরীণকার সৈয়দ গোলাম হোসেন একটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিযোজিত ছিলেন। মোহনলাল তাঁহাকে কহিলেন, তিনি যদি মাসিক দুই শত টাকা বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নবাব-সরকারে থাকিতে পারেন, নচেৎ তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। তেজস্বী গোলাম হোসেন সম্মত হইলেন না। তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থ মক্কার যাইবার ছল করিয়া হুগলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কের রেখাপাতে কালীময় হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু মোহনলাল গর্ব্বিত এবং আত্মম্ভরী হইলেও, বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। প্রভুভক্তিতে তিনি অবিচলিত ছিলেন, প্রথমে বিশ্বস্তভাবে তিনি কর্ত্তব্য-পথে অটলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রতিপালকের হিতকামনায় তিনি সর্ব্বক্ষণ সংযত ভাব, একাগ্রতা ও যত্নের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। যে বিপুল ষড়যন্ত্রের অভিঘাতে সিরাজের অধঃপতন হয়, মোহনলাল তাহার মধ্যে ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই ক্লাইভ ও প্রীতির সহিত মীরমদন ও মোহনলালের বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় বীরপুরুষই সেই দোরতর বিপত্তিময় স্থলে সেই কুচক্রিগণের অপূর্ব্ব চক্রান্তজালের বিকাশক্ষেত্রে হতভাগ্য সিরাজের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, মীরমদন চক্রান্তকারীদিগের কুপরামর্শে একবার বিচলিত হইয়াছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখন কর্ত্তব্যপথে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। শেষে তিনি আপনার অসাধুভাবের দমন করেন। কিন্তু মোহনলালের চরিত্র এ বিষয়ে যেরূপ বলবৎ, সেইরূপ

বরের প্রাধান্য ও গৌরব অব্যাহত রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীজাফর্, জগৎশেঠ, মহাতাব্‌চাঁদ প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারিগণ সিরাজের পার্শ্বে থাকিয়াই, বিশ্বস্ততার ভাণ করিয়া, অবিশ্বস্ত ভাবের একশেষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সিরাজের পার্শ্বে আর এক জন ছিলেন। ইনি বিশ্বস্ততায় বিসর্জ্জন দেন নাই, প্রভুভক্তির অবমাননা করেন নাই, আত্মসুখবৃদ্ধির আশায় পরদেশীয়েরও শরণাপন্ন হয়েন নাই। এই প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মোহনলাল।

"রেয়াজ্‌স্ সলাতিন" নামক গ্রন্থে মোহনলালের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এখন তৎসম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। সলাতিন-কার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোহনলাল কায়স্থ ছিলেন। তিনি যে সিরাজের হস্তে আপনার ভগিনী সমর্পণ করিয়াছিলেন, সলাতিনে তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। সিরাজ্ যখন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তখনও মোহনলাল তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার প্রতি অনুরাগ ক্রমে-বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিরাজ্ মোহনলালের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু অনুরাগের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি অসমীক্ষ্যকারিতা প্রকাশ করেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কম ছিল। তিনি যদি প্রিয়পাত্রের পদগৌরব বুঝিয়া, অনুরাগের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে কাহারও বিরক্তি জন্মিত না। কিন্তু আলাদের ঘরের দুলাল অপরিণামদর্শী ছিলেন। তিনি সহসা হইয়া মোহনলালকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দিয়া বহুসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন, এবং দরবারের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তৎপ্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। কেহ কেহ এই আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। কিন্তু মীরজাফর নবাবের আদেশপালনে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নবাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় হইতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি নবাবের প্রধান আত্মীয়, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। মোহনলালের ন্যায় একজন সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁহার নিকট নিরতিশয় অবমাননাজনক বলিয়া বোধ

উজ্জ্বল। মোহনলাল কখনও প্রভুপরায়ণতায় বিসর্জ্জন দেন নাই। প্রভুর অনিষ্টজনক কর্ম্মসাধনে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বক্ষণ অটল, অপরাজেয় ও অনমনীয় ছিলেন। কথিত আছে, বড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াই তিনি নবাবকে মীরজাফরের প্রাণনাশের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মীরজাফর নিহত হইলে আর কেহ ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তদীয় প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে সাহসী হইবে না। কিন্তু নিয়াজ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। মীরজাফরের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে তাঁহার অভিরুচি হয় নাই। অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণমতি যুবকের এইরূপ সদাশয়তা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। এ স্থলে কলঙ্কলিপ্ত মীরজাফরের পার্শ্বে সিরাজের উজ্জ্বলতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

রেয়াজস্ সলাতিনে মোহনলালকে যে ভাবে দেখা যায়, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। মোহনলালের শত অপরাধ থাকিতে পারে, কিন্তু যে গুণ মানবহৃদয়ের একটি প্রধান ভূষণ, মোহনলালের হৃদয় সেই গুণে অলঙ্কৃত ছিল। মোহনলাল সেই গুণেই সহৃদয়সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কলিকাতা-ওয়ালারা, হুগলী-তট-বাসীরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালার (উত্তর-বাঙ্গালারও বটে এবং দক্ষিণ-বাঙ্গালারও কোন নয়?) বাঙ্গালে কথা শুনিয়া যে হাসেন—বাঙ্গালে কথা লইয়া যে বিদ্রূপ করেন, সেটা তাঁদের আত্মাভিমানের, অজ্ঞতার, অথবা কূপমণ্ডূকত্বের ফল। নহিলে, কলিকাতার 'কক্‌নী'র কথা যদি বাঙ্গালা কথা হয়, কর্ণফুলীর ও মেঘনার মাঝীদের কথাও বাঙ্গালা কথা বটে। একের কথা অপরের কর্ণে যেমনই বাজুক,—একের কথা অপরের কাছে যতই অবোধ্য হউক, উভয়েরই এক ভাষা বই দুই ভাষা নয়। পরন্তু, কলিকাতার কক্‌নী ও কলিকাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি বাঙ্গাল না-হন, তবে ঢাকা চাটগাঁর অজগাড়াগেঁয়েরাও বাঙ্গাল নয়,—অন্ততঃ বেভাল বাঙ্গাল নয়। চাটগাঁ যদি বাঙ্গাল হয়, চুঁচুড়াকেও বাঙ্গাল বলিতে বাধা কি? কথার আওয়াজ ও উচ্চারণটা আসলে আর কিছুই নয়, কেবল কাণের অভ্যাস ও মনের খট্‌কা। যে আওয়াজের ও যে উচ্চারণের কথাটা বা কথাগুলা যাহারা চিরকাল, আজন্ম শুনিয়া আসিতেছে, সেই আওয়াজ ও উচ্চারণই তাদের

ইহাদের ভাল লাগে, মিষ্ট লাগে, উপযুক্ত বোধ হয়। তাহার বিপরীত হইলেই প্রায়, অবোধ্য ও বিসদৃশ বোধ হয়। অতএব বলা অতিরিক্ত যে, কাজা হাংড়া হুগলী চুঁচুড়াই যে চাটগাঁ, চাঁদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালীর লোক আসিয়াছে, হাস্য-রস-অবতারণার অধিকার পাইয়া অহরহ সেই অধিকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নয়। সে অধিকার ও অধিকারের ফল ও ব্যবহার—দুই দিকেই সমভাগে বিভক্ত। নোয়াখালি চাটগাঁর, চুঁচুড়ার, নদে শান্তিপুরের, নৈহাটী হালিসহরের অধিবাসীরাও হাংড়া কলিকাতা অঞ্চলের কথা শুনিয়া হাস্য-রসে ভাসে, অভিনয় করে।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক একাকী এ অঞ্চলে আসিলেই বুঝিতে পারিতেন, এ কৌতুক কি? উপস্থিত লেখক নিজে সম্প্রতি সে কৌতুকের বিষয়ীভূত। কেবল কৌতুকের বিষয়ীভূত নয়, মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্টে ক্লিষ্ট। এ পক্ষের উচ্চারিত সভ্যজনানুমোদিত বাক্যাবলী এ অঞ্চলের ইতর শ্রেণীর একান্ত অবোধ্য। তাহার একরতি ইহারা বুঝে না; শুনিয়া বিস্মিত হয়, মনে মনে বিদ্রূপ করে। নাস্তি করে বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। তাদের পুরুষ "গোঁয়ারা" পশ্চাতে যাইয়া হাসে। কিন্তু, "মাইয়ে-গোঁয়ারা" মুখের উপরেই মর্ম্মান্তিক মধুর হাসি হাসিয়া দুই পার্শ্বে "সারক্যাষ্টিক্" কটাক্ষ রাখিয়া যায়। আমরা যেন যথার্থই একটি জানোয়ার, কলিকাতার 'জু' হইতে বে-অব-বেঙ্গলের জঙ্গলে পলাইয়া আসিয়াছি।

মনে হয়, কেন হায়! বাঙ্গাল হইলাম না, কেন আজন্ম বাঙ্গালে কথা শিখিলাম না। এখন শিখিতে চেষ্টা করি, কত কসরত করি। কিন্তু, একে আর হইয়া যায়। তাহাতেও লোকে হাসে, হাততালি দেয়। ইচ্ছা হয়, 'বে-অব-বেঙ্গলে' ঝাঁপ দিই। দোভাষী দ্বারা বিষয়-কর্ম্মই চলে। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য, সামাজিকতা ত আর চলে না। প্রণয় প্রেমের ব্যাপারেও দোভাষীর দোটানা তরজমায় চলে না। কিন্তু সংসারে সে সবই ত আছে।

ফলতঃ আমার কথা যতই মার্জ্জিত, মোলায়েম, সভ্য, সুন্দর এবং সাধু ভাষা ও সংস্কৃতসৌরভিত হউক, এখানে—এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ইহা নিষ্ফল। অতএব কুৎসিত। নিষ্ফল, কেন না ইহা কেহই বুঝে না। ইহা কেহই বুঝে না, কাজেই ইহা তাহাদের কাহারও কাণে ভাল শুনায় না, ইহা কাহারও মনে ধরে না। কাজেই আমার কথা ইহাদের কাছে কুৎসিত। যাহা নিষ্ফল, তাহাই সুন্দর; যাহা নিষ্ফল, তাহাই কুৎসিত।

সফলতাতেই সৌন্দর্য্য! নিষ্ফলতাই অসুন্দর, কুৎসিত। utilityতেই beauty; unutilityতে ugliness। ইহা অগ্রে কেবল কেতাবে পড়িয়াছিলাম। অধুনা কার্য্যক্ষেত্রে গায়ে পড়িয়া বুঝিতেছি।

কিন্তু, পুনর্ব্বার এ পক্ষ বিষয়ের বাহিরে, ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পঞ্জীর তিথি নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহগণ হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

"সাহিত্য"-পত্রের 'টু-দি-পয়েণ্ট'-প্রিয় সম্পাদক-যুবক নিশ্চয়ই এ পক্ষের মস্তিষ্কের উপরে অকাল-ভীমরতির আবির্ভাবের আভাস দিয়া, আন্তরিক বেদনা-পূর্ণ আক্ষেপপত্র পাঠাইবেন! কিন্তু, প্রিয় সম্পাদক, তুমি আপাততঃ তাহা না পাঠাইয়া যদি প্রলোভন সংবরণ করিতে পার, তবে, বাহিরের বাজে বাক্যগুলা বরং মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইও না। অথবা তোমার প্রেসের প্রেতবর্গকে কহিয়া দিও, এ পক্ষের প্রলাপগুলাকে পঞ্জীকৃত করিয়া দেয়;—যদিও তাহা পঞ্জিকা বই গঞ্জিকা নয়।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী লইয়াই বড় বড় বিশারদদের বিষম বিবাদ;—বাঙ্গালা ভাষা ত তাহার পরের পর্য্যায়! পঞ্জিকা-কার অগ্রে বল, আদি বঙ্গ কোথায়, মূল বাঙ্গালী কে? তাহার পর গণিয়া কহ, কোন জাতির বাগ্‌-কোষে বাঙ্গালা ভাষার বীজ ছিল ও কাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে বাহির হইয়াছিল?

অদ্যকার সম্মার্জ্জিতা, সংস্কৃতশব্দালঙ্কারশোভিতা, বিলাতি-'ইডিয়ম'-ভূষিতা-সারিকা বিধুমুখীর বীজ, দ্রাবিড়ীয়, কোলীয়, সাঁওতালীয়, বা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত?

কাঁঠালপাড়ার পুরাণ পাঁজীর মতে, শ্রীমতী সংস্কৃত হইতে উত্থিতা বা সংস্কৃতের গর্ভজাতা; অতএব প্রাকৃতের কন্যা নহেন, কনিষ্ঠা ভগিনী। কেহ কহেন কন্যা, কাহারও মতে কনিষ্ঠা ভগিনী! অতি রমণীয় সম্বন্ধনির্ণয় বটে!

কাঁঠালপাড়ার মতে, আর্য্য ঠাকুরেরা এ দেশে আসিয়া এদেশীয়দিগকে আর্য্য-কৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং এদেশীয়দের অনার্য্যবঙ্গমাত্রই এক গণ্ডূষে উদরস্থ করিয়া, আর্য্যপক্ষ পদার্থ দ্বারা অনার্য্য-(বঙ্গ?)-ভূমি পরিপূরিত করিয়াছিলেন। অনার্য্যদের আদিম (বাঙ্গালা?) ভাষাটাও সেই গণ্ডূষে তাঁহাদের উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃতাত্মিকা বা সংস্কৃতাত্মজা বাঙ্গালা দেবী, তাহার (শূন্য?) তক্তে বসিয়াছিলেন। অতএব তিনি অনার্য্যা নহেন; আর্য্যা—খাঁটী আর্য্যা।

প্রমাণ, বঙ্গালঙ্কার, বাক্যের ছটা,—ক্রিয়াকর্ম্মের ঘটা—কি নয়? পোশাক,

ডেস্কপত্র, এষ্টেট, আসবাব, সবই ত আর্যপেক্ষ—সুমার্জ্জিত, সংস্কৃত-সুবাসিত। ইহার অস্থি মজ্জা শিরা ধমনী, সবই ত সংস্কৃত। তবে, পেটের ভিতর, পেটরার ভিতর, সিকের উপর, কুলুঙ্গির ভিতর, ধামা চাপা, সরা চাপা, চালের নাতায় গোঁজা, হাঁড়ায় বাঁধা, উনুনের পিঠে, বালিসের নীচে, জানালার খোপে, ভোলকের তলে, লেপের খোলে, ঢেঁকির গড়ে, ধুচুনীর ঘড়ে, কুলোর মাঝে, কুলার গায়, খুন্তীর খোঁপায়—এখানে ওখানে সেখানে যে ঐ বা তা কত কি সব অসংস্কৃত রকমের দেখিতে পাও,—ওগুলো কিছু নয়। উহারা "দেশজ",—অতিশয় ইতর কথা। বঙ্গভাষার এখন এমন রূপ যে, উহাদের নাম করিতে লজ্জা করে। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে?

যেখান থেকেই আসুক, ওগুলা আজও খুব গুলজার। আদিম অষ্ট্রোয় আর্য্য গণ্ডূষ, বোধ করি, উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাই আজও আছে। তারপর, এ আর্যদের এঙ্গলো-আর্য্য পিয়ালার পৌনঃপৌনিক "পেগ্"ও উহাদিগকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না। তাই, বোধ করি, বরাবরই থাকিবে।

যাহা দেশজ নয়, তাহা নিশ্চয়ই বিদেশজ। অতএব সংস্কৃত বিদেশজ; ফারসী, উর্দ্দু, আরবী, ইংরেজী, স্পেনিশ, পোর্টুগিজ প্রভৃতিরই মতই বিদেশজ; বলা বাহুল্য, এ স্থলে আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্বের কথা নয়;—ভাষা-ভগিনীদের 'এরিয়ান্' ও 'সেমিটিক' বংশত্ব বাদ দিয়াই এখানে কথা। এ স্থলে দেশজ বিদেশজেরই কথা। বিদেশজ মহাশয় বা মহাশয়ারা, বোধ হয়, বাঙ্গালা নহেন,—নিশ্চয়ই বাঙ্গালা হইতে পারেন না। আরবী, ফারসী, ইংরেজী, অথচ বাঙ্গালা নয়। অতএব বিদেশজ সংস্কৃতও বাঙ্গালা নয়। সংস্কৃত বা তাহার আত্মজ বা অপভ্রংশ। বাঙ্গালা তবে বিদেশজ না হইয়া দেশীয় কেন, বাঙ্গালা কেন, বাঙ্গালা কিসে, বাঙ্গালা কবে হইতে? পঞ্জিকাচার্য্যদিগকেই প্রশ্ন করিতেছি।

বিদেশজ মহাশয়রা বা বিদেশিনী ঠাকুরাণীরা আগে অবশ্য এ দেশে কেহই ছিলেন না। থাকিলে আর বিদেশজ হইবেন কেন? তাঁরা ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছেন। কেহ বসবাস করিতে, কেহ ব্যবসা করিতে, কেহ বশীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতে কেহই আসেন নাই। মারিতে, মথিতে, দংশিতে, দলিতে, শাসিতে, শোষিতে,

উজড়াইতে, উপড়াইতে আসাই অনাবিকপরিমাণে সকলের উদ্দেশ্য ছিল। আজ ইংরেজেরা যদি শাসিতে ও সভ্য করিতে আসিয়া থাকেন, আদিম আর্য্যেরাও এখানে এসেছিলেন তাহাই করিতে, এবং করিয়াছিলেনও তাহাই। তাঁদের শাসনে এবং সভ্যকরণে, বশীকরণে ও আর্য্যকরণের পেষণে, দেশীয়দের আদিম ও অপ্রাপ্তিবিকাশ ভাষাটি পর্য্যন্ত পঙ্গুত্ব পাইয়াছিল। এবং তাহার পদ অধিকার করিয়াছিল আর্য্য সভ্যতার সন্তান—সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিকৃতি। জিজ্ঞাস্য, সেই ভাষার সেই বিকারই কি বাঙ্গালা?

—যদি তাহাই হয়, সংস্কৃতের প্রাকৃতের সেই বিকারের নাম বাঙ্গালা হইল কেন? তাহার নাম গৌড়ী, পৌণ্ড্রী, রাঢ়ী বা আর কিছু হওয়াই ত উচিত ছিল। হইলেও পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালভূমির নামে তাহা বিশেষিত, পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুরের বলবীর্য্যে—রাজসম্মানের খাতিরে কি? কিন্তু, বিক্রমপুর ত বড় বেশী দিনের নয়। বিক্রমপুরের বহু পূর্ব্বেই ত উহার জন্ম। তখন ও তাহার পরেও ত পূর্ব্বাঞ্চলের ন্যায় পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ খণ্ডেও স্বতন্ত্রপ্রধান স্বাধীন রাজা ছিলেন। অতএব উক্ত বিকৃতির বাঙ্গালা নাম হইল কেন? তাঁহার ইতিপূর্ব্বে উহার আর কোন নাম ছিল?

দেখা যাইতেছে, যাহাকে ও যাহাদিগকে লইয়া এখনকার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালী ভাষাবিদ্ যাঁরা এবং যাঁহাদের এখন একাধিপত্য, একছত্রত্ব, তিনি নিজে বাঙ্গালী নহেন; তাঁদের কেহই বিশুদ্ধ বাঙ্গালী নন। তাঁহারা সকলেই প্রবাসী বা উপনিবেশী, বা ভাগ্যপরীক্ষাপরায়ণ ভবঘুরে পর্য্যটক। তৎসকাশে এই অনার্য্য ভূমে সংস্কৃত স্বয়ং সবিশেষ ভাবে তৎপর্য্যায়ভুক্ত। তিনি নিজে বিদেশজ; তবে কি "দেশজ" বলিয়া আজও এ দেশে যে কতকগুলি কথা চলিত আছে, যাহাদিগকে সংস্কৃত-চঞ্চু ও সাধুভাষী ভট্টাচার্য্যগণ, ইতর, গ্রাম্য, অন্ত্যজ বা অশ্লীল বলিয়া উপহাস করেন, তাহারাই কি আদিম কালের আসল বাঙ্গালা? দেশজগুলিই কি মৃত ও বিলুপ্ত বাঙ্গালার ভগ্নাবশেষ?

পরন্তু এই "দেশজদের" দেশ কোথা? পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গাল রাজ্য, এখন তাহাও ত ঠিক বলিতে পার না। পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সব দিকে ত "দেশজ" আছে; সাধারণ দেশজ আছে; তা ছাড়া এক একটি প্রদেশের স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ "দেশজও" আছে। সবই এখন ঢালোয়া বাঙ্গালা বটে।

পূর্ব্ববঙ্গই যদি বঙ্গ, বাঙ্গালরাই যদি বাঙ্গালী, "মোরাই" যদি সাধের বাঙ্গালা হয়, তবে পূর্ব্ববঙ্গে, বাঙ্গালের মধ্যেই (বাঙ্গাল কিনা এখন আর নাই; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে লোপ হইয়া গিয়াছে) বেশী বৈ বেশী থাকা উচিত। কিন্তু, তা নয়। বাঙ্গালদের ভিতর সংস্কৃত অবশ্য বিস্তর আছে; কিন্তু পূর্ব্বই যে বেশী আছে, তা নয়। অন্ত অঞ্চল অপেক্ষা বেশী নাই। বরং বাঙ্গালদের মধ্যেই সংস্কৃতের ও সাধুভাষার বাড়াবাড়ি বেশী। চট্টগ্রামে অতি ইতরশ্রেণীর লোকেরাও সচরাচর কথোপকথনে বলে—"সেবা বস্ত", "জরা ন", "ভাও," "আই" ইত্যাদি সন্ধিসমাসযুক্ত আরও অনেক আনকোরা সংস্কৃত কথা। বিভক্তি ও ক্রিয়া পদাদিতেও সংস্কৃতের ঘুণপোকা ঢুকিয়া পড়ে। "দিয়ম", "খায়ম", "দিবাম", "পাঠাইবাম", "ন দিয়ম" ইত্যাদির মত চলন।

ঠাকুরাণীর ঠাটের কাঠামের অঙ্গের, আভরণের পোণে ষোল আনা আজও সংস্কৃত বটে। অতএব সংস্কৃত রূপেই যে ইনি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, ইহা বড় বিচিত্র নয়। ঠাকুরমাদিগের পুরাণ পাঁচিতে দেখা যায়, পল্লীকর্ত্তা প্রত্যেকের উপর খড়ি পাতিয়া প্রত্যেকের বই গণনা করিয়াছিলেন। অতীতের গণনা আজও কেহ করিয়াছেন কি? উক্ত পঙ্ক্তিকায় বাঙ্গালা ভাষার অপর একটি অনার্য্য মূল কল্পিত হইয়াছে গণিত হয় নাই। সে মূল ক্রিকল্প, সেই মূলই কি আসল ও আদি মূল নয়? কিন্তু হায়! আর্য্য মহাপ্রভুরা সে মূল প্রায় উৎপাটন করিয়া ছাড়িয়াছেন। লৌকিক উপরে সংস্কৃতের এবং সাধুভাষার এতটা আধিপত্য কি আদি কাল হইতেই এইরূপ? আদি কাঠামখানা কি একেবারেই অপ্রাপ্য? কোন্ তৃণ কাহারা কাঠামে প্রস্তুত করিয়াছিল? ভাষার তৃণ কবে সাহিত্য ভরী হইয়া ভাসিয়াছিল? আর্য্যরা আসিয়াই ভাসাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তরীও তিনি গড়িয়াছিলেন বটে। কিন্তু, অনার্য্য তৃণ কি একেবারেই স্পর্শ করেন নাই? অথবা আর্য্যতরীর তলদেশ-তুকালে অনার্য্য তৃণ অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছিল? একই দিনে ভাসাইয়াছিল, অথবা ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছিল? অথবা একই সঙ্গে ভাসিয়াছিল; তার পর অনার্য্য-দেবতা আর্য্য-তৃণ অশুচি অপবিত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। অথবা যোগের উদ্বর্ত্তন ও অপযোগের বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাহারা মারা গিয়াছে?

অনার্য্য তৃণ ত্যাগ করিয়া আর্য্যতরীতেই উঠি। তরী ত বহু যাত্রাতেই

আসিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ-যাওন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মাগধ দেশী ও বিদেশী শব্দরাশি। বহু ভাষার তদ্ভব রূপও বহু বটে। সকল রূপই কি সংস্কৃতসন্নিবাসিসমুদ্ভাষারূপ? অনার্য্য যামন সাক্রিম আমল। আদি অনার্য্য আমলের রূপ কিরূপ ছিল? তার পর তার বহু পর বৌদ্ধ আমলে? পুনর্ব্বার হিন্দু আমলে? তার পর মুসলমানী বাদশাহী আমলে? তখনও সবই কি সংস্কৃত মূর্ত্তি?

আর বাদশাহী আমল। বাদশাহী আমলের—পাঠান আমলের, মোগল সাহিত্যের Renaissance; ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়া গিয়াছেন "রোশ্‌নি";—পাঠানী আমলে বাঙ্গালা কাব্যে বৈষ্ণব রোশনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল বটে। বৈষ্ণব ঠাকুরেরা নারায়ণী রসকলির "হরেকেষ্ট" ব্রজবুলির মৈথিলীর মাখন গালিয়া, মধু ঢালিয়া, অমিয়া ছানিয়া, লেহি লিহড়াইয়া, অতি উপাদেয় পীযূষের এক অপূর্ব্ব প্রবাহে রস-প্রেমের ময়ূর-পঙ্খী ছুটাইয়াছিলেন। সে চমৎকার রোশ্‌নি বটে। কিন্তু সেই বৈষ্ণব গীতের সবগুলি কি বাঙ্গালা? না পাঁচমিশালী? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিভক্ত বিদ্যাপতি কি বাঙ্গালা? বাঙ্গালীর বাঙ্গালা? বাঙ্গালার বাঙ্গালা? আদপেই বাঙ্গালা? গোবিন্দ দাসের গীত কি বাঙ্গালা? বাঙ্গালীর বোধ, হিন্দি, উর্দ্দু, মারহাঠী, মৈথিলী যদি বাঙ্গালা হয়, তবে বাঙ্গালীর সেধা ইংরেজীকেও বাঙ্গালা বলিতে বাধিবে না। সেবার "নিছনি" লইয়া বহু পাঁচমিশালি গান হইয়াছিল, কিন্তু সে শব্দটা কোথাকার, তখনকার, কোন ভাষার, ওস্তাদী ও পাগরেদী দলের কেহই কিন্তু অনভিজ্ঞ দর্শক ও শ্রোতাদিগকে বুঝান নাই। যাহা হউক, বৈষ্ণব রোশনির নিছনিটুকুকেও যদি জোর করিয়া একান্তই বাঙ্গালা বলিতে চাও তবুও সে বাঙ্গালারও পৌণে ষোল আনা সংস্কৃত নয়।

কিন্তু বৈষ্ণব রোশনির ভাষা যে ভাষাই হউক, তাহা কুঞ্জকুটীরের ভাষা, ক্রীড়াকদম্বের ভাষা, নায়কনায়িকার কাণে কাণে কথোপকথনের ভাষা; তাহা কাহারও কাজ কর্ম্মের ভাষা নয়, বিচার আচারের ভাষাও নয়; সে ভাষা সুদূরে আদৌ অব্যবহার্য্য; অন্তরেও তাহার ব্যবহার অতি বিরল। বৈষ্ণব সাহিত্য, সাহিত্যের খাস ফুলবাগানে ফুটিয়াছিল; কিন্তু, তদ্দ্বারা কি সাহিত্যের, কি সংসারের, সদর ও সাধারণ স্তর আলোকিত হয় নাই।

বাদশাহী আমল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমরা তাহার বহু পূর্ব্বের আমলে, ঐতিহাসিক আমলে, এবং সমাজ ও সাহিত্যের আমলে, আসিয়া

ভাষার কি কি বস্তু মুদ্রিত ছিল, তাহারই সন্ধান—তাঁহারই চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতেও বহুপুস্তকের নাম, হিন্দু ও মুসলমান আমলের কতকগুলি মুদ্রা, ঠাকুরবাড়ি ছিলেন বটে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি কালেরই গণনা করা পঞ্জিকাকারদের কর্ত্তব্য। এখন, বাঙ্গালা আমলটাই আছে, তাহার উপজীব্য বর্ত্তমান যুগেরও পাঞ্জী নাই। সাহিত্যের সাম্বৎসরিক পাঞ্জি হয় না কেন? দিন-পঞ্জিকা, মাস-পঞ্জিকা, বৎসর-পঞ্জিকা আবশ্যক। জ্যোতিষের পাঞ্জি ত আছেই, অনেক জীবনবীমা, জলবীমা, অগ্নিবীমার পাঞ্জি হয়, থাটের কলের পঞ্জিকাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৎসর বাণিজ্যের পাঞ্জি, তৈল পাঁচনের পাঞ্জি, গুঁড়ি কিসের নাই? নাই কেবল সাহিত্যের পাঞ্জি। সেটা কি এতই সামান্য জিনিস? কেন? সে দেখে, সে চক্রে, গুরু উপগ্রহ নক্ষত্র; রবি শশী রাহু কেতু, দেব দেবী, রাজা রাণী, পাত্র মিত্র, মেষ, সিংহ, মিথুন, বিহার, বাঙ্গার স্পীকার, কলাধিপ, ফলাধিপ, ঋতু, পক্ষ, রাশি, মঘা, অশ্লেষা, স্পর্শ, স্বরবর, তল্লীদার, সবই ত আছেন। এবং তাঁহার পরিক্রমণ, পরিবর্ত্তন, নবনির্ব্বাচনাদিও আছেন, তাঁদের বিবাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদিও আছে। তবে তাঁহাদের পঞ্জিকা নাই কেন?

যদি পাই, আমরা, বা যে কোনও আসরে, বৈষ্ণব রোষ্টম নিরামিষাশিবুনে কুটিনেও, সভাপরগণ পাঞ্জিকা করিবেন। বাঙ্গালা আমলে শ্রীমতী বাঙ্গালা ভাষা বিবি কাব্রী উর্দ্দু র একজন বাঁদী ছিলেন। শ্রীমতী সদর মোকামে এবং অন্দরমহলেও বটে, বিবিদিগের বাঁদীত্ব করিতেন। কাব্রী ছিলেন বড় বিবি, 'বেগমে খাস'; আর উর্দ্দু ছিলেন ছোটী বিবি, 'বেগমে আম'। বাঙ্গালা ছিলেন বাঁদী। "কারিগর প্রবন্ধ" তখন বাঙ্গালীর বাড়ির ঝিয়ের আচার দিনিইয়া, আস্তিয়ার ঠেশ দিয়া আলবোলার পোসাদি গুড়ুক টানিত, কোর্ত্তা বাইত। ক খ গ ছিল নোক্তাদার "কবিমার" ঘাণিত গোলার। বড়মানুষ হিন্দু বাঙ্গালীমাত্রই ওস্তাদ ছিলেন মুন্সীজী। এখনকার যেমন "সিভিল", তখনকার তেমনি মুন্সী ছিল খিদমদ্গার ও সম্মানের সরকারি বেসরকারি সনদপত্র; চুড়ান্ত ডিগ্রেনেরা। বিজাতীয় মুন্সীজী "কোচ" করিতেন। পরিধেয় তনরেয়া-পাজামা আর আটিয়া, মাথায় মুসলমানী টুপি টেড়া করিয়া পরিয়া, দাড়ীকে দেনিইয়া, কণ্ঠ তালু কাপাইয়া "কবিতা" আওড়াইতে। আর বড় বড় কাল কাল তন্ত্রীর উপর মোটা নখের কলম পক্ষি হইতে বামে বুলাইয়া লিপি-

ও সমন্বয় নাই, যা হওয়া দুষ্কর। নিরেট ছিদ্রহীন অন্ধকারশ্রেণী অমাবস্যার অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে; তাহার সহিত মনুষ্যের মুখের ভাষা ও মনের ভাব, উভয়ের তাহারও পরিচয় নাই; তাহার মধ্যে তাহাদের প্রবেশেরও পথ নাই। অপরটির—শ্রীমতীর বৈষয়িক সেরেস্তার চেহারাটির, চারি ভাগের তিন ভাগেরও বেশী যাবনিক "ভবান", ফারসী "লব্জ", অর্দ্ধনিষ্টের কতক কিতাবতী কথা, কতক "দেশজ" ইতর শব্দ, এবং ক্বচিৎ কিছু কিছু সংস্কৃত বা প্রাকৃত বাক্যের বোঝলা, বিভক্তি কোথাও বাঙ্গালা, কোথাও উর্দ্দু। খণ্ডচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ প্রায় কোথাও নাই। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়ানির্ব্বিশেষে, সটান দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া একই 'সেন্টেন্স' চলিয়াছে। ইহাও অবশ্য বাঙ্গালা বটে।

এই দুই আকারের দুই রকম বাঙ্গালা সেকালের সদরি বাঙ্গালা। একটি বিদ্যোত্তার বাঙ্গালা; অপরটি বিষয়কর্ম্মের বাঙ্গালা। ইহা ব্যতীত পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা কিন্তু নিশ্চয়ই একটি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেতাবী, পণ্ডিতি বাঙ্গালা সকল ব্যবহারেরই বহির্ভূত ছিল। পরন্তু কিতাবতী বাঙ্গালা গৃহস্থালী ও দৈনিক জীবনের কাজ চলিত না। সুতরাং ঐ দুই অনিবার্য্য ব্যবহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাঙ্গালার আবশ্যকতা ছিল, এবং তাহার অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ, তাহার সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গ আমরা এ আমলের লোক দেখি নাই। তাহার কতকাংশ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া কানভোতে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের কাছে পঁহুছিয়াছে।

পরন্তু ঐ পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একই রকম আকৃতি প্রকৃতি ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও স্থলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বরণ, গঠন ও উচ্চারণ ছিল। "গোদনান্তে ভাষা" আজও এ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। ফলতঃ ছিলও তাই। এখনও কোথাও কতকটা সেইরূপই আছে। কিন্তু এখনকার একটানা সভ্যতার, শিক্ষার ও পরীক্ষার, কোথাও মেলে এবং ঈষারে, কথার হেরফের অনেকটা কাটিয়া গিয়া সর্ব্বত্রই প্রায় একই বরণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

তখন পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা—কথোপকথনের Colloquial বাঙ্গালা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছিল। কিন্তু, সে বাঙ্গালার কেহ কিছু লিখিয়া রাখিতে ও শিখিয়া আনাইতে সাহসী হইত না। কথা

কথার "ভাষা কথায়" লিখিতে লোকের তখন লজ্জা করিত। শুধু ইহাই নহে, লিখিলে লোকে নেহাৎ মূর্খ বলিত, নিন্দা করিত, ছেলেমানুষী বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কাযেই তখন কেহ কথা কহার স্বাভাবিক ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। কিছু লিখিতে হইলে একটা অস্বাভাবিক উৎকট ভাষা ও ভাব আবশ্যক হইত। তাহা যাহার না জুটিত, সে কখনও লিখিত না; যে গতিভঙ্গি হেঁয়ালী রচিতে পারিত, সেই কেবল লিখিত। আর যে পিতামহী গর্হ্যস্থান্ত, সেই কালি কলম একত্র করিতে পারিত। নহিলে আর কেহ কেবল "নকল" করা ছাড়া আপন ভাষায় "মৌলিকতা" কাহাকে কহে জানিত না। তবে, আর এক শ্রেণীর লেখক বা নাটক ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা তখনকার কথা কহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা পাইয়াছি।

যাহারা কথায় কথায় মিলন ও চরণে চরণে পূরণ করিতে পারিত, কেবল উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর লেখক ব্যতীত; কেবল তাহারাই তখন লিখিতে বা রচিতে সাহস করিত; —তাহারা কবিওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, কথাওয়ালা, পাঁচালী-ওয়ালা ইত্যাদি। ইহারা গান রচিত, কথা লিখিত, গানের পালা বাঁধিত, ছড়া গাহিত। ইহা যাহারা করিত বা লিখিতে পারিত, তাহারা সকলেই আপনাদিগকে বৈষ্ণবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা দিত। স্বপ্নে কোনও দেবতার দেখা ও "আরজি" পাওয়া ভিন্ন কেহ তখনও এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। বিশেষতঃ যাহাদিগকে বড় বড় আসর মাতাইতে হইত, তাহারা প্রায় সকলেই দেবাবিষ্ট লোক, বা দেবতার বরপুত্র। স্বপ্নে দেবতা হইতে উৎকৃষ্ট কোনও দেবতা হইতে এক গাছি রাঙ্গা বা সাদা সুতা পাইয়াছেন, কাহাকে বা স্বপ্নে দেখাইয়া নিজের স্থায়ির হইবার বাসনা ব্যক্ত করিয়া তাহার যোগাড় করিতে কহিতেন। স্বপ্নাদিষ্ট জীব তাহার অজ্ঞতা জানাইয়া বারম্বার জানাইত, কিন্তু দেবতা তাহা শুনিতেন না। অবশেষে দৈবশক্তি লইয়া পূজা প্রচারের অনুমতি দিয়া যাইতেন। তদনন্তর প্রত্যুষে "পাঁচালী প্রকরণ" পুথি লেখা আরম্ভ হইত। এই সব পাঁচালী, একটু বড় রকমের হইলে, "মঙ্গল", "জাগরণ", "মঙ্গল", "জাগান", ইত্যাদি আখ্যা দিত। এই সকলকেই বলি কাব্য। কাব্যের আরম্ভেই বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। অনেকের মতে এই সব পাঁচালীর পালা আপন আপন গৃহদেবতার সংক্রান্ত করিয়া গাওয়াইত, পাঁচালী প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা দিত; এবং ও নিকট প্রকৃতি

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই এই প্রকারের একটি বিশ্ববিদ্যালয় নহে। বহু পণ্ডিতের পদবী যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ই দিতেছেন না। অনেক পণ্ডিতের ও পৌরাণিক জ্ঞানের পরিচয় পূর্বে পদে দিতেছেন। গ্রন্থে লিখিত প্রস্তুত করিবার অবসর পাইলে, তাঁহারা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারিতেন না। তাঁহার পৌরাণিক বিষয় লিখিবার সময় প্রায়ই পর্ব খুলিতেন না। কচিৎ প্রসঙ্গক্রমে বিষয় বর্ণনা করিতেছে, তাহাতে পৌরাণিক ও শাস্ত্রিক বর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতেন। অতএব তাঁহাদের রচনার বাঙ্গালা সাধারণতঃ কিরূপ আকার ধারণ করিত। যে সকল স্থলে পাঁচালী বা তাহার অংশবিশেষে দেবদেবীর বন্দনা, বাসনা, স্তুতি, বা মাহাত্ম্যকীর্তন, সে সকল স্থলে ভাষা বর্ণাংশে শাস্ত্রীয়, পৌরাণিক, পাণ্ডিত্যপ্রকাশিনী বা গ্রন্থে গিরিময়ী, সে সকল স্থলের বাক্যবিন্যাস-সংস্কৃত বা সংস্কৃতানুরূপ শব্দেরই সবিশেষ আধিক্য হইবারই কথা।

তবে, পৌরাণিক প্রাচীন গোস্বামিগণ হইলেও, পৌরাণিকের উদার পাঠকদের নিজের নিজের কল্পনায় পড়াতে, এবং নিজের নিজের ধর্ম্মের ও সমাজের রঙ্ পড়াতে, কখনও কখনও অজ্ঞাতে, উপর হতাশ্বি শিল্প চাতুরীর শিক্ষা কাটিয়া নমুনে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনই—তখন তখনই কবি মহাশয়েরা কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃত শব্দের ছায়াও পৌঁছি পোষের প্রচলিত Conventionality পরিত্যাগ করিয়া, লোকসাধারণ, সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা আশ্রয় চুরিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তখনই তাঁহাদের লোকব্যবহৃত বাঙ্গালার মত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দেখা যায় যে বাঙ্গালায় সংস্কৃত অপেক্ষা বরং অসংস্কৃত শব্দই অধিক। সাধুভাষা বাঙ্গালা অপেক্ষা তথাকথিত ইহার ভাষাই [illegible]। দেশজ বাক্য, বিভক্তি ও ইডিয়ম আদিতে তাহা প্রায়ই পরিপূর্ণ। সংস্কৃত-শব্দও তাহার মধ্যে মধ্যে আছে। কিন্তু হিন্দী ফারসীও আছে।

ফলতঃ, আজ কাল চলিত বাঙ্গালায় সংস্কৃতের ও সাধুভাষার অনেক বেশী রকম আমদানি হইয়াছে ও হইতেছে, সাবেক আমলে ভদ্রতা ও ছিল না; তাহার ভিন্ন ভাবের ভদ্রতা তাহাও ছিল কি না সন্দেহ। এখনকার ভাষা সম্পূর্ণ এবং বড়ীর কাছের বাঙ্গালা দেখিয়াই বোধ হয়, সিরাজ হইয়া দাঁড়াইবে যে সংস্কৃতই বাঙ্গালার জননী; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই মাতামহী।

মাতামহী মাতামহই 'থিওরি' মন্দ নয়। কিন্তু, দাদীর 'থিওরি' কি দাঁড়াইবে?

[illegible] বলি, পর্দানাশা এহিজাও নহে — [illegible] বাঙ্গালা, সংস্কৃত-সাহিত্যের পূজ্যবধূ, এবং [illegible] শ্রীমতী নামধারী [illegible] আছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঔরঙ্গজেবী শিকার ছাড়িয়া দেখা, তাঁহাকে খাইয়া ফেলে না।

আর্য্য ঠাকুরের ও দেখে আসিয়া অনার্য্য নাঙ্গালিনী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকেও বিবাহ বা সংগ্রহ করিয়া, নববধূর সঙ্গে নববধূরই ন্যায় গৃহে তুলিয়াছিলেন। আর্য্যাণী অনার্য্যা বধূদিগকে, এবং সংস্কৃত-যাতা বঙ্গভাষা বধূটিকে সংস্কৃতের মন্ত্র উচ্চারণে বরণ করিয়া লইয়া বিবিধ বঙ্গালঙ্কার, ধর্ম্ম বুক্ত শ্লোকে, বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বন্যবধূর অনার্য্যত্বকে শোধিত মার্জ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে আর্য্যত্বে সাজাইয়া, আর্য্যাকৃত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহা অসম্ভব নহে। বর্ণী, জননীর বৈভব অপেক্ষা, ঠাকুরাণীর সম্পদেরই অধিকতর অধিকারিণী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা এই রাজির মধ্যে সংস্কৃতের নাম সজ্জা পরিয়া, বহু শতাব্দী উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। বাঙ্গালীর নাম জীবন্ত ইংরেজী আমলেই এ অধিকার বেশী বাড়িয়াছে। শ্রীমতী বঙ্গভাষা সম্প্রতি সম্পদে শক্তিমতী হইয়া, সোহাগ করিয়া, বিলাতী বিদুষী বৈভব বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা উন্নতি বটে।

অনুজা বিদ্যাবিলাসের শিক্ষায় পরীক্ষায় শ্রীমতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলিয়া একটু অত্যন্ত সুখী, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোনও কালে কখনও ইনি কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণাভাব। পূর্ব্বে আমলে ইনি কোন বিদ্যালয়ে কখন অধ্যাপনা করিতেন, এখনি দেখা নিতান্ত পাঠিকা ছিল তখন ইহার প্রধান চতুষ্পাঠী; পরন্তু নৈমিত্তিক 'কন্‌ফারেন্স' জন্যও বড় বড় দুইটি দেশে ছিল; তাহার একটির নাম "আদর ইনিশিটিউশন," এবং অপরটির নাম ছিল "রাজার একাডেমি"। এই দুই সিভিকেটের মধ্যে স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা পাইয়া, নিজের 'মাইনেস' কিনিয়া, গ্রাজুয়েট আউট হইতে পারিতেন, তাঁহারা ছিলেন তখনকার "রাজনী-বিদ্যাবিদ্ বুধ", বা বৃহস্পতি, বা শুক্র অর্থাৎ, ডক্টর এ, এস্, ডি, 'ডক্টর অব বেঙ্গলী লিটারেচর', ইত্যাদি।

তখনকার শ্রীমতীকে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্যবিদ্যালয়ে প্রবেশ করান বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের সুকৃতী সন্তান। কিন্তু বাঙ্গালাই বিদ্যা-

ও অনুষ্ঠিত হইত। সাধারণ লোকে সাগ্রহে আদরে বসিয়া এই সব পাঁচালীর পালা শুনিত। শুনিবারই কথা। শ্রোতব্য বটে। বিশেষতঃ, তখন এই সকলের মত সর্ব্বজনবোধগম্য ও মনোজ্ঞ রচনা আর কিছুই ছিল না। সকলেই ইহা উপভোগ করিতে পারিত, সুতরাং আদর করিত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত-সমাজে এই সব মঙ্গল-পাঁচালীর, এবং কবি, কীর্ত্তন ও বাঁধা ভাষার তদনুরূপ রচনা সকলের এক পয়সারও পশার ছিল না। সংস্কৃত ভট্টাচার্য্যেরা বলিতেন, "ও খুলা ভাষা।" নেহাত অনুগ্রহ হইলে, নাক সিঁকায় ভুলিয়া বড় জোর বলিতেন, "সুবুদ্ধি-রচনা", বা "ভাষা কথার সংঘটন করেছে বেশ।" তখন এতটা প্রশংসাই প্রচুর ছিল। বিদ্যাবাগীশের মত বৈষ্ণব ঠাকুরেরাও "ধনসা মঙ্গলচণ্ডীর ইতর কথা" বলিয়া এই সব পাঁচালীর পালাকে অতিশয় তিরস্কার করিতেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, তাঁরা নিজে নির্বিশেষ ভাবে ভাবুকের ছিলেন, এবং তখনকার বাঙ্গালা ভাষার বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, গৌরাঙ্গসেবকদিগের প্রতি পক্ষান্তরে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইত। এখনকার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের অপেক্ষা অনেক বেশী গালিগালোজ গৌরাঙ্গভক্তেরা ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত শাক্ত পাঁচালীওয়ালা ও বৈষ্ণব পদ-পয়ার-পাঁয়-প্রেতেরাই তখনকার কথিত ও চলিত পারিবারিক ও সামাজিক সাহিত্যের কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ ভবিষ্যতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কেহ কৃতী, কেহ বা অকৃতী ছিলেন; কেহ আসল, কেহ নকল; কেহ মেকি, কেহ খাঁটী ছিলেন। তাঁদের অনেক কাল-পর্ব্বে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন; কতকের সহিত অল্পাধিক বিকৃত বা অবিকৃত আকারে এ যুগের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। অবিকৃত আকারে তাঁদের অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে; অথবা কিছুই পাওয়া যায় নাই। তবুও ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তিত, প্রক্ষিপ্ত, বিকৃত ও বিড়ম্বিত, যে আকারে ও যে অবস্থাতেই তখনকার বাঙ্গালার যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, এবং এখনকার বাঙ্গালার হাতে পড়িয়াছে, তাহা পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, ও পদওয়ালাদের প্রসাদাৎ; এবং বহুনিন্দিত বটতলার বাণিজ্যপ্রবণতার প্রসাদাৎ। নতুবা নিশ্চয়ই এ যৎকিঞ্চিৎও ফুটিত না। বলিতে কি, বটতলাই এক হিসাবে আমাদের "একমাত্র অব্ লিটারেচর"। কিন্তু যাহা পাইয়াছি, তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। তখনকার চলিত বাঙ্গালার নৈর্দ্ধ ভাগের চারি ভাগও আসিয়া আসিতে পারে

নাই। যাহা আসিয়াছে, কেবল দিয়া থুইয়াছে। কেন যে থাকিয়া থাকিয়া গ্রন্থকারদিগের গণনা করা কর্ত্তব্য। তাহাদের কেবল এইমাত্র বলিবার যে, তখনকার রচকেরা এখনকার মত গদ্য লিখিতে পদ্য রচেন নাই। কিন্তু, কেন যে পদ্য রচার গুণ তাঁহাদের ছিল না? কেন থাকিবে না? বিলক্ষণই ছিল। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচা সহজ না হউক, কঠিন নয়। তাঁরা যে কবিত্বের পদ্য রচিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে, তাঁরা ইচ্ছা করিলে অবায়াসে উত্তম গদ্য রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু, তাঁদের গদ্য রচার গুণ থাকিলেও, গদ্য রচার সে অভ্যাস তখন একেবারেই ছিল না। একেই ভট্টাচার্য্য-"তন্ত্রচানি-ভূষিতা ভাষা", তাহাও আবার, সুর-ছন্দ-যতি-হীন যদৃচ্ছাগ্রথিত পদ্য। তখনকার রচকেরা এখন কার লেখকদের মত যদি পাঠ কথার গাদা গাদা গদ্য রচিতে বসিতেন, নিশ্চয়ই সাত চড় খাইতেন। তার পর, পদ্যে ত আর গান গাওয়া চলে না। তখনকার রচকদের গান গাওয়া বা গাওয়ানই আবশ্যক ছিল; গলে চড় খাইবার ভয়টায় নিশ্চয়ই ছিল না। কাজেই তাঁরা গদ্য রচার বিষয় ভুলিয়াও ভাবিতে যাইতেন, এখন আমরা যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ পাঁচ সাত কোটীব্যাপী গদ্য লিখিয়া গ্রন্থ ছাপাই, প্রবন্ধ প্রকাশ করি, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার সমাপ্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কথা কহার কথার প্রভাত প্রকাশ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র, পয়সা খরচ করিয়া প্রকাশ করি, তখনকার লোকেরা এখন জীবিত হইয়া আসিয়া উহা দেখিলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে বলিবেন, "তোমরা বাক্যবাগীশ ও অলস; সংসারে তোমাদের করণীয় আর কোন কর্ম্মই নাই, তাই তোমরা কাগজ নষ্ট করিয়া বৃথা বিষয়ে এত অধিক বাজে বাক্য লিপি বদ্ধ করিয়া রাখি যাই। কাগজ নষ্ট করণ আর তোমরা নিশ্চয় উন্মাদ হইয়াছ, তাই সেই সকল অযোগ্য ও হাস্যজনক লিপি ইংরাজের কুতি ছাপাখানা নামক কলে, ছাপাইয়া অতিদুর্ল্লভ অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় কর। তোমরা মূর্খ ও বটেই, তাহার উপর অধিকন্তু তোমাদের মাথা খারাপ হইয়াছে। নহিলে কেবল কাল স্বতুচ্চারণের দোষ ও অসভ্যতার এত বেশী হইতে পারে না।

পিতামহেরা, তাঁহাদের অসুলভ নানা কাগজের অসদ্ব্যয় এই বহুমূল্য অপব্যয় ও অপমৃত্যু দেখিয়া, মর্ম্মপীড়াবশতঃ নিশ্চয়ই পত্রসম্পাদকগণকে নেকালের, পলায়িত পাঠশালার পোড়োর মত আড়কোলা করিয়া বৈ পাকুড় কাছের পিছাইয়া দিতেন, ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পাগলদুই অবর করিয়াছে। শ্রীমতীর তখন বয়ঃক্রম সবেমাত্র ছয় পূর্ণ হইয়াছে—তখন বিদ্যাসাগরের বিপুল যত্নে বালিকাবিদ্যালয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর শ্রীমতীর হাতেখড়ি ছাপিয়া দিলেন; শ্লেট পেন্সিল দিলেন, পাড়াতাড়ি চুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর বসাইলেন। সবকতা শাটীর নীচে একটি সাফসীতা সংস্কৃত শ্লেমিজ পরাইয়া দিলেন। তাহার উপর আবার একটি 'বডিস্' পরাইলেন। মাথের সীঁথা খড়ু তাদিলেন না, সীমন্তের সিন্দুরও মুছিলেন না। বরং সিঁথির উপর আর এক বিন্দু বেশী সিন্দুর টপিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর বর্ষীয়সী বালিকাকে নূতন বয়সের "বর্ণপরিচয়" হইতে "সীতার বনবাস" "শকুন্তলা" পর্য্যন্ত সাঙ্গ করাইলেন। বাবমুখ যাতা শাঁখার সঙ্গী হইয়া। শাশুড়ী সংস্কৃত-ঠাকুরাণীর নিরেট লোহসিন্দুকে অবশ্য জড়োয়া গহনা। গহনাগুলি বড় ভাগর ডাগর—সেকেলে রাঙতলী মোহর গলাইয়া গড়া; সত্যযুগের সোনা। কলির মেয়ে বঙ্গবধূর গায়ে গলায় মানায় না। বিদ্যাসাগর নেতাহাতে বিদ্যাসয়ে অষ্টপ্রহরই উপস্থিত। হাতুড়ি ধরিলেন, হাপর বসাইলেন। সংস্কৃত-মাতার মাঝাভার আবলেষ গহনা গলাইয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, পিটিয়া, মনের মত মানানসই 'স্যাম্পল' সই করিয়া, বাঙ্গালার গায়ে গলায় পরাইয়া দিলেন। বাউটিমুট, বাউড়ীমুট হইল। সোণার চন্দ্রহার খুলিল। ডাবলনকাটা চিকের কোমে হীরার মুকুতি খুলিল। তাগমর মাকড়ী। নাকে বাসফুল—সেকেলে নথখসুক কুৎসিত। পায়ে আটগাছা মল উঠিল। তখন আর পায় কে? তখন চেঙ্গোড়ীর চেটুয়ের কর্ণনাশা ও রাবশাহী বাঁদীদিগের ঝুমুরী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এবং বিলাতি সাহিত্যের সমুন্নত গোলাই ফোঁড়াই শিখিয়া, বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন। সময় বুঝিয়া রাঙ্গালা ছাটে, বিলাতি ছাঁটে, মোহনা-রঙের বেশমী গাউন সিলাইয়া, শ্রীমতীর বিদ্যাসাগরী বডিসের উপর ঝুলাইয়া দিলেন। দিনে দিনে আরও রঙ, 'ওয়াশ', 'ব্রাস,' 'এসেন্স' প্রভৃতির আমদানি হইল। যখন পায়ের গুরুপিপক্ষম গিয়া 'সিল্কের' 'কুল' 'ব্রুইকিং' চড়িল। কীর্ত্তিমতী 'কিট ফাক্কে'র দস্তানা আঁটিলেন। পিয়ানো আসিল, পিকচার ঝুলিল, পাখা ঝুলিল, পরদা পড়িল; বিদ্যালয়-কক্ষ তখন হাফ ড্রয়িংরুম, হাফ বসবরুম। বিদ্যাসাগর তখন নাই, বেতও নাই। বসবরুম্ কারনেটে মোড়া, কোচ কেদেরায় মোড়া। শ্রীমতী তখন আধ-বাঙ্গালিনী, আধ-বিবি। বিলাতি

বিনুকুটের পাকে বড়বাজারের খাদ্যমতন্ত্রী। বড়ই ছর্ভাবনার ব্যাপার! বেঙ্গলী ডিনার! কেয়াবাৎ দি ওয়েল্থ্! কিন্তু ঐ ফলা ওলা—(ক-য়ে য-ফলা, ক-য়ে ম-ফলা, "আর্থ ফলা")—আই আই! কাই কাই!—ঐ ফলাগুলা আর এখন তোমার পরিধানে জুতা ভাল দেখায় না। বুঝি তুমি থ্যাকারের বাড়ীতে 'ব্যাস্তাইজ্' অর্থাৎ 'রোমনাইজ্' হও; নইলে বিলেত যেতে পারে না। আন?—এটা ১৩০৫—20th সেঞ্চুরি?

শ্রীমতী যখন সাগরী শেমিজ, পরিয়াছিলেন, তখন তাঁর সেকেলে সাল-মসলা-বোঝাই "গছ"খানা বৈতরণীর বুকের উপর ডুবু ডুবু। কিন্তু তখন শনির দৃষ্টি বুচিয়া বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছে; পরক্ষণেই কিন্তু ফুলে লাগিল। চারি-দিক থেকে দাঁড়ি মাঝী জন মজুর গিয়া জুটিল, মল হেঁচিল, কাদা মুছিল, মাল বহিল, মত প্যারিল সাজাইল, শৃঙ্খলা করিল। বহুকালের পর খেরামতের জন্যে গছখানা ডকে উঠিল। ইঞ্জিনিয়রেরা গিয়া গছখানার ভিতর বাহির পাঠা শ্রীমতীর নবীন মূর্ত্তির বসবাসের কামরা সাজাইয়া দিল। গুলুকের ক্যাপ্টেন গছখানার সংস্কার হইল। শ্রীমতী গুলুকে উঠিলেন। ডিঙ্গী আবার ভাসিল। ভাসিতে ভাসিতে ত্রয়োদশ পার হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পড়িল। এক—দুই—তিন—চারি—বিংবিয়ানি আমলের বাঙ্গালা সাহিত্য সম্প্রতি তের শত পাঁচে পা দিয়াছেন।

পত্রিকাকার! কহ, শ্রীমতীর সূতিকা-গৃহের সংবাদ কি? বৈশাখে হইলেন? কোথোয়ে কিরূপ ফুটিয়াছিলেন? বৃদ্ধা বিবি, বোধ হয়, তখন বিবি বা ছিলেন না? শ্রীমতীর অন্নাশন পুংসবনাদির সমাচার কি? এ আমলে কি তাঁর বিবাহ? বয়স বার শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, বা তাহারও অধিক? সর্ব্বাগ্রে সাবস্ত কর তাঁর জন্মকাল, জন্মকোষ্ঠী এবং সর্ব্বোপরি তাঁর জনক জননী কে? বার শত বৎসরের বিবর্ত্তনে আপ-বিবির্থ; এ ইনি কোন্ অবতার? তের-শ' পাঁচে তরীর কাণ্ডারী কে? ভৌগোলিক সংস্থান কি? এক শত হইতে বার শতের stock-takingএর শ'তে কিছু হওয়া উচিত কি না? তের শতের বাণিজ্য-বায়ু কোন মুখে, কোন দিকে? তের-শ' পাঁচের রাজা কে, মন্ত্রী কে, বৈদ্য কে? রোগ কি? ঔষধ কি? মেঘ কেমন? জল কত? ফসল কেমন, ইত্যাদি নবপত্রী-ফলাফল বলুন,—যাহা শুনিয়া নর নারী দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বলিবেন, রাজা নাই,—'রিপব্লিক্'। তের শ' পাঁচে 'পার্লামেণ্ট' বসেছে?

P:36,131

কে? সভ্য ও সুবিচারের মর্য্যাদা হয় বলিয়া ইংরাজ দুর্নীতিপরায়ণের বিষম বদনাম আছে। প্রেমগোবিন্দ দেখাইতে চান যে, তাহা এই সুদূর উকীলবাবুদের গুণে, আইনের দোষে নহে। তিনি এমন ভরসা রাখে পারি উকীল-কলঙ্ক-ভঞ্জনের প্রথম দৃষ্টান্ত তিনিই দেখাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস, উমা সাম্যটাই যত নষ্টের গোড়া। ও জিনিসটা মাথায় দিলে দেবতাও বখাটে হইয়া যায়। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে প্রেমগোবিন্দ মাসলা স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু মাস-পরে প্রেমগোবিন্দের চিঠির গতি ক্রমশঃ বড় মন্দা তাহার আসিল। সপ্তাহান্তে চ দূরের কথা, মাসান্তেও আসে কি না সন্দেহ। পরে আবার এক পয়সার পোষ্টকার্ডযাত্র; আগেকার সেই রঞ্জিত রাগরেখা অপূর্ব্ব-অলঙ্কার-সমন্বিত, সুদীর্ঘ, বাক্যরূপী উৎসাহের প্রবাহ নাই। কখনও করিলাম, আমার পসার এইবার জমিয়া আসিতেছে। কাজের ভিড় চিঠি লিখিবার আর সময় পান। যদি কখনও যাহা লিখিতেন, তা তাহা আশ্চর্য্য পরিণ [illegible] খানা একবার হচক্ষে [illegible] আসিবার বড় [illegible] একটু বিষাদেরও আভা প্রেমগোবিন্দ [illegible] কোনও খবর দেয় নাই। [illegible] মফস্বলের ভিতে [illegible] বিদেশে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল না কি বিবাহ পূজার বাজ [illegible] দিকেই দুষ্টলোক ফিরিতেছে,—বিপৎপাত অসম্ভব [illegible]

একদি [illegible] বার সকল কাজ ফেলিয়া স্বয়ং পুরে গিয়া হাজির হ [illegible] লাই। প্রিয়ত [illegible] আশ্রমটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল [illegible] হইবে। গৃহিণীকে সুস্থশরীরে প্রত্যক্ষ করিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া [illegible] সুতরাং বলিলাম,—

"উমা! আমি মকেল নহি। আলাপের সমস্ত হইবে তো?"

প্রেমগোবিন্দ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—

"মার্জ্জনা করিও, ভাই! তিন বৎসরের পর হাতে ছুটি করিয়াছি। অজানে মকদ্দমা লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলাম। তোমাদের কাহারও সংবাদ লইতে নিতান্ত নাই। এই একটা কাজেই আমি প্রাণ লইয়া পড়িয়াছি। সামনে ছুটি আসিতেছে। মনে করিতেছিলাম, কলিকাতায় গিয়া বন্ধুদের সাহেব-প্রাণটা আবার নবীন করিয়া তুলিব। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইল। এখন চল যাই। আদালতের রাতারাতি আসার আর নয় হয় না। যা এখন ধরিতে হয়, তাও স্বীকার। এ কুকুমারী আর করিব না!"

নি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

াপার কি বল দেখি? ওকী সতীর পুণ্যাহ করিলে,—লাগে ত মিষ্টান্নের

গো। আর লজ্জা দিও না ভাই! মিষ্টান্নের কথা কও কি? তিন আমি কোনওরূপ অন্ন মুখে দিয়াছি কি না সন্দেহ। মকদ্দমাটার মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। বিফল, বিফল, সবই বিফল!

। একটা মকদ্দমা হারিয়াছ? এই বই ত নয়? এর জন্য তুমি যে াইয়ে, দেখ্‌ছি। এম্‌নি ক'রে পসার করিবে? জান না, উকী- নিষ্কামধর্ম্মের আদর্শ। সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, জয়াজয়, ন্যায়ান্যায়, রিকার নাই,—তবে ত বলি উকীল!

। উকীলের মুণ্ডপাত কর!

ম। আচ্ছা, তা করিব, তোমারটা বাদ দিয়া। এখন মকদ্দমার আদ্যোপান্ত বল দেখি, শুনি।

। শুধু মকদ্দমা নয়, আমার মক্কেলের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত হইবে।

বলিয়া প্রেমগোবিন্দ ড্রয়ার খুলিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি াটের খাতা বাহির করিলেন। খাতাখানি খুলিয়া পড়িবার উপক্রম ছেন দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি?"

। ভাই! বর্ত্তমান ব্যাপারটার হাতে কিছু না আসুক, মাথায় সিয়াছে। তাহারই পরিচয় এই ক্ষুদ্র গল্পে পাইবে। আমি পড়িব?

ম। একটু সহিষ্ণুতাসহকারে শুনিবে কি?

ম। বিলক্ষণ! শুভক্ষণে তোমার হৃদয়পুরের দিকে পা বাড়া- ম। তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে। পূজার সময় একটা গল্প দিতে না "সাহিত্য"-সম্পাদক "মারামারি কাটাকাটি" করিবেন, বলিয়াছেন। মজকাল চাকরীর দায়ে কিরূপ বিব্রত, তা' ত জান। লেখাপড়া এক- জলাঞ্জলি দিয়াছি। তাই বলি, এবার তুমিই আমায় বাঁচাইলে। এখন খি, শুনি। উকীল আবার কবি হইতে পারে, এমন বিশ্বাস ত নাই। এত পর বুঝি বিশ্বাসটা ঘুচিয়া যায়।

য়বর তখন একটু হাসিয়া, চোখের উপর সোনার চশমাখানি সতর্পণে । অতি নিবেশসহকারে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

মেয়ের নাম উন্মাদিনী রাখিবার সময় মেয়ের বাপ-মার মনে তাহার পরিণামের কোনও কথা অজ্ঞাতভাবে লাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। বড়মানুষের ঘরের বড় আদরের মেয়ে,—আদর করিয়া সকলে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু উন্মাদিনীর বাল্যজীবনের সহিত বর্ত্তমান ঘটনার কোনও সম্পর্ক নাই। যথাকালে যেরূপ সকলের হয়, নায়িকারও সেইরূপ বিবাহ হইয়া গেল। তবে, সে বাপের এক মেয়ে, বিবাহে একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহার পিতা ও মাতা উভয়েরই ইচ্ছা, ধনিরের ছেলে দেখিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে, জামাই শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত করেন। মাসে মাসে এক মাস, কখনও বা দুই মাস কাটাইয়া যান। উন্মাদিনীর শ্বশুর-ভিটে কেবল শাশুড়ীঠাকুরাণী বাস্তবিগ্রহ বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবার নিমিত্ত অধিষ্ঠান করিয়া থাকিতেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধার মুখে কেবল বৈকুণ্ঠের আর কোনও কথা প্রায় শুনা যাইত না।

বৃদ্ধার মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠেশ্বরকে বোধ হয় নিজের পথ দেখিয়া লইতে হইত। তাঁহার পরম সৌভাগ্যক্রমে একটা সামান্য ঘটনায় সে বিপদ্ হইতে হইল। উন্মাদিনীর প্রথম যৌবনোন্মেষসময়ে একবার জামাইবাবু পাঁচ মাস ধরিয়া তাহার রূপযৌবনের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কর্ত্তা ও গিন্নীর মনে যাহাই থাকি, দাসদাসীগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে উন্মাদিনীর শাশুড়ী পুনঃপুনঃ পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জামাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না,—নববসন্তের বাসরকুঞ্জ ফেলিতে হইল। প্রস্থানের পূর্ব্বদিন রাত্রে মিশির দল তাঁহাকে বলিল,—আমাদের কাপড় দিতে হইবে। জামাইবাবু মহাকাঁপরে পড়িলেন। উন্মাদিনী স্বয়ং তাহাদের সকলকে খুসী করিবেন, এই কথা বলিয়া না পড়িলে, জামাইবাবুর সে যাত্রা কি হইত বলা যায় না। তথাপি যাই। একজন অনভিজ্ঞযৌবনা অর্দ্ধবয়সী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল, "যার এই রূপভাটুকু নাই, তার আবার এত দেমাক কেন? তার শ্বশুর আসিই বা কেন? ওখানে বলে, পেয়াদার আমার শ্বশুরবাড়ী।" জামাই ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কোনও কারণে একটু মৃদু ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

সে সময় পাইয়া প্রস্থানের সঙ্গেই সেখানা একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া যাই

কথাটা জামাইবাবুর কাণে গেল। তিনি অভিমানে দাসীকে কিছু না বলিয়া হজরমহাশয়ের নিকটে নালিশ করিলেন। শ্বশুরমহাশয় তখন নিলামে কেনা নূতন জমীদারীখানার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। অন্যমনস্কতাবশতঃই হউক, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, জামাতার অভিযোগ শুনিয়া কেবল একটু হাসিলেন, কোনও কথা কহিলেন না। জামাইবাবু উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে, তাহা হঠাৎ মনে করিতে পারিলেন না। অবশেষে উত্তর পাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধীরে ধীরে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে গিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উন্মাদিনী তথায় নাই। তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আপনার আমা ও উড়ানীখানি লইয়া, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

জামাইবাবু নাম ত্যাগ করিয়া, "প্রমোদকৃষ্ণ আপনার ঘরে আসিয়া বসি-" অন্তরে বিষম অভিমান-বহ্নি জ্বলিতেছিল। মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া বস প্রভাতেই বধূকে আনিবার জন্য পাল্কী বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে একখানা চিঠিও দেওয়া হইল। চিঠি এইরূপ,—

আপনার বেহাইনের নমস্কার জানিবেন। আজ আমার পুত্রের অভি-যোগের উত্তর করিতে আপনার মুখে কথা বাহির হয় নাই। কিন্তু আপনার কন্যার বিবাহসম্বন্ধের সময়, আমার স্বর্গীয় স্বামী যখন বড়মানুষের ঘরে কুটুম্বিতা করিতে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, আমার মনে আছে, তখন আপনারই ওই মুখে কত মধুমাখা খই ফুটিয়াছিল। যাহা হউক, মুখে কথা থাকা না থাকা যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছাধীন, তখন বাক্‌রোধের নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিব না।

এখন আমার কথা এই। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রেরিত লোকজনদিগের সঙ্গে আমার বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি, সে জন্য অন্যত্র আবেদন করিতে হইবে না।"

পত্র পড়িয়া জমীদারবাবুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনেক ঊর্দ্ধতন কর্ম্মীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের এতদূর স্পর্দ্ধা কখনও দেখেন নাই। বাবু দরওয়ানদের হুকুম দিলেন,—"পত্র লইয়া যে কয় জন লোক আসিয়াছে, প্রত্যেককে পাঁচ ঘা করিয়া মশোরা জুতা পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দাও।"

হইল শুনিয়াছি বেলারাদের বেহ বা পলাইয়া, কেহ বা নিজজনগণ কর্তৃক মুক্ত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

প্রবোধচন্দ্রের মন আলিবার সাধ এইরূপে মিটিল।

ক্রোধে ও লজ্জায় মাতাপুত্রের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসিল। এরূপ স্থলে যে একমাত্র উপায় বাঙ্গালাদেশে সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রবোধচন্দ্রের জননী তাহার চিন্তা করিতেছিলেন কি না, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে প্রজাপতির দুই এক জন ভগ্নদূতের শুভাগমনবার্ত্তা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরে, একটা অভিনব উপায় আপনি আসিয়া দেখা দিল। উন্মাদিনীর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র আসিয়া পঁহুছিল চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর হইলেও, মাতারা প্রথমে লিখনে নকল করিয়া দিলাম।

"আপনার দাসী উন্মাদিনীর প্রণাম গ্রহণ করিবেন। তারা লোকসমাজের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। সে অপমান গায়ে লাগিয়াছে। সে জন্য আমি বাহির হইয়া আপনার কাছে চলিতেছি। দাসীর অপরাধ লইবেন না।

"প্রতিনিধি কানে শুনিয়া সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখানে আপনার অপমান, আমি সেখানে থাকিতে পারি না। এ বাড়ীর অন্ন আর গ্রহণ করিব না। তাহা আমার পক্ষে বিষ। যদি কখনও আমার সন্তান হয়, তাহাদিগকেও বারণ করিয়া যাইব, এখানে কখনও পদার্পণ না করে। যাহাতে আপনার অধিকার নাই, তাহা আমিও ভোগ করিতে পারি না। পিতার যত্নের ত্রুটি নাই। কিন্তু যখন মনে হয় যে, তিনিই আপনার প্রতি অপমান বর্ষণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আদরকে একান্ত অনাদর বই আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারি না। আপনি যেখানে স্বাধীন, যেখানে সামান্য বস্তুটির জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না,—দাসী চাকরের অপমান-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় না,—সে স্থান পর্ণকুটীর হইলেও আমার পক্ষে প্রাসাদতুল্য। আমি সেই দিনই এ গৃহ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু একেলা বাহির হইতে পারি নাই। বিশ্বাস করিয়া মনের কথা এতদিন কাহাকেও বলিতেও পারি নাই। ভগবান আজ বিশ্বাসের যোগ্য একজনকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আমি আগামী কল্য

সন্ধ্যার পর লুকাইয়া এই বিশ্বস্ত দাসীর সহিত কামারপাড়ায় আমার আত্মের বাড়ী চলিয়া যাইব। আপনি সেখান হইতে আমাকে কালই লইয়া যাইবেন। উন্মাদিনীকে যেন ভুলিবেন না।

"পুঃ। আমি চোরের মত লুকাইয়া যাইতাম না। কিন্তু বাবার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে এ কথা প্রকাশ করিলে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। তাই একটু বাঁকা পথ অবলম্বন করিতে হইল। সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—"

বলা বাহুল্য, প্রমোদকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। উন্মাদিনী স্বামিগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইল। জমীদার মহাশয় আপ্‌লোষে কয়েক দিন কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালে সকল ব্যথাই জুড়াইয়া যায়। তিনিও সান্ত্বনা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বা তাহার স্বামীর নাম আর মুখে আনিতেন না। এখন কি করিলে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হয়, তিনি আপনার বিপুল বিভবের একজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিতে পারেন, কর্ত্তা-গিন্নীর মনে সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল।

৩

এইখানে পাঠক মহাশয়কে একবার কুম্ভকর্ণের স্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য ঘুমাইতে হইবে। ইত্যবসরে প্রমোদকৃষ্ণ ইহ-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁহারই ছবির ন্যায় একটি সুন্দর সুকুমার চারিবৎসরবয়স্ক শিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। উন্মাদিনীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ মুখমণ্ডল দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে মলিন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা ও অভিমান-শিখা উজ্জ্বল জ্বলিতেছে। প্রমোদকৃষ্ণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না;—কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শাশুড়ী ও বধূ কিশোর শিশুটির মুখ চাহিয়া কোনও রূপে দিনপাত করিতেছেন। উন্মাদিনীর পিতার আর কোনও সন্তান হয় নাই। সুতরাং প্রমোদকৃষ্ণের পুত্র, তাঁহার দৌহিত্র, এই শিশুটিই তাঁহার বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যখন শিশুটি অন্নাভাবে কাঁদিত, তখন এই কথা স্মরণ করিয়া প্রমোদকৃষ্ণের মাতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন। কিন্তু বধূর ভয়ে এবং তাহার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না। উন্মাদিনী প্রাণাধিক পুত্রের অনুপম কান্তি উপযুক্ত পোষণা-ভাবে দিন দিন ম্লান হইতে দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত। তাহার

চোখ ফাটিয়া কখনও জল পড়িত কি না, ভগবান জানেন। মানুষে তাহা দেখিতে পাইত না। সে গ্রামস্থ এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পিতা বারংবার লোক পাঠাইয়াছেন, বিশেষ, দুই একবার আসিয়া আপনগৃহে লইয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ, অনুনয় বিনয় করিয়াছেন। পাষাণীর পাষাণ-হৃদয় কিছুতেই টলাইতে পারেন নাই।

এক দিন অপরাহ্নে উন্মাদিনী মুনিব-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিশুটি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, মাথায় মূল্যবান উষ্ণীষ পায়ে নমুনার জুতা পরিয়া, রাজপুত্রের মত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছে। মাকে আসিতে দেখিয়া শিশু এক মুখ হাসিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। উন্মাদিনী বুঝিতে পারিল যে, যিনি তাহার স্বামীকে এক দিন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই তাহার পুত্রকে আজ এই অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছেন। কথাটা ভাবিতে তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। সে শিশুর মাথা হইতে টুপিটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সেটা গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণ-প্রান্তে একটা নর্দ্দমায় গিয়া পড়িল। তার পর মা ছেলেকে ধরিয়া সেই সুন্দর পোষাক খুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। শিশু কাঁদিয়া উঠিল, ঠাকুরমার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, আপনার সুকুমার দেহের সমগ্র ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দুই হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া পোষাক সমেত স্বীয় বক্ষোদেশ আশ্রয় করিয়া ধরিল। সে কিছুতেই তাহার মাতামহ-প্রদত্ত নবীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিবে না। এ দিকে উন্মাদিনী টানাটানি করিতেছে। শিশু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই প্রাঙ্গণে ধূলার উপর শুইয়া পড়িল, আর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরমার নাম ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুর-মা এত ক্ষণ কোথায় ছিলেন, বলিতে পারি না। শিশুর ক্রন্দনে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন;—

"তোমার মতন পাষাণী মা ত কোথাও দেখি নি। হ'ক না; আমাদের দেবার ক্ষমতা নাই; ওর দাদামহাশয় দিয়াছেন। তা'তে তোমার এত আক্রোশ কেন? যদি বেঁচে থাকে, ওরই ত সর্ব্বস্ব।"

উন্মাদিনী তখন শিশুকে ছাড়িয়া শাশুড়ীর উপর পড়িল। শিশু মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুরমার এক পার্শ্বে আসিয়া লুকাইল।

বিচিত্র পোষাক ছিন্ন ভিন্ন ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া তাহার অঙ্গে বৈরাগীর কন্থার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল।

উন্মাদিনী কহিল, "আমার স্বামী দীন দুঃখী ছিলেন; আমিও দীন দুঃখী। গরিবের ছেলের গায়ে অত পোষাক শোভা পায় না। পরের ধনে বড়মানুষী কেন?"

পাগুড়ী। যদি কথা তুলিলে ত বলি, পরের ধনই বা কিসে? ওর বাপ মহাশয়ের ছেলেপিলে নেই, যা কিছু সব ও ত পাবে।

বধূ। কা'র ধন পা'বে, সে কথাটা ত কারি আপনার মনে নাই, আপনার ছেলের অপমান আপনি ভুলিতে পারেন, কিন্তু আমার স্বামীর অপমান আমি এ জন্মে ভুলিব না!

পাগুড়ী। যখন সময় ছিল, আমিও সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছি! এখন আর সে কথায় কাজ কি, মা? যা'দের পেটে অন্ন নেই, তাদের আবার মান অপমান কি, মা? এমন সোনার চাঁদ, দুধের ছেলে,—ওর মুখে ভাল খাবার, অঙ্গে ভাল কাপড় দিতে পারি না। এর বাড়া আর দুঃখ কি আছে? আমাদের যা হ'বার হোক্। আমার প্রমোদের সোনার চাঁদ সুখে থাক্। মরণকালে ভাই দেখিয়া যেন মরিতে পারি।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখের জল আর ধারণ মানিল না। আঁচলে চোখ ঢাকিয়া, দেয়াল পড়িয়া, উচ্চ সিংহ স্বামিশোকে ও পুত্রশোকে বৃদ্ধা কত দিনের কত কথা স্মরণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

৪

বৃদ্ধাকে অধিক দিন আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। সকল যন্ত্রণাহারী শমনের সুশীতল বাহুযুগল শীঘ্রই তাঁহার জন্য প্রসারিত হইল। পূর্ব্বলিখিত ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রমোদকুমারের মাতা, উন্মাদিনী ও তাহার কিশোর শিশুটিকে সংসার সমরক্ষেত্রে ফেলিয়া, অমর-ধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দুঃখে, শোকে ও দারিদ্র্যে উন্মাদিনীর দিন কাটিতে লাগিল। এখন হইতে সে বালকটিকে আর চোখের আড়াল করিত না। মুনিব-বাড়ী যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। সেখানেও শিশুটি নীরবে তাহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। অপর বালকগণ খেলার জন্য ডাকিলে বলিত, "আমি খেলিব না; আমার মা কাঁদিবে।" সে তাহার মাকে কোনও দিন কাঁদিতে দেখিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তথাপি কি জন্য বলিতে পারি না, সে সর্ব্বদাই বলিত,—"না, আমার মা কাঁদিবে!" উন্মাদিনী তাহাকে

লইয়া কখনও কখনও গোপনে পরামর্শ করিত। পাঁচ বৎসরের শিশুর সঙ্গে পরামর্শটা কিরূপ, জানিবার নিমিত্ত পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই আমরা নিম্নে তাহার একটা নমুনা দিতেছি। মা বলিতেন,—

"আমার পরাণ-ধন! তোমাকে যদি কেউ আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে যায়?"

শিশু বলিত,—"তা' হ'লে আমি কাঁদিব!"

মা। আর আমি?

শিশু। তুইও কাঁদিবি!

মা। তোমার দাদামহাশয় যদি নিয়ে যান?

শিশু। আমি যা'ব না।

মা। কেন? তাঁরা ত তোমায় ভালবাসেন।

শিশু। কেন? তুই যে বলিস্ তা'রা আমার বাবাকে ভালবাসিত না।

মা। সেখানে যেও না বাবা! গরিবের ছেলের বড়মানুষের বাড়ী যেতে নেই। তা' হলে আমি কাঁদিব।

শিশু। না, মা! আমি কোথাও যা'ব না। বাবা যদি আসে কৈবল তা'র কাছে যাব! তা' হলে ত তুই কাঁদিবি না?

মাতা-পুত্রের পরামর্শ ইহার পর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সুতরাং আমরাও নিরস্ত হইলাম।

শিশু পাঁচ বৎসর ছাড়াইয়া ছয় বৎসরে পড়িল। উন্মাদিনী তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে পাঠাইতে বাধ্য হইল। প্রমোদরঞ্জন বলিতেন,—"যে বিদ্যার্জনের অধিকারী, সে জগতের অপর সকল ঐশ্বর্য্যকে অবহেলা করিতে পারে।" উন্মাদিনীর সে কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু শিশুটিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া তাহার মন কখনও সুস্থির থাকিত না। সে বতবার দেখিতে পাইত, স্বয়ং গিয়া শিশুটিকে দেখিয়া আসিত। সে যে বড়মানুষের মেয়ে—জমিদার-দুহিতা—তাহা বোধ হয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই রাস্তায় বাহির হইতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জা হইত না। শুধু তাই নহে। এরূপ চাঞ্চল্যের আরও একটা কারণ ছিল। প্রমোদরঞ্জনের মাতার মৃত্যুর পর উন্মাদিনীর পিতা কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া যাইবার জন্য আর একবার আসিয়াছিলেন। সেই বারেও কন্যার কঠোর প্রতিজ্ঞার কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, সেইদিন হইতে তিনি কন্যার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ

করিলেন। কিন্তু তাঁহার দোহিত্র, তাঁহার অভূল বিভবের অধিকারী, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। উন্মাদিনী ছাড়িয়া না দিলে তিনি আপন উত্তরাধিকারীকে বক্ষঃপুটে আবদ্ধ করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। তাঁহার সঞ্চিত ধনে লোটিয়া উঠিত, উন্মাদিনীর এমন সহায়, এমন নায়ক ছিল না। তাই নিজেকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া থাকিত।

গুরুমহাশয় গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঠশালা গ্রামের প্রান্ত বাহিরে একটি আটচালায় স্থাপিত ছিল। গৌরচন্দ্র গ্রামের মধ্যে একজন বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রায় দুই ক্রোশের ভিতর অন্য কোনও স্কুল বা পাঠশালা ছিল না। সুতরাং গৌরচন্দ্রের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার পাঠশালাটিও একটু উচ্চ ধরণের। গুরুমহাশয়ের নিজের জন্য একখানি চেয়ার, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত ছাত্রদিগের নিমিত্ত কয়েকখানি বেঞ্চ ছিল। উন্মাদিনীর শিশুটির স্বভাবগুণে গুরুমহাশয় তাহাকে আপন পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বেঞ্চগুলি বয়স্কছাত্রবৃন্দের জন্য রক্ষিত হইলেও, গৌরচন্দ্র তাহারই একখানিতে শিশুটিকে বসাইতেন। দিনের মধ্যে একবারমাত্র তাহার পাঠ লইতেন। পাঠান্তে শিশু আপন ইচ্ছামত খেলিত, বসিত, ঘুরিয়া বেড়াইত। গৌরচন্দ্র মানসিক শ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কখনও কখনও শিশুটির সহিত বাক্যালাপ করিয়া, বা তাহার খেলায় যোগ দিয়া, ক্লান্তি দূর করিতেন।

একদিন প্রভাতে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ অনেকেই সমাগত হইয়াছে। উন্মাদিনীর বালকটিও আসিয়াছে। কিন্তু, গৌরচন্দ্র স্বয়ং এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ছেলেদের মধ্যে কেহ ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কলহ করিতেছে, কেহ বা ওরই মধ্যে একটু সুযোগ পাইয়া গুরুমহাশয় সেদিনের যে পাঠ দিয়াছেন তাহাই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। এমন সময়ে আটচালার সম্মুখে বকুল বৃক্ষের তলায় একটা প্রকাণ্ডকায় হাতী আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বড় বড় বাঁশের লাঠি কাঁধে করিয়া, মাথায় পাগড়ী, সুদীর্ঘকায় একদল হিন্দুস্থানী দরোয়ান আসিয়া পঁহুছিল। হস্তীর পৃষ্ঠে সুচিক্কণ ঝালরবেষ্টিত বিচিত্র হাওদা। হাওদার ভিতর স্বয়ং তাঁহার কুলের গুরু, গ্রামবাসীর পূর্ব্বপরিচিত জমীদার মহাশয়। অনেকে এ গ্রামে হাতী কখনও দেখে নাই। কেহ "হ'য়ে হাতী", কেহ "ঐ—ঐরাবত"

বলিয়া [illegible] ভয়ে অট্টালার ভিতর লুকাইল। ইত্যবসরে [illegible] হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। তখন জমীদার মহাশয় হাওদার ভিতর হইতে নামিলেন। অদূরে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাঁহার দৌহিত্র, মলিনবসনে, অনাবৃত গাত্রে, আনাবৃত পদে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে হাতীর পানে চাহিয়াছিল। জমীদার বৃদ্ধমহাশয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালক তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল। বলিল, "দাদা মহাশয়!" দাদামহাশয় বলিলেন, "হাঁ দাদা! তবে আমাকে তোমার মনে আছে?" শিশু আবার বলিল, "দাদামহাশয়! তুমি ঐরাবত কোথা পেলে?"

দাদা। ঐরাবত তোমারই, ভাই! তোমাকে লইতে আসিয়াছে।

শিশু। আমি ত যা'ব না। আমার মা কাঁদিবে।

দাদা। না দাদা! তোমার মা কাঁদিবে না। তোমার মাকেও নিয়ে যা'ব।

শিশু। মা কই? মাকে ডাকো না।

দাদা। তোমার মা বিকাল বেলা যা'বে। তুমি আমার সঙ্গে চল। ইত্যবসরে একজন ভৃত্য বিচিত্র পোষাক আনিয়া দাদামহাশয়ের হাতে দিল। দাদামহাশয় আপন বসনপ্রান্তে বালকের অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে সেই সমুজ্জ্বল সাজে সজ্জিত করিলেন। তার পর তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া আপন স্কন্ধে তুলিলেন। তুলিয়া হাওদার ভিতর গিয়া কোলে লইয়া বসিলেন। তখন মাহুতের ইঙ্গিতে হাতী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর গর্ব্বিত মন্থর পদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠী স্কন্ধে দ্বারবানের দল পশ্চাতে সারি দিয়া ধাবমান হইল।

পাঠশালার ছেলেরা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। ঐরাবত চলিয়া যায় দেখিয়া, কেহ কেহ যত দূর পারিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু পাকা বাঁশের লাঠীর ভয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। আর কেহ কেহ বা ছাত্র-পল্টনের জেনেরাল গুরুমহাশয়কে সংবাদ দিতে দৌড়াইল।

৫

গ্রামের মধ্যে মহা গোলমাল পড়িয়া গেল। সেদিন আর পাঠশালা বসিল না। বালকগণ ছুটি পাইয়া হাতীর কথা আন্দোলন করিতে করিতে যে

মার বাড়ীতে প্রস্থান করিল। তাহার সঙ্গে একদল ঐরাবতের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কৌতূহলসহকারে প্রস্থান হইল। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা বিবিধ উপায়ের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বলিলেন,—হাতীটা বালককে শুঁড়ে ধরিয়া হাঁওদার ভিতর বসাইয়া দিয়াছিল। এ কথা তিনি তাঁহার নিজের ছেলের মুখে শুনিয়াছেন। তাঁহার ছেলেটি বালকটির সহপাঠী। সুতরাং তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেহ বা বলিলেন,—ঐরাবত না কি বালককে দেখিবামাত্র দুই পা তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিল। একজন বহুদর্শিত্ব বৃদ্ধ সহিষ্ণুতার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া তাহারই টীকাস্বরূপ বলিলেন,—"হাতী নমস্কার করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই পা তুলিয়া নহে। আমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছি, নমস্কারের সময় হাতী চারিটি পদই জমীর ঠিক চারি হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল।"

ঐরাবতের বৃত্তান্ত বর্ষাসমমে উন্মাদিনীর কানে গিয়া পঁহুছিল। সে তখন কর্ম্মস্থলে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। উন্মাদিনী সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ কোনও দুর্ব্বলতা দেখাইল না। কেবল তাহার চক্ষে উন্মাদিনীর একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অন্তরে সে অনল জ্বলিতেছিল, সে জ্যোতি তাহারই ছায়ামাত্র। উন্মাদিনী ধীরপদক্ষেপে বাড়ীর কর্ত্রীর নিকট গিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "এইবার আমার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আমি আর কাজ করিব না।" কর্ত্রী ঠাকুরাণীও সংবাদ শুনিয়াছিলেন। উন্মাদিনীর প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—"তা বা! এ ত তোমার চাকরী নয়। আমি তোমাকে আপন কন্যার মত দেখিয়া থাকি। তুমি কাজ কর, আর নাই কর, আমার গৃহে তোমাকে চিরদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" উন্মাদিনী বলিল,—"মা! আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে। আমি অনুগ্রহের প্রয়াসী নহি। ভগবান সেরূপ মতি দিলে পিতৃগৃহে রাজ্যের সম্পদ ত্যাগ করিয়া আসিতাম না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যিনি আমার হৃদয়ে এই অশ্রান্ত অভিমানের অনল জ্বালাইয়াছেন, তিনিই আমার উপায় করিয়া দিবেন। সেজন্য যেন মানুষের উপাসনা করিতে না হয়।" কর্ত্রীঠাকুরাণীর অন্তরটি স্নেহরসে পরিপূর্ণ ছিল। উন্মাদিনীর এই উত্তর শুনিয়া আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। কথার পরিবর্ত্তে তাঁহার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের অশ্রুত সোহাগ উপহার করিয়া সুবৃহৎ দুইটি মুক্তাফলের ন্যায় দুটি

অশ্রুবিন্দু দুই গণ্ডে আসিয়া শোভিত হইল। উন্মাদিনী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

উন্মাদিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার স্বর্গীয় স্বামী যে শয্যায় শুইতেন, বহুকাল হইল যে শয্যা সে আর স্পর্শ করে নাই, আজ কি মনে করিয়া তাহারই উপর শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। তা'র পর আবার কি ভাবিয়া উঠিল। উঠিয়া, স্বামীর লিখিবার বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ বাহির করিল। ফটোগ্রাফ তাহার স্বামী ও শিশুর। শিশুটির বয়স যখন দুই বৎসর, প্রমোদকৃষ্ণ ফটোগ্রাফ-শিক্ষার্থী কোনও বন্ধুর অনুরোধে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া এই ছবি তুলাইয়াছিলেন। উন্মাদিনী ছবিখানি বক্ষে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। যে উচ্চ সুরে তাহার প্রাণের বীণা এতদিন বাঁধা ছিল, তাহা এইবার ছিঁড়িয়া গেল। উন্মাদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। বহুকাল অনুপভুক্ত স্বামীর সেই শয্যার উপর পড়িয়া দরবিগলিতধারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল;—

"ও আমার সাঁতরাজার ধন! আমার আঁধার ঘরের মাণিক! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোরে কে চুরি করিল? আমার অঞ্চলের নিধি! কেন আমি তোমাকে অঞ্চলছাড়া করিলাম? তাহা না করিলে আমার প্রাণ থাকিতে ত কেহ তোমাকে কাড়িয়া লইতে পারিত না। সেখানে তোমাকে রাজার আদরে, রাজভোগে রাখিবে, তা' আমি জানি। কিন্তু সে আদর যে তোমার পক্ষে বিষ, তাহা কে তোমাকে শিখাইবে? আমি অতি দুঃখিনী—চির-কাঙালিনী। তোমার মনে আমি যাহাতে আর ঠাঁই না পাই, তা'রা তাই করিবে। আমাকে ঘৃণা করিতে শিখাইবে। আমাকে ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যাহা অপমান আজ পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মস্থলে অগ্নিশিখার মতন জ্বলিতেছে, তাহাকেও ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যে প্রতিজ্ঞাপালনের আশায় এত দিন এ প্রাণ রাখিয়াছি, আজ তা আমার ঘুচিয়া গেল। তবে প্রাণ আর কিসের জন্য রাখিব?"—

কিন্তু উন্মাদিনী ত মরিল না। শোকের প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে আবার উঠিল। চোখের জল মুছিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় হইতে তাহার স্বভাবে উন্মাদের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা দিল। সে এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারিত না, এক জনের সহিত অধিকক্ষণ কথা কহিতে

পারিত না। প্রায় সর্ব্বদাই পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও বা গুণ গুণ করিয়া গান করিত। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিত,—"হাঁ গা! রাজার হাতী এই পথে গেল কি? আমার ছেলেকে রাজা কর্‌বে। আমি রাজার মা হ'তে পারব না? আমি কাল শ্বশুর-বাড়ী যা'ব। আমার স্বামী কিনে.....! আমি রাজার মা হ'তে পারব না!"—কথা কহিতে কহিতে উন্মা..... করিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। কখনও বা, "ও আমার কাঁদ..... সে রাজা হ'বে না। বাই, আমি তা'কে ..... বকিতে বকিতে রাস্তা দিয়া ছুটিত। তাহার ..... ছাটিয়া যাইত।

৩

..... খন আসে, কখন যায়। যখন ভাল থাকিত, ... হইত না। কখনও বসিয়া বসিয়া ভাবিত, কখনও ..... কাঁদিত। কোনও দিন বা নিজের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত ..... মাদের অবস্থাতেও তাহাকে কখনও পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে ..... র অন্ন খাইতে দেখা যায় নাই। কেহ কিছু দিতে চাহিলে ক্রুদ্ধ হইয়া ..... আমি উন্মাদিনী, ভিখারিণী নহি।

এইরূপে দুই এক মাস কাটিয়া গেল। তার পর উন্মাদিনী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। মকদ্দমা ভিন্ন তাহার শিশুটিকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, অবশেষে স্বামির ভদ্রাসনটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক অর্থসাহায্য করিতে চাহিল। উন্মাদিনী তাহাদের গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল।

উন্মাদিনীর হাতে কয়েক শত টাকা সংগৃহীত হইল বটে; কিন্তু এই সময়ে আবার তাহার রোগ আসিয়া দেখা দিল। তথাপি সে মকদ্দমার কথা ভুলিল না। যাহার সঙ্গে দেখা হয়, কেবল জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁ গা! জজসাহেব কোথা থাকে? জানো? আমি তার কাছে নালিশ করিব। আমার রোপাকে চোরে নিয়ে গেছে। আমি চোরকে ফাঁসি দিব।" লোকে শুনিয়া হাসে, কেহ বা বিদ্রূপ করে, কেহ বা আপনাদের মধ্যে একজনকে জজসাহেব বলিয়া দেখাইয়া দেয়। অবশেষে একজন প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া, হৃদয়পুরের আদালতের কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিল। আমাদের বিশ্বাস,

যে মনুষ্যনিচয়ই আছেই আর শিশুহরণ। নহিলে এমন কুকার্য্য কখনও করিত না।

হরিপুরে আসিয়া উন্মাদিনী পূর্ব্ববৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক উকীলের নাগাৎ পাইল; কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া, লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, কেহই তাহার মকদ্দমা লইতে রাজি হইল না।

প্রেমগোবিন্দ নামে একজন পদচ্যুত জজ লোক [illegible] আদিত্যের হাওয়া খাইতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত হাতে [illegible] নাই। একদিন কাছারী যাইবার সময় উন্মাদিনী সেলাম করিয়া লোকের মুখে তাহার অবস্থা [illegible] মাথাটা যতই নরম হউক, তিনি হৃদয়ের ভিতর [illegible] তেজ। তাই শিশুহারা জননীর পরিচয় পাইয়াই [illegible] নূতন ধরণের মকদ্দমাটা লইয়া একটু নাম কিনিবার আশা [illegible] তিনি সে দিন কাছারী যাওয়া বন্ধ করিয়া উন্মাদিনীকে [illegible] লইয়া গেলেন। তার পর তাহার পূর্ব্ব কথা আদ্যোপান্ত আইনের বহি খুলিয়া, মগজ খাটিয়া একখানা আরজী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আদালতে বসিবামাত্র তাহা পেশ করিয়া দিলেন। অনেকে হাসিতে লাগিল,—"কি হে! ব্যবসায়ের গতিক বুঝিয়া অবশেষে উন্মাদ হইবার সাধ হইল না কি?" প্রেমগোবিন্দ তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মক্কেলটীর আপনার সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিলেন।

নিজের নামগোত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া প্রেমগোবিন্দ অনুসন্ধিৎসার সহকারে দুই একজন নামজাদা উকীলেরও সহায়তা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বিষয়-বিক্রয়-লব্ধ টাকার পুঁটুলিটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। প্রেমগোবিন্দ তাহা স্পর্শও করিলেন না। খরচ-পত্র সব নিজেই নির্ব্বাহ করিলেন। সুতরাং উন্মাদিনীর টাকা তাহার অঞ্চলেই বাঁধা রহিল।

হমিদাক মহাশয়ের পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি হইল না, পাঠক তাহা নিশ্চয়ই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। যোগ্য উকীল যাঁহারা ছিলেন, কেহই নিযুক্ত হইতে বাকী রহিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া যে দুই এক জন ইতিপূর্ব্বে প্রেমগোবিন্দের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কপালে করাঘাত করিয়া আঙুল কামড়াইতে লাগিলেন।

আজ সওয়ালের দিন। আদালতে লোক আর ধরে না। পাগলের মক-

দিন অন্ধ-বিশ্বাস প্রভাবে মাত্রোধর্মে কল্পিয়া তোরণ-দ্বারে একটী নরকঙ্কাল গৃহদেহ দেখিতে পাইল। অমনি সন্দেহ-অঙ্কুরের ধরা ছিন্ন হইল দেহে। উন্মাদিনীরই বটে!

উপসংহার।

প্রেমগোবিন্দ তাঁহার গল্প পড়িয়া শেষ করিলেন। শ্রোতার অবস্থা যাহাই হউক, লেখককে ধন্যবাদ দেওয়া আমার পক্ষে একটা বিষম দায় হইয়া দাঁড়াইল। প্রেমবন্ধের ঘরের শ্রোতা কিছুতেই বারণ মানিতে চাহে না। আমি বলিলাম, "ভাল উকীল দাঁড় করাও। কাঁদিয়া মকদ্দমা ডিক্রিদে কি?"

প্রেমগোবিন্দ। চল ভাই! আর এ রাজ্যে থাকিব না। আমি এ রাজ্যে থাকিব না।

আমি। চল। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আজ কালি অপূর্ব্ব গৌরবে গৌড়বাসিত। ঔষধের শিশির মধ্য হইতে কবি কিংবদন্তী উদ্ধার করিবার গৌরব কেহ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই,—তিনি নিজেই অতিভাবদে সে কাজটী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আজ মাঞ্চেষ্টার হইতে মকদ্দমার নথি-পত্র হইতে তোমার হার কবিকে আবিষ্কার করিয়া আমি বিচিত্র জয়মালো সুশোভিত হইতাম।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও মৌর্য্যবংশীয় তৃতীয় নরপতি। ২৬৩-২২৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে "রাষ্ট্রিক" জাতির উল্লেখ দেখা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে "রট্ট" জাতি মহারাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করে। তাঁহাদের নামানুসারে, তাঁহাদের অধ্যুষিত ভূভাগ মহারট্ট (মহারাষ্ট্র) নামে পরিচিত হয়। এই "রট্ট" জাতিই কালক্রমে "রাষ্ট্রিক" নামে পরিচিত হয়। রট্ট-বংশীয় বিভিন্ন পরিবার, পরস্পরের রক্ষণার্থ রট্টকূট (রাষ্ট্রকূট) নামে সম্মিলিত হয়। বন্ধু ভৃত্য ও স্বজন নরপতিগণের অধিকারকালে এই রাষ্ট্রকূট সামন্তরাজ বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীনতাপ্রিয় আবক্ষ বিস্তার করিয়া

ও কলচুরি বংশের অভ্যুত্থানের পর, সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রকূটগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কাম্বেম্বি পর্ব্বতসন্নিধানে এক বৌদ্ধচৈত্যে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের লিপি দৃষ্টে জানা যায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোন নরপতির রাজত্বের কত সনে লিখিত হয় বলিয়া, উক্ত তাম্রশাসনে নির্দ্দিষ্ট আছে। চালুক্য-বংশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটকুল দাক্ষিণাত্যে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া, জয়সিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন শত বৎসর রাষ্ট্রকূটবংশ চালুক্য সম্রাটদিগের পদানত থাকিয়া, পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত (৭৫৩—৯৭৩ খৃঃ) রাষ্ট্রকূটবংশ প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্য শাসন করিয়া, অবশেষে পুনরায় চালুক্যবংশের পদানত হন। মধ্য যুগে বহু সামন্তেরা বেলগাঁও জিলার সুগন্ধবর্ত্মা (সৌনদত্তি) প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

কোহ্লাপুরের সন্নিহিত সামলগড়ে দন্তিদুর্গের ন্যায়াঙ্কিত এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহা ৬৭৫ শকাব্দে (৭৫৩ খৃঃ) দন্তিদুর্গের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের পিতামহ গোবিন্দরাজ হইতে বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে। এলুরার গুহাবলম্বী শৈবতীর্থের মন্দিরে গোবিন্দরাজের পূর্ব্বতন দন্তিবর্ম্মা ও ইন্দ্ররাজের নাম খোদিত রহিয়াছে। দন্তিবর্ম্মা হইতে রাষ্ট্রকূট নরপতিগণের পারম্পর্য্যিক সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে। সামলগড়ের তাম্রশাসন ৬৭৫ শকাব্দের যাজ্ঞবল্ক্য রথসপ্তমীদিনে উৎকীর্ণ হয়। ইহার দ্বারা মহারাজ দন্তিদুর্গ শেলর (নেলর?) জনপদের অন্তর্গত দেউলবট গ্রাম বলিষ্ঠগোত্রীয় বেদবেদাঙ্গবিৎ নারায়ণ ভট্টকে প্রদান করেন। নারায়ণ ভট্ট করহটক* গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণভট্ট ও পিতামহের নাম ত্রিবিক্রমভট্ট। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, ৬৭৫ শকাব্দে ৮১১ সংবৎসর চলিত ছিল। নিম্নে এই শাসনপত্রের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

---

* Dr R. G. Bhandarkar's "Early History of Deccan" (1884), p. 9 and 35-37.

† করহটক নগরীর বর্ত্তমান নাম করাড় নামক গ্রাম। সাহিত্য-সম্পাদক।

যে কৃষ্ণরাজ এলাপুরে এক বৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এলোরের (ইলাদুর্গ) পর্ব্বতগাত্রে এই মনোহর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি গ্রাহপ্প নামক রাজাকে জয় করিয়া, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। তাঁহার শাসনপত্রে যুদ্ধিষ্ঠিরের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কৃষ্ণ হইতে রাষ্ট্রকূটবংশাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণরাজের বংশধর গুজরাটের রাষ্ট্রকূটনরপতি প্রথম কর্কের শাসনপত্রে ৭৯৪ সংবৎ (৮১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে কৃষ্ণরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র দন্তিবর্ম্মার উল্লিখিত না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। অল্পকাল পরেই কয়েক বৎসরের মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ধ্রুবরাজ নিরুপম, ধারাবর্ষ ও শ্রীবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধ্রুববর্ষ কাঞ্চীর রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার নিকট বিবিধ ও বহুমূল্য হস্তী রত্নাদি উপঢৌকন প্রাপ্ত করেন। চেরদেশীয় গঙ্গাবংশীয় রাজা তাঁহার পদানত হইয়া আত্মরক্ষা করেন। তিনি কৌশাম্বীর নরপতি বৎসরাজকে পরাজিত করেন। গৌড়বিজয়ের পর বৎসরাজ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়বিজয়ের দ্বারা যে ছত্র বৎসরাজের হস্তগত হয়, বিজয়ী ধ্রুবরাজ তাহা গ্রহণ করেন। বৎসরাজ মারোয়ারের দুর্গম মরুভূমির অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার বর্ত্তমান কালে কোশম নামে পরিচিত ও আনাহাবাদের সন্নিধানে স্থিত। অনুমান ৭৭০—৭৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই বৎসরাজ কনোজে রাজত্ব করেন। কৌশাম্বী ও বারাণসী সেই সময়ে কনোজের পদানত ছিল বলিয়া বুঝিতে হয়। ধারাপাটনের তাম্রশাসনে ধ্রুবরাজ 'নিরুপম' নামে পরিচিত হইয়াছেন। নিরুপম ধ্রুবরাজের রাজত্বকালে পট্টকলে এক প্রস্তর লিপি প্রদত্ত হয়। তাহাতে তিনি ধারাবর্ষ ও কলিবল্লভ নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

ধ্রুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য সবিশেষ প্রসারিত হয়। তাঁহার সাঁদেশে ৭২৯ সকাব্দে (৮০৭ খৃঃ) বরোডিওগ্রীব ও ৭৩০ সকাব্দে (৮০৮ খৃঃ) সাধনপুরের শাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়। এই দুই শাসনপত্র

---

† I. A. (XI. 125)

‡ J. R. A. S (V.) and Indien Antiquery (VI. 60)

ময়ূরখণ্ডী হইতে প্রচ্যুতিভ হয়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, ময়ূরখণ্ডী রাজধানী ছিল। মোরখণ্ডের পার্বত্য দুর্গ এখন নাসিক জিলার অন্তর্গত। এই দুই শাসনপত্রে ধ্রুবরাজের পূর্ব্বোক্ত অবদানপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। ধ্রুবরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিতীয় গোবিন্দরাজের নাম ইহাতে উল্লিখিত নাই। ধ্রুবরাজ উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভারসমর্পণের ইচ্ছা করিলে, যুবরাজ তাহাতে অসম্মত হন। তিনি জগত্তুঙ্গ, জগদ্ভুক্ত, প্রভূত, পৃথ্বীবল্লভ ও শ্রীবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি পিতার মৃত্যুর পর চেদিদেশীয় গাঙ্গেয়বংশজ বুদ্ধরাজকে কারাবদ্ধ করেন। ইহার পরিবর্ত্তে উক্ত চেদিরাজ গোবিন্দরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্থিত হইয়া, পুনঃ পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন। রাজপদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, মহান্ গোবিন্দের বিরুদ্ধে বাদল অন্য নরপতি সম্মিলিত হইয়া রাষ্ট্রকূট নাম আত্মগোপন করে। গোবিন্দ একাকী তাঁহাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত ও তাঁহাদের একতা ভঙ্গ করেন। গুর্জ্জররাজ নরপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া পলায়ন করে। মাহী ও তাপ্তি-নদীর মধ্যবর্ত্তী লাটদেশের শাসনকার্য্যে গোবিন্দরাজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে নিযুক্ত করেন। এই ইন্দ্ররাজের দ্বারা রাষ্ট্রকূটবংশ এক শাখা গুর্জ্জরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাটদেশের অধীশ্বর এই ইন্দ্ররাজের কর্কররাজ ও গোবিন্দরাজের প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন বরোদা ও কর্ম্মা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরোদার শাসনপত্র ৭৩৯ শকাব্দে (৮১২ কর্কররাজের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। কাবীর শাসনলিপি কর্কররাজের ভ্রাতা গোবিন্দরাজের আদেশে ৭৪৯ শকাব্দে (৮২৭ খ্রীঃ) খোদিত হয়।[১]

গুর্জ্জরাটে অধিকারের পর, তৃতীয় গোবিন্দরাজ মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মালবরাজ বিনা যুদ্ধে তাঁহার পদানত হন। অনন্তর তিনি সৈন্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা মারাশর্ব্ব বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। শ্রীভবনে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক কাঞ্চীর পল্লিব নামক পল্লবরাজকে পদানত করেন। চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজ কাঞ্চী নগরে আগমন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীদেশ এইরূপে বিনা রক্তপাতে গোবিন্দরাজের আধিপত্য প্রসারিত হয়।

[১] J. A. S. Bengal VIII, 286; and I. A. V. 147.

রাজ্যের পর উত্তরে মালব, দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে গোবিন্দ অনুনাব অধিকার বিস্তারিত হয়। নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ ইনোট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তুঙ্গভদ্রার তীরে প্রতিষ্ঠানে, গোবিন্দরাজ শিবধারীকে রামেশ্বর নামক পবিত্র স্থানে কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। ৭২৬ শকাব্দে (৮০৪ খৃঃ) ইহার দানপত্র উৎকীর্ণ হয়।

৮ তৃতীয় গোবিন্দরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজ্য ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি শর্ব্বদেব নামে পরিচিত ছিলেন। † মান্যখেট পরবর্ত্তী রাজধানী ছিল; কর্ত্তার শাসনপত্র দৃষ্টে এরূপ বোধ হয়। মান্যখেট নাম এক্ষণে মালখেড় নামে পরিচিত ও নিজামরাজ্যে অবস্থিত। শর্ব্ব — ক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শিলাহারবংশীয় পুল্ল- মনে এই অমোঘবর্ষের অধীনে কঙ্কণের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের (৮৫৩ খৃঃ) খোদিত পুল্লশক্তির নামাঙ্কিত এক শিলালিপি কাম্বেরির কণ্ঠিগহ্বরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য দুইখানি শিলালিপি পুল্লশক্তির পুত্র পল্লবীয় আদেশে ৭৯৯ শকাব্দে (৮৭৭ খৃঃ) অমোঘবর্ষের রাজত্বকালের ৬৩ গ্রহবর্ষে উৎকীর্ণ হয়। ‡ জৈনাচার্য্য গুণভদ্র সূরি জিনসেন সূরির শিষ্য ছিলেন। § গুণভদ্র 'মহাপুরাণ' নামক জৈন পুরাণের শেষভাগে অমোঘবর্ষকে জিনসেনের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

ভাব J. A. Xi. 126.

কে J. A, Xii. 184

অনু J. A Xiii. 133 And J. Bombay R. A. S. (V). Xiii. 17).

ই ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, "এই নৃপতির অপর নাম নৃপতুঙ্গ। শ্বেতাম্বর "সারস্বতগচ্ছ" নামক গণিতবিষয়ক জৈনগ্রন্থে নৃপতুঙ্গ অমোঘবর্ষকে জৈনদিগের "যাপনীয়" নামক পন্থের অনুবায়ী বলা হইয়াছে। এই নরপতি বৃদ্ধবয়সে রত্নমালিকা নামে ভাগবতনা করেন, দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

তাঁ বিবেকাত্যক্ত-রাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
(রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলঙ্কৃতিঃ।

—কন্নড় ভাষাতে এই রত্নমালিকার অনুবাদ হইয়াছে।—"সাহিত্য"-সম্পাদক।

"যস্ত পাদনখাংশু-জালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎপাদাম্ভোজরজঃপিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংপ্রাপ্তঃ স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং স শ্রীমান্ জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলং॥

এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ জিনসেনের দ্বারা ও তাবশিষ্টাংশ গুণভদ্র দ্বারা রচিত হয়। ৮২০ শকাব্দে (৮৯৮ খৃঃ) এই গ্রন্থ অকালবর্ষের রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়। মহাপুরাণ,—

অকালবর্ষভূপালে পালয়ত্যখিলাং মহীং।
তস্মিন্ বিধ্বস্তনিঃশেষবিঘ্নে ধর্ম্মমনোজুষি॥
* * * * *
শকনৃপকালাভ্যন্তরবিংশত্যধিকাষ্টশতমিতাব্দান্তে।
সিদ্ধার্থসংবৎসরে পিঙ্গলনামনি সমস্তজনসুখদে॥"

এই অকালবর্ষ অমোঘবর্ষের পর পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইনের শাসনপত্রে যিনি অকালবর্ষ নামে পরিচিত, তিনি কর্ত্তার কৃষ্ণরাজ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ কর্ক্কের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের জগত্তুঙ্গ বা জগৎরুদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। এই দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের অধীন সামন্তরাজ পৃথ্বীরাম সোনদত্তি নামক স্থানে এক জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৮১৫ শকাব্দে (৮৯৫ খৃঃ) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ধারবাড় জিলার অন্তর্গত মুলগুণ্ড নামক স্থানে এই কৃষ্ণবল্লভের রাজত্বকালে ৮২৪ শকাব্দে (৯০২ খৃঃ) আর একটি জৈনমন্দির নির্ম্মিত হয়। চিকার্য্য নামে জৈন বণিক কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। * কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত তিনখানি তাম্রশাসন ওভ-রাষ্ট্রের অন্তর্গত কাপড়বনজ নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৩২ শকাব্দে (৯১০ খৃঃ) বৈশাখী পূর্ণিমায় কুলপুত্রক অমৈসক দ্বারা উৎকীর্ণ হয়। কৃষ্ণরাজের অধীন হর্ষপুরের মহাসামন্ত প্রচণ্ডের শ্রীঅ অক্কুব ও তাঁহার দণ্ডনায়ক চন্দ্রগুপ্তের নাম এই দানপত্রের শেষভাগে লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ (অকালবর্ষ) ব্যাঘ্রাল নামে গ্রাম ব্রহ্মভট্ট নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। হর্ষপুর প্রদেশে ৭৫০খানি গ্রাম মহাসামন্ত প্রচণ্ডের শাসনাধীন ছিল। রাষ্ট্রকূট নরপতি কৃষ্ণরাজ বৈষ্ণব ছিলেন। এই শাসনপত্রে গরুড়ের মূর্ত্তি দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন। কৃষ্ণরাজ, ধ্রুবরাজ, গোবিন্দরাজ ও

* J. Bombay R. A. S. (X. 192, 200) and Epigrafia Indica (J. 52)

ষণ্ডরাজ অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় মাতুল চেদিরাজ শঙ্করগণের কুমারী লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কর্ডার শাসনপত্রের শঙ্করগণ সাঙ্গলীর দানপত্রে রণবিগ্রহ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হৈহয়বংশীয়া এই রাজকুমারীর গর্ভে দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গের পুত্র তৃতীয় ইন্দ্ররাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্ররাজ হৈহয়বংশীয়া রাজকুমারী অম্বার পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ কোক্কলের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্জ্জুনদেব। শঙ্করগণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই অর্জ্জুনদেবের পুত্র অঙ্কনদেব। ইন্দ্ররাজের পত্নী অম্বা এই অঙ্কনদেবের দুহিতা ছিলেন। রাজমহিষী অম্বার গর্ভে ইন্দ্ররাজের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম অমোঘবর্ষ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোবিন্দ।

ইন্দ্ররাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অমোঘবর্ষ পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চতুর্থ গোবিন্দরাজ এক বৎসর কাল পরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। গোবিন্দরাজ সাহসাঙ্ক ও সুবর্ণবর্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতি দানশীল ছিলেন। তিনি বহুতর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মান্যখেটে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মান্যখেট হইতে ৮৫৫ শকাব্দে (৯৩৩ খ্রীঃ) সাঙ্গলীর দানপত্র প্রকাশিত হয়। সাঙ্গলীর তাম্রশাসনে গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমোঘবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

চতুর্থ গোবিন্দরাজের পর তাঁহার পিতৃব্য বদ্দিগ তৃতীয় অমোঘবর্ষ নাম-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বদ্দিগ জগত্তুঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র ও ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তৃতীয় অমোঘবর্ষের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় কৃষ্ণরাজ রাজপদ লাভ করেন। এই কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত এক শাসনপত্র সালোটগি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৮৭ একাব্দে (৯৪৫ খ্রীঃ) মান্যখেট হইতে কৃষ্ণরাজের আদেশে প্রচারিত হয়।† এই কৃষ্ণরাজের নামান্তর কহ্নরদেব। ভক্কোল নামক স্থানে চোল নরপতি রাজাদিত্য এই কৃষ্ণরাজের সহিত সমরে পরাজিত ও নিহত হন। গাঙ্গ-বংশীয় পরমান্দীবুটুগ গঙ্গবাড়ী দেশের রাজা রাজমল্লকে সমরে নিহত করিয়া তৃতীয় কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক বনবাসী প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। বনবাসী

* I. bombay R. A. S. IV. 111.
† I. A. I. 205.

এক্ষণে উত্তর কানাড়া জিলায় অবস্থিত। এই পরমারবুটুগ অট্টুকুর গ্রামে কিছু ভূমি চন্দ্রেশ্বর শিবের পূজার্চ্চনানির্ব্বাহার্থ ৮৭২ শকাব্দে (৯৫০ খ্রীঃ) প্রদান করেন। অট্টুকুর মহীশূর প্রদেশে অবস্থিত, এবং আটগড় নামে এক্ষণে পরিচিত। * ইহাতে কৃষ্ণরাজ অমোঘবর্ষের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণরাজের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খোটিকদেব রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি অমোঘবর্ষের পত্নী কল্যাণদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্দক-দেবী চেদিরাজ যুবরাজদেবের তনয়া। খোটিকদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কলদেব রাজাসনে আসীন হন। তাঁহার পিতার নাম নিরুপম। কক্কলদেব রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ নরপতি। ৮৯৪ শকাব্দে (৯৭২ খ্রীঃ) কর্ড্ডার শাসনপত্রে এই কক্কলদেবের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খ্রীঃ) এই কক্কলদেবকে সমরে পরাজিত করিয়া, তৈলপরাজ চালুক্যবংশের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাষ্ট্রকূটনরপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া খারেপাটনের শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। রাষ্ট্রকূট-নরপতিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন চালুক্যবংশীয় ভূপালদিগের ন্যায় আপনাদিগকে 'পৃথ্বীবল্লভ' ও 'বল্লভ-নরেন্দ্র' নামে পরিচিত করিয়াছেন। লক্ষ্মেশ্বরের শাসনপত্রে তৃতীয় † গোবিন্দরাজ 'শ্রীবল্লভ' ও রাধনপুরের শাসনপত্রে 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সাঙ্গলীর শাসনপত্রে চতুর্থ গোবিন্দ ও কর্ড্ডার শাসনপত্রে কক্কল-দেব 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লভনরেন্দ্র ও বল্লভরাজ পদ একার্থ-প্রতিপাদক। 'বল্লভরাজ' পদ প্রাকৃতে 'বল্লভরায়', 'বল্লহরায়' ও 'বল্লরায়' পদে কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মান্যখেট রাষ্ট্রকূট-নরপতিদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিক-গণ নানকিরের 'বলহরা' নামে রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতিগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হলায়ুধ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বরচিত "কবিরহস্য" নামক কাব্যে রাষ্ট্রকূট-বংশ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের অবদানাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* Epigraphia Indica II. 167.

† ৬ষ্ঠ গ্রাম ধারবাড় জিলার মিরজ নগরের সন্নিহিত। "সাহিত্য"-সম্পাদক

অস্তাগস্ত্যমুনিদ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।
কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজা সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥
সোমং সুনোতি যজ্ঞেষু সোমবংশবিভূষণঃ।
তোলয়ত্যতুলং শল্যা যো ভারং ভুবনেশ্বরঃ।
কস্তং তুলয়তি শ্লাঘ্যা রাষ্ট্রকূটকুলোদ্ভব॥—কবিরহস্য।

এই কৃষ্ণরাজকে বিজয়নগরের অধীশ্বর কৃষ্ণরায় বলিয়া ডাক্তার ওয়েষ্টারগার্ড ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটনরপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে সমাপ্ত করা গেল। ভবিষ্যতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশের বিষয় সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া, পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

থ্যাকারে।

থ্যাকারের কন্যা শ্রীমতী রিচি পিতার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন; তদুপলক্ষে নানা পত্রে সেই চিরমধুময় ঔপন্যাসিক ও পরিহাসরসি সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয়, এ সময়ে সেই সকল আলোচনা করিয়া থ্যাকারের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

থ্যাকারের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ডিকেন্সই তাঁহার একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে পাঠকসমাজে ডিকেন্সেরই আদর অধিক ছিল, বঙ্গের আয় ও আমেরিকায় থ্যাকারের আদর বাড়িতেছে। ভরা গাঙ্গে ভাঁটা পড়িয়াছে; আর থ্যা পুরা জোয়ার প্রবেশ করিয়াছে।

ডিকেন্স ও থ্যাকারে।

থ্যাকারের ইচ্ছাক্রমে, আজিও তাঁহার কো কলের যশে বিষয় লিখিবার স অপরের মরা গাঙ্গে কিন্তু কেহ তাঁহা রিতেন না; মানুষের স্বভাবসিদ্ধ চরিত রচিত হয় নাই। জীত হইতেন।

জীবনচরিতের আতঙ্ক।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই কলিকাতা সহরে থ্যাকারে ভাবিলে, তিনি আমিলে থ্যাকারে বংশ এ দেশে বিশেষ প্রভাবশালী ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসেন। তিনি পুরাতন কাগজপত্রে তাঁহার পৌত্যের ও দৌহিত্রের উল্লেখ দেখিয়াছে পিতামহ থ্যাকারের পাঁচ পুত্র; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন নেপালযুদ্ধে নিহত হয়েন। আর সকলেই সিভিল বিভাগে নিযুক্ত

ত্তিয়া কোম্পানির স্যাসিকের পিতামহ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম হক্টার বলেন যে, ত্রিশ ও অন্ততঃ চতুর্দ্দশ কাহারও কাহারও মতে, সিবিভাগে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। পুরাতন কাগজ-

বংশবৃত্তান্ত।

খানা স্থাপন করিল, দক্ষিণ-পশ্চিম মাদ্রাজের সৈকত হইতে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই থ্যাকারে-বর্ণিত সৈনিকদিগের উদ্দেশ পাওয়া যায়।

পাঁচ বৎসর বয়সে থ্যাকারে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েন। এত অল্প বয়সে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাঁহার উপর তাঁহার জননীর প্রভাবের হ্রাস হয় নাই; হন্টার বলেন,—"Divided by half the world he clung to her memory." যদিও থ্যাকারে আর এ দেশে আসেন নাই, তথাপি তাঁহার বহু গ্রন্থ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্রে পূর্ণ। কিপ্লিং ব্যতীত আর কোন ইংরাজ লেখকের পুস্তকে এত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। মেড্‌লী, কর্ণেল নিউকাম, মেকেঞ্জী প্রভৃতি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র থ্যাকারের পাকীয় বন্ধুবর্গের আদর্শে চিত্রিত। তখন ইংলণ্ডে একটা উপকথা প্রচলিত ছিল যে, ভারতবর্ষে প্যাগোডা নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহা নাড়িলেই মোহর পড়ে; একবার ডাল নাড়িয়া তার পর কুড়াইয়া লইলেই হইল। ভারতপ্রত্যাগত "নবাব" নামে আখ্যাত ইংরাজদিগের ঐশ্বর্য্যাতিশয্য হইতেই এই উপকথার উৎপত্তি। কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা সত্য; ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষ তখন "লুটের বিলেত" ছিল; সাধু অসাধু বিবিধ উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে গিয়া "নবাব" সাজাই তখন ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র থ্যাকারের বর্ণনায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন ঐতিহাসিকের রচনায় তেমন ফুটে নাই। তাঁহার রচিত O'Dowd গল্পী, ব্যাণ্ডিপাণ্ডিপাণ্ডী Sedley, রমণলাল প্রভৃতি চিত্র অমর। শুনিতে পাই, রমণলাল চরিত্রের আদর্শ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, কর্ণেল নিউকাম চরিত্রের আদর্শ তাঁহার জনৈক দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কটী মেজর কলমাইকেল স্মিথ। Union Bank of Calcutta দেউলিয়া হওয়ায় থ্যাকারে পরিবারের অনেকেই বিশেষ [illegible] হয়েন; থ্যাকারের পৈতৃক অর্থ যাহা কিছু ছিল, তাহাও যায়। থ্যাকারের পুত্ত [illegible] বুদ্ধিবলেই বাঁচিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছু দিন [illegible] পর থ্যাকারে কেম্ব্রিজে গিয়া ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। [illegible] বিদ্যালয়ের কোনও উপাধিলাভ ঘটে নাই। কেম্ব্রি [illegible] কে এই [illegible] কিছু দিন আইন অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে [illegible] উত্তীর্ণ হয়েন। বলা বাহুল্য, আইন-ব্যবসায় তাঁহার [illegible] তিনি চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য প্যারিসে ও [illegible] সংবাদপত্রলেখার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। [illegible] যদে "ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিন্" পত্রে তাঁহার [illegible] প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের [illegible] বিষয় এই যে, [illegible] প্রকাশিত হয়। এই সময় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় তিনি বিবাহ করেন [illegible] হইতে তাঁহার যে বার্ষিক পাঁচ শত পাউণ্ড আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। Yellow Plush [illegible] ক, বিশেষ কৌতুকর হইলেও, সাহিত্যসম্রাজ্ঞীর পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক হয় নাই; কারণ, থ্যাকারে [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, থ্যাকারে যেরূপ অর্থনপ্রকৃতির [illegible] আমার পৈত্রিক [illegible] হইতে উদরান্নের জন্য সাহিত্যসেবা করিতে না হইলে, তিনি বোধ হয় [illegible]। এই [illegible] জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাঁহার [illegible] ছিল, তখন কষ্টে পড়িয়া তিনি সাহিত্যই অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিলেন।

জীবনবৃত্ত ও সাহিত্য-সেবা।

রচনার বিষয়।

"টাইম্‌স্" পত্রে থ্যাকারের হাতেখড়ি; কিন্তু "পঞ্চ"ই চিরদিন তাঁহার প্রিয় পত্র। পঞ্চেই তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থ্যাকারের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই মাসিক খণ্ডের আকারে Vanity Fair আরম্ভ হয়। ভ্যানিটি ফেয়ার প্রকাশিত হইবার পরই থ্যাকারের যশ প্রায় ডিকেন্সের যশের সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর ক্রমে দুই-দুই বৎসর অন্তর Pendennis, Esmond, The Newcomes প্রকাশিত হয়। Esmond একেবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর দুইখানি মাসিকপত্রে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি কিছু দিন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ পরিহাসরসিকদিগের সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাও—The Four Georges কখনও অনাদৃত হইবে না। যে দেশে ভাল পুস্তকও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়, সে দেশের লোককে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়াও উপযুক্ত লোকের যথেষ্ট অর্থাগম হয়?

রাজনীতি, সাহিত্য ও সংবাদপত্র।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসেবা পরিহার করিয়া তিনি উদারনৈতিক দলের অক্সফোর্ডের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া পুনশ্চ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া The Virginians প্রকাশ করেন। প্রায় ২৩ বৎসর সম্পাদনের পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি Cornhill Magazine পত্রের ভার পরিত্যাগ করেন। থ্যাকারের প্রথম কবিতা পাওয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম,—

মটন চপের মতন প্রণয়— যবে কোন কৃষী, রমণীর তবে
ক্ষরিতে শীতল হয়; প্রেমানলে গবে জ্বলে,
সব আবিলতা হয় ব্যথাময়; বাঁধিতে তখন চাহে সে তাহারে
না হতেই পুরাতন। পরিণয়-সুশৃঙ্খলে;
কিন্তু বেদনার মতন প্রণয়, সুবিধা পেলেই বিবাহটা তবে
তারে সহা, হায়, সহজ ত নয়। হায়, হতভাগ্য লাফাইয়া পড়ে
ব্র্যাণ্ডি-ব্যবহারে দু'ব্যথাই সারে— ফটাহ ছাড়িয়া খেয়েতে যাইয়া
যেমন করি শ্রবণ। উনানে দীপ্ত অনলে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে থ্যাকারের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ থ্যাকারেকে হৃদয়হীন Cynic বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু দিবস পরে ডিস্রেলী স্বীয় St. Barbo পুস্তকে বলিয়াছেন, থ্যাকারে Pushing, ভণ্ড, দম্ভ ও নীচমনা ছিলেন। এ বর্ণনা সেই নীচমনা চরিত্রের ইতরেরই উপযুক্ত; তিনি বোধ করি, সকলকেই আপনার মত ভাবিয়া বিচার। তেন। তাঁহার নীচতার বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদের নাই; যাঁহারা সে বিবরণ দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ওকনরের ডিস্রেলী-চরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। থ্যাকারে যত দিন কর্নহিল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন দুঃখী ও অক্ষম লেখকদিগের রচনা পত্রস্থ করিতে না পারিলেও আপনি তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতেন। ইহাই কি হৃদয়হীনের নীচতা?

কেহ কেহ বলেন, থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী নহে। যদি মানব-চরিত্রের নিখুঁত খাঁটি বর্ণনা স্ত্রীলোকের পাঠ্য না হয়, তবেই থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠের অনুপযোগী;—নহিলে নহে।

থ্যাকারের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস—Vanity Fair, আর সেই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান চরিত্র—বেকি সার্প। থ্যাকারের তুলিকায় সে চিত্র যেমন ফুটিয়াছে, কোনও উপন্যাসিকের তুলি-

কার কোনও চরিত্র ভেবন ফুটিয়াছে কি না সন্দেহ। সমালোচক হেডরিক হ্যারিসন বলেন যে, বেকি সার্প চরিত্র যদি ফলষ্টাফ ও সাইক্লক চরিত্রের মত না হয়, তথাপি স্কোয়ার ওয়েষ্টার্ন, টোবী ও স্যাম্ ওয়ালার চরিত্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উপন্যাসগুলির কোনও চরিত্রেরই বাধ্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হয় নাই। বেকি সার্পের বুদ্ধির প্রাখর্য্য, রসিকতা, কার্য্যদক্ষতা, অসীম সাহস, ধূর্ত্ততা, স্থির ও কর্ম্মশীল মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, যেখানে তাহার অর্থে আঘাত না লাগে, সেখানে তাহার সুবিচারপ্রিয়তা ও যেখানে কোনও ক্ষতি নাই, সেখানে তাহার সততা, অতুলনীয় ও অনুকরণের অতীত।

বেকি সার্প।

Esmond ও The Newcomesএর গ্রন্থকর্ত্রী কখনই Misanthrope হইতে পারেন না। ইংরাজ পরিহাসরসিকদিগের সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় তিনি সদাই সরল ও সদানন্দ। থ্যাকারের ন্যায় বন্ধুবৎসল লোক কখনই cynic ও misanthrope হইতে পারে না। আমি থ্যাকারের কুৎসাকারীরা বিস্মৃতির কোন অতল তলে চিরান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর থ্যাকারের যশঃসূর্য্য সাহিত্যগগনে পূর্ণমহিমায় বিরাজ করিতেছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তিব্বত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Abbe Hue চীন ও তিব্বতের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়েল্‌বি ও তাঁহার সহযাত্রী লেফ্‌টেনাণ্ট বাম্‌রুন্ "অজ্ঞাত" তিব্বতের মধ্য দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৮০ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই সঙ্কটসঙ্কুল কষ্টসাধ্য ভ্রমণ স্যামুয়েলের মেরুভ্রমণের সহিত তুলিত হইতে পারে। সচরাচর ভ্রমণকারীরা আপনাদের ঈপ্সিতসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; কিন্তু এই দুই জন সর্ব্বতোভাবে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প ছিল যে, মধ্য এসিয়া উপত্যকাভূমির পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া আধুনিক মানচিত্রে 'অজ্ঞাত'-চিহ্নিত দেশে ইয়ার্কিন্দিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিয়া, সেদাম্ পাহাড় হইয়া, হোয়াংহো নদী বাহিয়া, চীনের বিখ্যাত প্রাচীর পার হইয়া, "স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের" রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন। শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্য, অনাহার ও পানীয়শূন্য মরুবসতিবিরল পথের সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, ইংরাজ সৈন্যের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা ও প্রকৃষ্টতা সহকারে ইঁহারা অভিলষিতলাভে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে, লেনসয় হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া যাত্রা করেন, এবং ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে পিকিনে উপস্থিত হয়েন।

তাঁহারা ভারবহনের জন্য বাইশটি কষ্টসহ অশ্বতর ও আরোহণের জন্য সতেরটি পোনি ঘোড়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। পরিচর্য্যা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য নয় জন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওয়েল্‌বি ও সাল্‌কাম্ ব্যতীত বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেণ্টের "নন্‌কমিশণ্ড অফিসার" সাহাদমীর ভ্রমণকারীদিগের দলে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ শিবরহিত পথে তিনি ইঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিলেন। অশ্বতরচালকেরা প্রথম হইতেই অবিশ্বাসী ও অবাধ্য হইয়াছিল। অনুচরবর্গের মধ্যে লাহো ও ইসা আরেঙ্গ (যাহাকে সংক্ষেপতঃ ইসু বলিয়া ডাকা হইত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ছিল। তাহারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-

প্রণোদিত হইয়া এরূপ হইয়াছিল, তাহা নহে—যাত্রার প্রথম হইতেই [illegible] চারকদিগের সহিত তাহাদের মতান্তর হওয়াতেই তাহারা বিষণ্ণ ও [illegible] দাঁড়ায়।

লে হইতে যাত্রা করিয়া ভ্রমণকারীরা প্রথমে উত্তর তিব্বতের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন; পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় পঁহুছিয়া উত্তরপূর্ব্ব দিকে চলিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণের প্রথম দুই মাস তাঁহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ কোন কষ্ট পান নাই। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভ্রমণের এই অংশের বর্ণনা এইরূপ;—"পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমাদিগের পরিহিত বসন বেদসিক্ত হইয়া উঠিত; সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয়। অবশেষে আমরা জামা খুলিয়া অনাবৃতগাত্রে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একটু বাতাস পাইব, এই আশায় মস্তক ধরিয়া পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া থাকিতাম। চাবি দিতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইত। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের বিপদাপত্তির বড় সুবিধা হইত না। আমাদিগের পথ বড় কষ্টকর। অনেক সময়ে ঠিক সরলভাবে পর্ব্বতপার্শ্বে উঠিতে হইত। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৭০০০ ফিট। দলের সকলের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা প[illegible] অপর দিকে [illegible] আরম্ভ করিলাম। সহসা অত্যন্ত শীতপ্রধান দেখে উপস্থিত [illegible] লাগিল। শীতল বাতাসে আমাদের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন [illegible] পর্ব্বতগাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেখানে এ[illegible] ল দে, তুষারঝটি সহ্য করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই [illegible] গণ্য কোথায় উপযোগী স্থান দেখিতে পাইয়া আর [illegible] হইয়া আসিল। শীত আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু [illegible] খিতে পাইলাম না। তাহাদিগকে আমাদের অবস্থান- [illegible] পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম। অবশে[illegible] তাঁহারা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অশ্বতরগুলির মধ্যে কত[illegible] কিন্তু অন্যগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। [illegible] ারে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন তাহাদিগকে ফেলিয়া অগ্রসর [illegible] উপায়ান্তর ছিল না।'

প্রথম প্রথম পর্ব্বতীয়েরা তাঁহাদের ভ্রমণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। সুলাজ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের দলপতি বলিল, তাহারা পরবর্ত্তী গ্রাম 'পাল'এ যাইবার রাস্তা জানে না; এমন কি, সে গ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অনেক বাদানুবাদের পর বলিল, সে পথ একবারে অগম্য। পরে এক দল সশস্ত্র লোক আসিয়া পথপ্রদর্শক দুইকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল ও ভ্রমণকারীদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে, অগ্রসর হইলেই বিপদ ঘটিবে। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটি বাঁক ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ত্রেং হ্রদের নিকট তাঁহাদিগের গমনে বাধা দিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক লোক জমা হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান অস্ত্র পুরাতন প্রথার নিদি[illegible] বন্দুক। কিন্তু সেগুলি একটি দণ্ডের উপর রাখিয়া তাহার অব্যর্থসন্ধানে গুলি ছুড়ি[illegible] পারে। তাহারা যেতকায়দিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য সেইপার্শ্বে নানা[illegible] গণ করিয়াছিল। কাপ্তেন ওয়েলবির অশ্বতরচালকেরা এই সময়ে ভীরুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। যদিও তাহাদিগকে গুলি ও বকসিস দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজেই পরাভূত হইল। বাধাপ্রদানকারীরাও মরিয়া হইয়াছিল। তাহাদের

[illegible] [illegible] [illegible] [

তাহাই আহার করা হইত। প্রাণী সকল মহম্মদীয় প্রথায় জবাই করা হইত না বলিয়া অনেকে মাংসাহারে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভাগভুক্ত এ আপত্তি অধিক দিন টিকে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম হইতেই অবাধ্য ছিল। মহম্মদ রহিম নামক একজন অশ্বতর-চালককে পথ খুঁজিতে পাঠান হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ন্যায় দীর্ঘকায় বলবান লোককে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়াছিল। অবশেষে সে অনেক ঢোঁপাইয়া বলিল, "আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" গোলাম হোসেনের অধীনস্থ লোকেরা একদিন দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহারা দিন কয়েক ভ্রমণকারীদের কাছে কাছে ছিল, ভাবিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু পাছে তাহারা অবশিষ্ট অশ্বতরগুলি চুরি করে, এই ভয়ে পথিকারীরা আর তাহাদিগকে দলভুক্ত করেন নাই। ইতিপূর্ব্বেই অশ্বতর ও গো[illegible] একুনে পনেরটি মাত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে বিরক্ত হইয়া তিনি [illegible] অবশিষ্টগুলি মরিয়া যায়। এই সময়ে দ্বারবাহী জন্তুর অভাবে ভ্রমণকারীরা [illegible] হইয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অন্য কো[illegible] মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শীত ও প্রীষ্মের দুর্ব্বিষহ আতিশয্যবশতঃ এই সব [illegible]নের ভূমি অনুর্ব্বর ও জনবসতি বিরল। পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় তিব্বতে [illegible] বণিকদলের সহিত ভ্রমণকারীদের সাক্ষাৎ হয়। লেখক বলিতেছেন, তাহাদের দলপতি মেষিতে অতি সুন্দর ও দীর্ঘকায়—উচ্চে প্রায় ছয় ফিটেরও অধিক। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকায় লোক আমরা এ দেশে দেখি নাই। দলের মধ্যে সে কুসক নামে পরিচিত। তাহার যথার্থ নাম জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে বৃদ্ধগণ জীবিতাবস্থায় এই নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এখন ইহা কেবলমাত্র স্নেহ ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কুসকের দলে পণ্যদ্রব্যবাহিগণের পনের শত খ্যাক ছিল। ভ্রমণকারীরা কিছু দিন এই দলে গমন করিয়াছিলেন। কুসক ইহাদের আগমন শুনিয়াই বলিয়াছিল, ইহারা হয় ইংরাজ-জাতীয়, অথবা রুষীয়; অন্য কোনও জাতীয় লোক এইরূপ কষ্টসাধ্য ভ্রমণে বাহির হয় না। কুসকের সহিত প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা এইরূপ;—"তাহারা আমাদিগকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। পরে একজন ভৃত্য উষ্ণ-চা-পূর্ণ এক একটি পাত্র আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিল। তাহাতে সে মাখনের এক একটি ছোট পিণ্ড ফেলিয়াছিল ও চূর্ণ-বার্লি-পূর্ণ একটি থলিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল। আমরা প্রত্যেকে কয়েক চামচ চূর্ণ লইয়া চায়ে মিশ্রিত করিলাম ও তাহাতে আবশ্যকমত লবণ দিলাম। পরে সেই ভৃত্য আমাদের কিছু 'চপ্‌টিক' আনিয়া দিল। তখন আমরা সাগ্রহে আহার আরম্ভ করিলাম। সে দিন আমরা যে পরিমাণে আহার করিয়াছিলাম, সাধারণে বোধ হয় তাহা বিধান করিতে সম্মত হইবেন না। তাহারা পরে আমাদিগকে পণ্যদ্রব্যের স্তূপের উপর শয়ন করিতে দেয়; কিন্তু আমাদের তাহা প্রীতিকর না হওয়ায় রাত্রে উঠিয়া তাহাদের তাম্বুতে শয়ন করি। ইহাতে যদিও তাহারা বিরক্ত হইয়াছিল, তথাপি কিছু বলে নাই।"

তিব্বতীয় বণিকদের ব্যবহার মোটের উপর মন্দ নহে। তাহারা ভ্রমণকারীদিগের কোনও অনিষ্টচেষ্টা করে নাই। তাহারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি; মনোভাব গোপন রাখিতে বিশেষ চেষ্টিত। কিন্তু দয়াধর্ম্মশূন্য নহে।

বদোলীর যাযাবরদিগের নিকট ভ্রমণকারীরা ইহা অপেক্ষা সাদর আতিথ্য প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। ইহাদের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ এইরূপ ;—"কয়েক দিন অনাহারে ভ্রমণের পর একটি ঘন ঝোপের অন্তরালে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বিবৃত করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় নাই। কতকগুলি ছোট বালক ও বালিকা চারণক্ষেত্র হইতে এক দল সুন্দর মেষ তাড়াইয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। তাহারা পর্য্যাণশূন্য ছোট ঘোড়ার উপর চড়িয়া যাইতেছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহারা কিছুই জানে না। মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল। আমি গোপনে এই সুখময় শান্তিপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটা অসঙ্গত চীৎকারে কিরিয়া সহসা আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা প্রথমে বড় ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভীতি শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল। যাযাবরেরা অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সহিত অতিথিসৎকার করিয়াছিল। ইহারা ন্যায়পর, অতিথিবৎসল ও দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের আলার ব্যবহার বেশ সাদাসিদা রকমের। ভ্রমণকারীদিগের অসম্ভব ক্ষুধা দেখিয়া তাহারা নীরবে হাস্য করিয়াছিল। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম ;—রন্ধনশালা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছি না। * * * গৃহস্বামী অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি কম্বল বিছাইয়া আমাদিগকে বসিতে দিলেন, এবং একটি পাত্রের ঢাকা খুলিয়া আমাকে এক খণ্ড সিদ্ধ ছাগমাংস দিলেন। খাইতে খাইতে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন আমাকে আর এক খণ্ড দেওয়া হইল। তাহাও অচিরে "ধ্বংসপুরে" প্রেরিত হইল। গৃহস্বামী আমাকে আরও খাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অতিশয় লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

এই মোগল জাতির বিবাহ ও সমাধিপ্রথা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী স্বামী এক জন বন্ধুকে দিয়া কন্যার পিতার নিকট একখণ্ড মসলিন কাপড় পাঠাইয়া দেন। ইহাকে কাবটাগ্ বলে। যদি কন্যার পিতা তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জানা যায় যে, বিবাহ হইবে। তখন বর শ্বশুরকে অর্থ, মদ্য প্রভৃতি উপঢৌকন দেয় ও অবিলম্বে বধূকে গৃহে আনয়ন করে। কোন মঙ্গোলীয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার শব মুক্ত প্রান্তরে নীত হয় ও তাহার মুখের ভিতর এক-খণ্ড আগড় গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পরে পক্ষী ও কুকুরেরা শবদেহের মাংস খাইয়া ফেলে। তখন মৃতের বন্ধুরা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট অস্থিগুলি চূর্ণ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেয়। তিব্বতে তিন প্রকার সমাধিপ্রথা প্রচলিত। সাধারণতঃ শবদেহকে কোনও পাহাড়ের উপর আসনপীড়ি করিয়া বসাইয়া রাখা হয়। পরে তৎপার্শ্বে গভীর গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শবদেহ তথায় বিহঙ্গের ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

উষা।

সুপ্ত রাত্রি ; চারি দিক শব্দহীন ; সুদূর নির্জ্জন,
যোগিবর যোগেশের যোগমগ্ন হৃদয় যেমন।
বিগতবিরাবরব বিহঙ্গেরা পশেছে কুলায় ;
মুদিত কমল মাঝে প্রান্তদেহ ভ্রমর ঘুমায় ;
সুষুপ্তিমুদিত আঁখি প্রাণিকুল নুমে অচেতন,
নিশীথনিশায় কত দিবসের শ্রমনিবারণ ;

স্বপনসঙ্গীত সম আসে শুধু পত্র-মরমর,
উপলব্যথিতগতি নির্ঝরের কল গীতস্বর ;
দু'একটি পাখী ডাকি চন্দ্রকরে অরুণ-কিরণ
ঘুমঘোরে গীতস্বরে ঢালিতেছে আনন্দবেদন ;
গিরিমল্লিকার বাসে পূরবাসী নৈশসমীরণ
প্রত্যূষ কুসুমকুলে দোলাইয়া করে বিচরণ।
জ্যোছনা-প্লাবিত ঊর্দ্ধে শোভিতেছে অনন্ত অম্বর,
দিগন্তবিহীন যেন সীমাহীন ফেনোদ্ধ সাগর,
পথহারা একখানি শীর্ণদেহ শ্বেত জলধর
আলসে বিরাম লভে দূর অদ্রিশিখরের পর ;
ধবল তুষাররাশি শনধব-কর-পরশনে
দেখাইছে জ্যোতির্ম্ময় সীমাহীন নির্ম্মলগগনে।

মধুর কুসুমরাশি একতান স্নেহ আবরণ
পর্ব্বতের সানুদেশ করিয়াছে স্নেহে আচ্ছাদন।
বিষাদমলিনমুখ, নতদৃষ্টি, মৃদুমন্দগতি,
হরপ্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী একাকিনী আইলা পার্ব্বতী।
সুকঠিন শিলাগাত্রে ব্যথিত সে চরণপরশে
ফুটিল কুসুমকলি আত্মহারা আকুল হরষে,
রাতুল চরণে যেন বসুধেরা দিল উপহার
কুসুমময়মারাশি আপনার ভক্তি-অর্ঘ্যভার।
চরণচুম্বিত কেশে কর্ণিকার শোভা নাহি পায়,
আঁধার কেশের ভ্রান্তি অযতনে চরণে লুটায় ;
সে কমল-করে আর নাহি শোভে লীলার কমল ;
আভরণহীন কর্ণে আর নাহি শোভে কর্ণোৎপল ;
স্মিতহাস্য আর নাহি ফুটি রহে অধরযুগলে ;
থাকি থাকি আঁখি দুটি ভাসি উঠে নয়নের জলে ;
সতত চঞ্চল আর নহে এবে লীলাঞ্জনয়ন,
ধরাতলবদ্ধদৃষ্টি চাহে শুধু রাতুল চরণ ;
সুকোমল গণ্ডে আর নাহি শোভে রক্তিম বরণ ;
প্রবাল অধরযুগে রক্ত আভা মলিন এখন ;
তরুণ-অরুণরাগ বাস নাহি শোভে অঙ্গে আর,
শিরীষকোমল দেহ বেষ্টিয়াছে বল্কলের ভার।
তপস্যার তীব্র তাপে খিন্ন এবে নবীন যৌবন,
অকালজলদোদয়ে ম্লানমুখ পঙ্কজ যেমন।

শ্রান্তদেহ ধীরে ধীরে শিলাপরে করিয়া স্থাপন
তুলি নতদৃষ্টি দেবী—সানুপ্রান্তে করিলা দর্শন—
নমেরুবেষ্টিত চারু তপোবন, যেথায় নিয়ত
যোগমগ্ন মহাদেব ত্র্যম্বকেশ বাহ্যজ্ঞানহত ;

মন্দ-বহে পবন বেগে ফুটাইতে কোরকনিচয়ে
সেই পুণ্য তপোবনে—ত্র্যম্বকের তপোভূমিতে;
তুলি পাখী নাহি গাহে, তুলি বেগে না বহে পবন,
আরি শ্মশানশয়ানে শবদের ভ্রূকুটী ভীষণ;
যোগমগ্ন চন্দ্রচূড়, চারি দিক নিস্তব্ধ নিশ্চল—
আলেখ্যে লিখিত যেন তপোবন রয়েছে কেবল।
সলিলসন্থিত আঁখি চাহি ক্ষণ সানু প্রান্তদেশে
কহিতে লাগিল দেবী মৃত্যুঞ্জয় কপর্দ্দী উদ্দেশে,—
বেদনাকম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারিত স্বর
তুলিল প্লাবিত করি শব্দহীন অসীম অম্বর,
বীণাবিনিন্দিত স্বর শব্দহীন গভীর নিশায়
ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে উঠি মিলাইল তারায় তারায়—

"ছাড়ি গৃহ, পরিজন, একধ্যানে মগ্ন নিরন্তর
তোমার পাব না আমি কখনো কি—জন্মজন্মান্তর?
শুকায়েছে দেহে মোর যৌবনের সৌন্দর্য্যনিকাশ
তুমি না দেখিলে তাহা, হে বাঞ্ছিত, কেবলি আপদ!
তবঙ্গউত্থানহীন সিন্ধু সম ও তব হৃদয়;
কাহারো পরশে, দেব, হবে না কি চিত্তবিলালয়?
নিবাত প্রদেশে স্থির শিখা সম ধ্যানমগ্ন মন
ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের তরে কাঁপিবে না কভু কি কম্পন?
বর্ণবিহীন যদি মোদের প্রণয় তোমার
ক্ষুদ্র একবিন্দু প্রেম বর্ষিবে না কভু একবার?
ওই চন্দ্রকর ধৌত অভ্রভেদী গিরিচূড়া সম
তুমি কি বধির, দেব, হৃদয়ের প্রার্থনায় মম?
তুমি কি উহারি মত প্রাণহীন,—নমতাবিহীন,
আর কিছু নাহি চাহ, আপনাতে আপনি বিলীন!
তবু ত ও গিরিচূড়া আশ্রিতেরে দিতেছে আশ্রয়
হিমরাশি, বারাধর লভে হোথা বিশ্রামনিলয়।
তুমি কি অনধিগম্য, গিরিশ্রেষ্ঠ, রহিবে কেবল;
ফিরিবে তোমারে ঘিরি জন্ম জন্ম বাসনা বিফল?
হে অব্যয়, হে স্বয়ম্ভু, তুমি কিগো কেবলি ভীষণ—
তব জটাজূটলীন বাসুকির ভুজঙ্গ যেমন?

আর কি নাহি আশা, শুধু তব নয়নাকিরণে
ফুটেছে যে প্রেম, সেই উপহার রাঙ্গাচরণে।
মৌলিবাসী সুরধুনী শিরে তব শোভে, দয়াময়,
আমি শুধু চাহি, শূলী, মোক্ষদায়ী চরণে আশ্রয়।
ভক্ত যদি ভক্তিভরে বিল্বপত্র দেয় পদমূলে
প্রফুল্লরাজীবসরে,—ভক্তিপ্রেম, নহ তাহা ভুলে,

উপাসিনি দেখা যদি ভক্তি প্রেম তোমার
তুমি কি দেবতা নেত্রে দেখা দিবে প্রেমের পূজার?
হে সন্তোষ, হে ধৈর্য্য, হে কঠোর, হে চিরন্তন,
সহ পৃষ্ঠে উপরোধ এ আমার যোগাভিনয়।
ভ্রান্ত আমি—কখন কি মুক্তিনেত্রে দেখে চিরন্তন
তার তরে কোথা ফুল ফুটিয়াছে কোন তরুবর?
তার আছে শত রাজ—জগতের আলোকবিধান,
সে কি দেখে তার পানে চাহি কার তুষিত নয়ান?
সে কি দেখে, কোথা কোন ধ্যানোন্মত্ত কুমুদ-হৃদয়
ফুটিয়া উঠেছে, তারি প্রাচীমূলে তাহার উদয়!
ত্রিনয়ন-কোকনদ আজি ফুটে শতদল,
জীবনে নয়নে তার তপনের প্রণয় সম্বল।
চাহ না না চাহ তুমি যোগমগ্ন যোগেশ ঈশান,
তোমার চরণে, দেব, রণে মোর কাতর পরাণ।
যোগভঙ্গে একবার মোর পানে চাহ যদি ভুলে—
আকুল উল্লাস জাগি উঠিবে এ হৃদয়ের কূলে;
তখন সফল হবে পার্ব্বতীর জীবনসাধন,
ত্রিনয়ন! ক্ষণতরে ভ্রান্তি তব নয়নকিরণ।"

ধীরে ধীরে গেল সরি নীল মেঘে জ্যোছনাপ্লাবন,
পাণ্ডুর গগন—যেন যোগশ্লিষ্ট পাণ্ডুর আনন।
তার পর পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে উষালোক আসি,
স্তরে স্তরে মেঘে মেঘে ফুটাইল দিবসের হাসি।
ভক্তিভরে যুক্তকরে দিবাকরে কবি উপস্থান,
পিনাকী পূজিতে পুনঃ ধীরে দেবী করিলা প্রয়াণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ... "অধ্যাপক" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। আখ্যানবস্তু সামান্য; কিন্তু বর্ণনার বিচিত্র ভঙ্গী, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষমা ও ইন্দ্রজালময়ী কাব্যভাষার বিচিত্র বিকাশে এই সামান্য বস্তুটিও মনোরম হইয়াছে। ... মহীন্দ্র এক জন মন্ত্রমুগ্ধা চিত্রা-রাণী"—সেবক তাহার বিফল প্রয়াস, হাস্যরসাত্মক" অহমিকা প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া পাঠকের সহানুভূতি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু একটি গুণে আমরা মহীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছি। মহীন্দ্রের অধ্যাপক প্রতিমুহূর্ত্তে পাঠকের পূর্ব্বা-পূর্ব্বি সাহিত্যরসজ্ঞতা খর্ব্ব করিতেন; এবং মহীন্দ্র তখনো ক্ষুব্ধ হইয়া অধ্যাপককে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলিত;—সমালোচকের উক্তি তাহার মনঃপূত হইত না, এ জন্য সে নিয়তই 'বড়' এবং সমালোচকদের 'ছোট' মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। কিন্তু মহীন্দ্র বোধ

করি, কলেজের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজে পাদচারণা করিবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে সমালোচকের বা তাহার চক্ষুঃশূল অধ্যাপকের ভুল ধরিয়া করিয়াই নিরস্ত ছিল,—বিদ্বেষবশে বা নীচতার আতিশয্যে কেহ যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছে, বা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও এই অল্পবুদ্ধি 'নকল' কবির অন্তঃসারশূন্য বুথা দম্ভহস চিত্তে একবারও উদিত হয় নাই। নিরুদ্ধ সমালোচনায় চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অপ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—এবং সরলহৃদয়ে বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকের শিরে কোনও মতলবের আরোপ করে নাই,—ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাই। এবং মনে হয়, কালক্রমে তাহার সাহিত্যব্যাধির উপশম হইলে, এই হৃদয়ের গুণে মহীন্দ্র এক প্রকার নির্ব্বিতিলাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেশের 'আসল' সাহিত্যিকগণ যদি এই কবিসৃষ্ট 'নকল' কবির সরলতার অনুকরণ করিতেন। "ভাষা ও ছন্দ" একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ কবিতা,—তবু অযথা কৃত্রিমতায় ও কষ্টকল্পিত ভাবের ভারে ইহার উৎকর্ষের অনেক হানি হইয়াছে। "মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে" একটি সাময়িক প্রসঙ্গ; সকলের অবশ্য-পাঠ্য। মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিলে ভাল হয়। "প্রাচ্য প্রসাধনকলা" একটি উপাদেয় রচনা।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর 'হিন্দুর ভাষা' প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লেখক বলেন, "এই হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী উভয়ে মিলিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য ভাষা দিগ্‌গজের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নাম মহারাষ্ট্র বা মারাঠী।" মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক এই নূতন মতটি শাস্ত্রী মহাশয় কোথায় আবিষ্কার করিলেন? বররুচি, হেমচন্দ্র, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈয়াকরণগণ বলেন,—সংস্কৃত হইতে মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃতভাষা উৎপন্ন। মহারাষ্ট্রী হইতে শৌরসেনী, শৌরসেনী হইতে মাগধী গৌড়ী প্রভৃতির উৎপত্তি,—শৌরসেনী ব্রজভাষার জননী। হিন্দী-ভাষা ব্রজভাষার কন্যা। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রী যে শৌরসেনী অপেক্ষা প্রাচীনা, তাহা নানা প্রমাণে সিদ্ধ হয়। ইংরাজ লেখকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সমস্ত ভাষা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অধিক,—এমন কি, বঙ্গভাষার নয় ভাগ সংস্কৃত। মুসলমান শাসনকালে অনেক উর্দ্দু শব্দ মারাঠী ভাষায় প্রবেশ করিলেও সংস্কৃত কমে নাই। এবং অনেক উর্দ্দু (শাস্ত্রীর কথিত হিন্দুস্থানী) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া উর্দ্দুকে মারাঠীর জননী বলা অসঙ্গত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "মহারাষ্ট্র ভাষা শিখিতে কষ্ট না হইলেও ইহা অত্যন্ত কর্কশ ভাষা। ইহা শুনিতে কুশ্রাব্য এবং ইহার কবিতা বা গীত শুনিতেও ধৈর্য্য নষ্ট হয়!" শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অভিনব। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও কবিগণ প্রাচীন মহারাষ্ট্রীকে অতিশয় মিষ্ট ভাষা মনে করিতেন। সেই জন্য নাটকে রমণীদিগের "গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োক্তব্যে" এই বিধি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যে ভাষার দশভাগের নয় ভাগ সংস্কৃত শব্দ, সে ভাষা মিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক বোধ হয়। Encyclopedia Britannica গ্রন্থের ১৫ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র জাতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই ভাষাকে "Copious, Flexible and Sonorous, বলা হইয়াছে। "হিরড়ী, তিকড়ী (কচ্ছীভাষা) অপেক্ষা হাম্‌লা তোম্‌লা" শাস্ত্রীর কর্ণে কেন কর্কশ বোধ হইল, তাহা আমরা বুঝিলাম না। "দক্ষিণের সাহিত্য কখনই চরিত্রগঠনের [illegible] হইতে পারে নাই।"—এই মন্তব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে [illegible] রূপে দাক্ষিণাত্যের [illegible] অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি?

দাদার কাণ্ড।

সংসারের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের একমাত্র সহায় যে স্নেহময়ী জননী, তাঁহার শোকে প্রথমতঃ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে তাহাও সহিল। আমরা দুই ভাই; দাদা বড়, আমি ছোট। মার স্বর্গারোহণের সময়, আমার বয়স বার, দাদার উনিশ। ছেলেবেলাতেই দাদার বিবাহ হয়। বধূ ঠাকুরাণী তাঁর চারি বৎসরের ছোট। এই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকাই তখন আমাদের গৃহের গৃহিণী। কিন্তু সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূ ঠাকুরাণীর গুণের কথা আর কি বলিব? তাঁহার স্নেহে, তাঁহার যত্নে, আমার বৈধব্যের সকল অভাবেরই মোচন হইয়াছিল। আমি তখন বড় আদুরে ছিলাম, আমার সকল বায়না, সকল আব্দার রক্ষা করা বড় সহজ ছিল না। মাও সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু বৌমা আমার হাসিমুখে সকল দৌরাত্ম্যই সহিতেন। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, সম্ভবতঃ মার দেখাদেখি বধূ ঠাকুরাণীকে ছেলেবেলা হইতেই আমি "বৌমা" বলিতাম।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দাদা সবে বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কটে কিছু দিন এফ.এ.ও পড়িয়াছিলেন। মার হাতে সামান্য কিছু টাকা ছিল, তাহা হইতেই কোন রকমে সংসার চলিত। মার শ্রাদ্ধাদি 'যেন তেন প্রকারেণ' সম্পন্ন করিলেও, আমাদের পুঁজিপাটার অবশিষ্ট যা, সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। কাজেই, দাদাকে পড়া শুনা ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের গ্রামের নিকটেই এক মাইনর স্কুল ছিল, দাদা তার হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। বেতন নামে পঁচিশ, রসিদে ৩০ পঁচিশ টাকা লিখিয়া দিতে হইত, কিন্তু দাদা পাইতেন নগদ উনিশ টাকা মাত্র। আর ছয় টাকা না কি স্কুলের মাসিক চাঁদায়। আমিও সেই স্কুলে পড়ি। গ্রাম কোলের ছেলে, বড় আদরের; পড়াশুনায় প্রথম প্রথম তেমন চাড় ছিল না। বলিতে লজ্জা করে, সেই বার বৎসরের গেড়ে ছেলে আমি, তখনও মাইনর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর উপর উঠিতে পারি নাই। পড়া শুনায় মন নাই, সারাদিন খেলা আর খেলা। এ দিকে সেই অল্প বয়সেই দাদাকে ঘোর সংসারী হইতে হইয়াছিল। দাদা চিরদিন ধীর, স্থির, বিনম্রী, অথচ বুদ্ধিমান।

লোকে বলে, বুদ্ধিটা না কি আমারও ছিল, সেটা কিন্তু বেশী খেলিত দুষ্টামিতে। পাড়ার সকল ছেলে, স্কুলে সকল সহপাঠী,—কথাটি নিতান্ত অবিশ্বাস করিও না,—স্বয়ং পণ্ডিতমহাশয় আমায় কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়কে না হউক, তাঁর বেত গা কে ভয় না করে, এমন ছেলে দুনিয়ায় দুর্লভ। আমি ছিলাম কিন্তু সেই ভিন্ন রত্নের একটি। পণ্ডিত মহাশয়ের বেত অন্য ছেলের নিকট শিকারভ্রষ্ট ইহর লাঙ্গুলের ন্যায় ভীষণ আস্ফালন করিত, আর আমার বেলায় তাই দশা হইত যেন প্রহৃত কুকুরের লেজটি। পড়াশুনা করিতাম না, তবু আমার প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের যে এতটা অনুগ্রহ, বলিতে হইবে কি, সে কেবল আমার নষ্ট বুদ্ধির জোরে? সে বুদ্ধির পরিচয়টা আর এ বয়সে দিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ গুরুনিন্দা, সেটা আর নাই করিলাম। কিন্তু কি বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, বার বৎসর বয়সেও আমার লেখাপড়া কিছুই হয় নাই। মার মৃত্যুর পরে দাদা আমায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "বিনু"—আমার নাম বিনয় বাড়ীতে কিন্তু সকলে আদর করিয়া বলিত বিনু—"এখন ত একটু বড় হয়েছিস, নিতান্ত অবুঝও ন'স্—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কি করে চল্‌বে বল? আমরা গরিবের ছেলে, মূর্খ হয়ে থাক্‌লে দু মুঠা খাবার উপায় আমাদের নাই। ওই দেখ্, যদি ভাল করে লেখাপড়া শিখিতে পারিতাম, তবে কি আর সামান্য টাকার জন্য রোজ দুই ক্রোশ মাটী হেঁটে এই গরু ঠেঙ্গান কাজ কর্ত্তে হতো? না সংসারেরও এই কষ্ট থাকতো? মা ত দুঃখ কষ্ট সয়ে চলে গেলেন, আমরা কিন্তু এমনই হতভাগা যে, তাঁকে এক দিনও সুখী কর্ত্তে পারিলাম না।" বলিতে বলিতে দাদার চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিল। পণ্ডিতের বেত্রে ভয়ে যে হৃদয় একদিনও কাঁপে নাই, প্রতিবেশী আত্মীয়ের গুরুগম্ভীর উপদেশেও যে মন বিচলিত হয় নাই, আজ সহসা সে পাষাণ গলিল। পরদিন হইতে মাষ্টার, পণ্ডিত এবং সতীর্থবৃন্দ, সকলের বিষম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, আমি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। সে দুষ্টামিও তিরোহিত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকৃতই এক জন ভাল ছেলে হইয়া দাঁড়াইলাম। ষোল বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু বৃত্তি পাইলাম না।

পাশের সংবাদে দাদা বৌদি, সকলেই মহা খুসী! কিন্তু শীঘ্রই সকলের সে হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। মাইনর ত পাশ করিলাম, কিন্তু তার পর? এখন ত এনট্রেন্স পড়িতে হইবে। দাদা রঙ্গনগরে যে আত্মীয়ের বাসায়

থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন. সে আত্মীয়টি ত বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তবে উপায়! দাদা মোট পান উনিশ টাকা, অন্য আয়ের কিছু ছিল না, চাষি পাঁচটি পরিবার, সুতরাং তাহাতেই টানাটানি পড়ে। তবে আমার পড়াশুনার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে?

দাদা বড় বিষণ্ণ, তাঁর মুখ দেখিলেই মনে হয়, কি যেন একটা দারুণ মনঃকষ্টে তিনি সদাই বিষম ব্যথিতা সহসা দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। বৌমা এক দিন বলিলেন, "এত ভাবনা কিসের? আমার যে গহনা আছে, ইহাতেই অন্ততঃ পাঁচ সাত শত টাকা হইবে, সেই টাকায় কিছু দিন চলুক, তার পর ঈশ্বর একটা উপায় অবশ্যই করে দিবেন।" আমি সেইখানেই ছিলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না না, তা কি হয়?" বৌমা আমার দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন ঠাকুর?" সে কথার উত্তর আর আমার মুখে আসিল না। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতেই বৌমা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইলাম. কষ্টও হইল। বৌমার প্রস্তাবে দাদার বুক হইতে যেন একখানা পাষাণ নামিয়া গেল।

এখন কথা উঠিল, কোন্ পথে যাই? এনট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িতে এখনও চারি বৎসর, আবার এনট্রেন্স পাশ করিলেই যে চতুর্ভুজ হইব, এমনও কিছু নয়। তার পর এল্ এ., বি.এ., সে ঢের দিনের কথা! শেষ কলিকাতায় ক্যাম্পেল স্কুলে পড়াই স্থির হইল। দাদার আন্তরিক ইচ্ছা, আমি জেনারেল লাইনে যাই। বৌমারও বড় সাধ, আমি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাদিগ্গজ হই। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় এবং আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শে সে সাধে বাদ পড়িল।

আমাদের গ্রামের নবীন ও ভূপেন কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটীতে তাঁহারা বাটী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেসে "সিট"ও খালি ছিল; সুতরাং কলিকাতায় গিয়া প্রথম ও প্রধান যে উদ্বেগ, তাহা দূর হইল। নবীনদের সহিত কলিকাতা যাওয়াই স্থির, শেষ যাত্রার দিন আসিল। আমার যাওয়ার ক্ষুদ্র আয়োজন প্রস্তুত। বৌমাই সব গুছাইয়া দিয়াছেন, একটি টিনের প্যাটরার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও একটি পুটুলিতে খানকতক আমসত্ত্ব, পাকা আমের আমচুর, আর আমি সুপারি বড় ভালবাসি বলিয়া 'মিহিসুপারি' সেরখানেক বাঁধিয়া দিলেন, আর দিলেন একটা ভাঁড়ে সের তিনেক গাওয়া ঘি। সঙ্গে সঙ্গে বৌমা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "শুনেছি কলিকাতায় ভাল দুধ ঘি মেলে না; রোজ দু'বেলা ঘি অবশ্য অবশ্য খেও।" কলিকাতা গিয়াই ভাল

জুতা, জামা কিনিয়া লইবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। তার পর স্বহস্তে আমের পাতা ভাঙ্গিলেন, মুড়ি মুড়কি আনিলেন। এখন আমার যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের বড় ঘরে একখানি আসন পাতা, বৌমা আমায় সেইখানে বসিতে বলিলেন; নিজেও আমার নিকট বসিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাকে আমার মঙ্গলের জন্য ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া আমায় সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। শেষে আমার কপালে দধি ও সিন্দুরের ফোঁটা ও মাথায় "নির্ম্মাল্য" দিলেন। আবার পরক্ষণেই নির্ম্মাল্যটি আমায় ভাল করিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, শেষে দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে আমায় লইয়া যাত্রার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এ দিকে ট্রেণের সময় যায়; ভূপেন ও নবীন পথে দাঁড়াইয়া; দাদা শীঘ্র রওনা হইবার জন্য আমায় তাড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু বৌমা, কে কখন গ্রাহ্য করিলেন না, কিছু না খেয়ে কি যাওয়া হয়? কাজেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। 'পাথেয়' লুচি সন্দেশও বৌমা সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। আমি বৌমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, বৌমা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। আমরা রওনা হইলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, বৌমা খিড়কিতে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন।

ষ্টেশন আমাদের বাটী হইতে দেড় মাইল। দাদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। যাহা যাহা বলিবার, দাদা তা আমায় পথেই বলিতে বলিতে চলিলেন। দাদার সে কয়টি অমূল্য উপদেশ আমি চিরজীবন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও আসিল। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। আমাকে নবীন ও ভূপেনের হাতে সঁপিয়া দাদা বিষণ্ণহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। গাড়ীও ছাড়িল, আর আমার মনটি কেমন হইয়া গেল। সেই অবস্থায় কলিকাতায় পঁহুছিলাম। মনটি বড় উড়ু উড়ু। ক্রমে আলিপুরের বাগান, মিউজিয়ম, কেল্লা, ইডেন গার্ডেন দেখিতে দেখিতে মনটা কতক বসিল। তখন স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়ায় খুব মন। দেখিতে দেখিতে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। পাশের সংবাদ

হইয়াই বাড়ী গেলাম। বৌমার মুখে আর হাসি ধরে না। দাদারও চিন্তা-রিষ্ট বদলে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা দিল। তখন প্রশ্ন উঠিল, চাকরী পাওয়া কি ব্যবসা করা? আমার অঙ্কে একটা পঁচাত্তর টাকা বেতনের কাজ পাইবার আশা পাইয়াছিলাম। বৌমা ত তা শুনেই বল্লেন, "সর্ব্বনাশ, আমার দু—বা ভাই; সেখানে তোমার যাওয়া হবে না; ঘরের ছেলে, ঘরেই থাক।" সত্যই ঘরের ছেলে ঘরেই রহিলাম। যেমন তেমন ভাল ডাক্তার তখন কেহ ছিলেন না। সকলে দেখেই ডিস্পেন্সারী খুলিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তা হ'লে ঔষধপত্র ও অন্যান্য আসবাব সংগ্রহ করিতে প্রথমেই যে অন্ততঃ দুই শত টাকার দরকার। বৌমা এবারেও বিপদে কাণ্ডারী হইলেন, বলিলেন, "আমার এখনও যে গহনা আছে, তাহাতে আড়াই শ [illegible] অনায়াসে হবে।" বৌমার কথার উপর কে কথা কহিবে? আমি [illegible] আনিবার জন্য অলঙ্কার সহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। বৌমার হাতে এখন শুধু দু'গাছি সীখা রহিল। যাইবার সময় দাদা খান কয়েক আইনের পুস্তকের ফরমাইস দিলেন। বলিলেন, "একবার 'কমিটী' পরীক্ষা দিতে হবে।" দাদা কিন্তু মতলবটি মন্দ ঠাওরান নাই।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। দশ, পনর, বিশ, পঁচিশ, ক্রমে ছ'মাসের মধ্যে আমার মাসিক আয় চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত হইল। পশারও বেশ জমিল। তবে দেশে যত পশার, পয়সা তেমন নহে। যা হোক, ভবিষ্যৎ বড় মন্দ মনে হইল না। যা কিছু পাই, সবই বৌমাকে আনিয়া দিই। মধ্যে একটা বড় দাঁও উপস্থিত হইল। দেশস্থ কোন ধনাঢ্য ও বদান্য জমীদারের স্ত্রী ও পুত্রকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া এককালে তিন শত টাকা পুরস্কার পাইলাম। সে টাকাটা কিন্তু আর বৌমাকে দিলাম না। গোপনে সে টাকার একটা সদ্গতি করিলাম। তখন সোনার বাজার সস্তা, সেই তিন শত টাকাতেই বৌমার হাতের বালা, গলার হার ও কাণের মাকড়ী হইল। গহনা দেখে ত বৌমার ভারি রাগ। আমাকে "এ গিন্নিপনি করতে কে বলে?" বৌমা কোথায় আমার সম্বন্ধের জোগাড় করিতেছেন, বিবাহে অন্ততঃ ছয় সাত শত টাকার দরকার; আর আমি কি না, বলা নাই, কহা নাই, মাঝখান হ'তে এতগুলো টাকা নয় ছয় করে ব'সে আছি? বৌমা তখন ব্যবস্থা করিলেন, "আচ্ছা থাক, এ হার মাকড়ি সব কনের হবে।" এইবারে আমার মুখ ফুটিল,—কোন দিন বৌমার সঙ্গে কথান্তর ঘটে নাই, আজ ঘটিল। সে

ভারি কৌতূহল। পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হ
কলহে আমারই জয় হইল। শেষে বৌ
স্বীকার করিলেন।

ক্রমে আমার আর পঞ্চাশ্ টাইট্ ট
পাই। যোল মাস ব্যবসায় করিতে না
বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছেন।
অবাক্ কারখানা। বৌমাকে ডাকিয়া বা
"কোনটি বিনু বাবু!" বলিয়া বৌমা
আমি। এই বিবাহের কথাটা?
বৌমা। তোমার মনে কি হয়?
আমি। আমার ত সম্ভব মনে হয়
বৌ। অসম্ভবটা কিসে ভাবুচে?

আমার বিদ্যার সীমা অতিক্রম করিয়
চেলি সমস্তই সংগৃহীত। এর উপর বিব
আড়াই শত টাকা মজুত। আমার উ
হয়েন নাই। কিন্তু আজ সে সমস্তই এ
যাহা হউক, বৌমার নিকট মনে মনে
বৌমাকে এক টু খোঁটা দিতে ছাড়িলাম না
পর যে এ সংবাদটি আনিতে পারিনি, এ
বলিলেন, "যা ভয় কচ্চ, তা নয়; মনে ক
দেখে ঠিক করেছি বিনু বাবু।"
"তা বেশ, ফুলশয্যা নিজে রাখবেন।"
করিলাম। আরে রাম, সেখানে কি আ
যথাসময়ে বৌমার সেই অপরাধের
আমার মাঝে মাঝে আদর করিয়া "দেব
বৌমার প্রথম কথাটি কিছু কাল-নিরবে
এবার আমার ব্যবসায়ের ভারি উন্নতি
আর আমরা ডাক্তার, কাজেই আমাদে
আড়াই শত টাকা ভিজিট, এ ছাড়া ঔ

অল্প নহে। দুধে জল মিশাইয়া জলের দামে চুনামেয় বিনিময়ে অনেক গোয়ালা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করে। ডাক্তারি ব্যবসাতেও জলে উপার্জ্জন বড় কম নহে; সুতরাং সে হিসাবে ডাক্তারি ব্যবসাটিকে Reformed গোয়ালার ব্যবসা বলা চলে। তবে এতে Municipal officeদের দস্তস্ফুট করিবার যো নাই, এই যা বল। তা সে কথা যাক, আমার আয়বৃদ্ধি দেখে বৌমা এক দিন আমায় বলিলেন,—"দেখেচ বিনু বাবু, কেমন পয়মন্ত বৌ এনেছি?"

"পয়মন্ত বটে, নইলে কি আর গ্রামে ঘরে ঘরে এত জ্বর জ্বালা হয়!" বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে গেলাম।

বিবাহের ছ' মাস অতীত হইতে না হইতেই বৌমা নববধূকে বাড়ীতে আনিলেন। এরই জন্য তিনি বুঝি বিবাহের সময় "ধুলা পায়ে নবমত" করিয়া থাকিয়াছিলেন।

নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌমার কাজ বাড়িল। তার 'সাজগোজ' করা, চুল বাঁধা, খাওয়ান, ইত্যাদিতে বৌমা আমার সদাই ব্যস্ত। বালিকা প্রথম প্রথম দিনকতক বাপের বাড়ীর জন্য খুঁৎ খুঁৎ করিত। দুই এক দিন একটু আধটু কান্নাকাটি করিয়াছিল, তার পর সব চুপচাপ।

এক দিন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, ভৃত্য শ্রীমান চৈতন্য আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, একটি 'কল' আছে। কিন্তু এ ঘরের কলী বৌটিকে একা রাখিয়া যাওয়া চলে না, কাজেই বৌমাকে এ ঘরে থাকিবার জন্য ডাকিতে হইল। আমার প্রথম ডাকেই দাদা বলিলেন, "কে বিনু?" বলিয়া তিনি দোর খুলিয়া দিলেন। দাদা তখনও শয়ন করেন নাই, আইন-চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আমাদের কথাবার্ত্তায় বৌমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাদের নিকট আসিলেন। আমি তখন দাদাকে বলিতেছিলাম, "প্রত্যহ এত রাত্রি জেগে পড়াশুনা কল্লে শরীর মাটী হয়ে যাবে যে।" "না" বলিয়া দাদা একটু হাসিলেন। বৌমা আমার কথার সায় দিয়া বলিলেন, "আমিও রোজ ঐ কথা বলি; তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব করে বলা হয়নি, এখন কিছুদিন ছুটী নিলেও ত চলে।" বৌমা ঠিক বলেছেন, আমি উদ্যোগী হইয়া দাদাকে বিনা বেতনে তিন মাসের ছুটী লইতে বাধ্য করিলাম।

তিন মাস অন্তেই দাদা কমিটীর পরীক্ষা দিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় পাশও হইলেন। সবডিভিসন আমাদের গ্রাম হইতে চারি মাইলও নয়; সেইখানেই

প্রথমে প্র্যাকটিস করা স্থির হইল। কিন্তু দাদা আপাততঃ কিছু দিন ঢাকরী করার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভেক নহিলে ভিক মিলে না। ঘড়ি, চেন, পোষাক পরিচ্ছদ ত চাই। আমার কয়েকখানি আইনের পুস্তকও সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং কিছু টাকার দরকার। আমার কিন্তু এ যুক্তি ভাল বোধ হইল না। শুভস্য শীঘ্রম্। আমি প্রস্তাব করিলাম, ধার দেনা করে কোন প্রকারে টাকা সংগ্রহ করেও সত্বরই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বৌমা অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত আমার প্রস্তাব 'সেকেণ্ড' করিলেন,—অধিকন্তু বলিলেন,—"ধারই বা কর্ত্তে যাবে কেন?"

আমাদের সম্মীর ভাণ্ডারে তখনও প্রায় দেড় শত টাকা জমা। দাদা আর বাক্যব্যয় করিলেন না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং, তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল। বাসাখরচের জন্য পঁয়ত্রিশটি টাকা হাতে লইয়া দাদা যাত্রা করিলেন। Practice আরম্ভ হইল—দাদা আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। তাঁহার জমাখরচে দেখিলাম, প্রথম মাসে উপার্জ্জন তের টাকা আট আনা; খরচ সাতাইশ টাকা পাঁচ আনা আড়াই পয়সা। দ্বিতীয় মাসে বাসাখরচের জন্য "পুঁজি" হইতে আড়াই টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় মাসে খরচ বাদে ছয় টাকা উদ্বৃত্ত হইল। পর মাসে আয় পঞ্চাশেরও বেশী। তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতে দাদার খুব নাম ডুটিল। ফৌজদারী কোর্ট যেন তাঁর একচেটিয়া হইয়া উঠিল। যে কোন মকদ্দমা হউক না, দাদা এক পক্ষে না এক পক্ষে আছেনই। ক্রমে মুনসেফি কোর্টেও দাদা "কেস্" পাইতে লাগিলেন। বোধ হয়, দাদার তখন বৃহস্পতিবার দশা। মুন্সেফিতেও তাঁহার বেশ পশার প্রতিপত্তি দাঁড়াইল। দুই বৎসরের মধ্যেই দাদা সব-ডিভিসনের একজন প্রধান উকিল হইয়া উঠিলেন। মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট হইল। জেলার কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজা, জমীদার বাঁধা মক্কেল হইলেন। আমাদের সংসারের শ্রীও ফিরিতে লাগিল। পাকা বাড়ী, জোড়, জমা, পুষ্করিণী, বাগান, একে একে সবই হইল। তখন বৌমা দুর্গোৎসবের সাধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবার নহে। পূজা করা গেল। কিছু সমারোহও হইল।

দাদা কিন্তু তখনও নিঃসন্তান। সে জন্য দাদা বা বৌমা যে কিছুমাত্র দুঃখিত, এমনটি বুঝা যাইত না। তবে বাটীতে একটি কচি ছেলের অভাব কিছু কিছু অনুভূত হইতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু সকলে কার্ত্তিকপূজার

ছেন। আহার করিতে করিতে দেখিতাম, দাদার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। একত্র শয়ন করিয়া দেখিতাম, দাদা রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বলিতেন, "রাণী! তুমি যে এমন, তা ত আগে জানিতাম না। কোন দিন বা এসেছ, চল যাই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেন। আমি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "কি দাদা!" "না কিছু নয়, স্বপ্ন দেখিলাম" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া দাদা আবার শুইয়া পড়িতেন।

বৌমার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। দাদা বৌয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৌমার নামে তাহার নাম হইল "রাণীসায়র"।

দাদা এবার আদালত খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই ব্যবসায়স্থানে যাইবার দিনস্থির করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। এ কয়টি দিন থাকিয়া গেলে হয় না? দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, সেখানে কাজকর্ম্মে তবু অনেকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব। আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

ক্রমে বৎসর অতীত হইতে চলিল। দাদা আর বাটী আসেন না; অবশ্য পত্রচপত্র বাটীতে রীতিমতই পাঠাইতেন। দাদা বাটী আসেন নাই বটে, কিন্তু দেশস্থ অনেক আত্মীয়স্বজন দাদার বাসায় পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমি দাদার নিকট যাইতাম; শুনিতাম, সমাগত আত্মীয়গণ দাদাকে পরামর্শ দিতেছেন, "এত অল্প বয়সে কি বিপত্নীক অবস্থায় থাকিতে আছে?" ইত্যাদি। তাহারা কেবল এই অমূল্য উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নিঃস্বার্থভাবে আপন আপন বয়ঃস্থা কন্যা দান করিতেও প্রস্তুত। দাদা কিন্তু তাঁহাদের এহেন ত্যাগস্বীকারেও উপকৃত হইতে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। কেহ কেহ দাদাকে অনুরোধ করিবার জন্য আমাকেও ধরিলেন, কেহ বা এমনও জানাইলেন যে, দাদার ত বিবাহ করিতে ষোল আনা মত, কেবল আমি কি মনে করিব, এই চক্ষুলজ্জাতেই দাদা বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। পূজার সময় দাদা বাটী আসিলেন। বোধ হয়, বৌয়ার অনুরোধ স্মরণ করিয়াই দাদা পূজা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু পূজা না পূজা। সে উৎসব শোকেই কাটিয়া গেল। আর বৎসর এমনই দিনে হায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জগদম্বে! তোমারি সহিত বৌমাকে যে একদিনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তুমি ফিরিলে, কিন্তু বৌমা কই?

পূজা ত কোনরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু নিত্য নূতন কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়কুটুম্বগণের সমাগমে গৃহ আমাদের ভরপুর। দাদা সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। এক দিন দেখি, বোমায় এক মেয়ে—ঠিক ধান সম্বন্ধে নহে,—সপরিবারে আমাদের গৃহে উপস্থিত। মেয়েটি নিতান্ত মাসীমা বর্ষীয়সী। কিন্তু মাসীমা বড় অমকাল লোক। তথায় বাড়ার গৌষ্ঠিক আলাপ, আপ্যায়িত প্রভৃতি রমণীসুলভ গুণে যেন মূর্ত্তিমতী! আবার বিষয়বুদ্ধিতে রমণীমণ্ডলে দুর্লভ। স্বয়ং বৃহস্পতি আর কি! মেয়ে-মহাশয়-রূপ নাবালকটির তিনিই না কি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই মাসীঠাকুরাণী, বৌমার নাম ধরিয়া "রাণী, মা আমার, তোর এ সোনার রাজ্য ফেলে কোথা গেলিরে মা" ইত্যাদি করুণ ক্রন্দনে গৃহ পরিপূরিত করিয়া তুলিলেন। তার পর দাদার আগমনে, বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; ক্রন্দনের সুর পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। "আমাদের কি একবারেই ভুলে থাকতে হয় রে বাবা, রাণী যে আমার মাসীমা মাসীমা করেই পাগল ছিল রে বাবা।" ঠাকুরাণীর আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। উপস্থিত রোদনাবেগ কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তার পর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অঞ্চলে অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক, শোকবিজড়িত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "বলি বাবা ত আমাদের পর করেছেন, আমরাই একবার খোঁজ খবর নিয়ে আসি। আর সৈরিন্ধিরও তোমাদের নামে গাল পড়ে, আহা, রাণী আমার সৈরিন্ধিকে কত ভালই না বাসত। ভাল আমাটি, ভাল কাপড়খানি, সৈরিন্ধিকে না দিলে আর তার মন উঠত না। আহা, অমন মেয়ে কি আর হয়?" নির্ব্বাপিত বহ্নি বুঝি আবার প্রধূমিত হয়, কিন্তু না, এবার সংক্ষেপেই পালা শেষ হইল। কিঞ্চিৎ আর্দ্রকণ্ঠে ঠাকুরাণী বলিলেন, "সৈরিন্ধি, কাঁদিচিস্ বুঝি? কেঁদে আর কি করিবি মা! আয় এখন, তোর বোনাই বাবুকে প্রণাম করবি আয়।" আমি সম্মুখের ঘরেই ছিলাম, দেখিলাম, রূপে আলো করিয়া মন্থরগমনে আসিয়া ব্রীড়াবনতমুখে এক কিশোরী দাদাকে প্রণাম করিলেন, এবং দাদা স্বাগতবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ডাহিন হাতের দুই অঙ্গুলিতে বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন?" দাদা যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যা, তুমি ভাল ছিলে!" সৈরিন্ধি স্মিতমুখে "যেমন রেখেছেন" বলিয়া দাদার প্রতি একবার সলজ্জ

আঁখি দুটির কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবার মুহূর্ত্তেই, নাড়ীর পানে মুখ নামাইলেন। দাদাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী বসুন না বলিয়া সপ বিছাইয়া দিলেন। দাদা বসিলেন।

মাসীঠাকুরাণী তখন আমার নিকট আসিয়া গল্প ফাঁদিলেন। এ কথা, সে কথা, বৌমার নানা গুণের কথা তুলিয়া, শেষ দাদার বিবাহের কথা পাড়িলেন। আমাকে সে জন্য অনুরোধ করিতেও বলিলেন। আসল কথাটা কিন্তু তখনও ভাঙ্গিলেন না। ঠাকুরাণীর ব্যবহারটি আমার আগাগোড়াই কেমন কেমন মনে হইতেছিল, আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারেই বলিলাম, আপনারাই চেষ্টা করে দেখুন, বলিয়া আমি বাহিরে গেলাম। কিন্তু ক্ষণপরে ফিরিয়া শয়নঘরে যাইতে যাইতে শুনিলাম, কক্ষান্তরে, কুটুম্ববাড়ী হইতে আগত ঝি বসিতেছে—"ভাল দেখেছ ঠাকরুণ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—তাই গিয়েছ কাজিকে শুধুতে দুগোচ্ছবের পরবের কথা। আরে বিয়ে কল্লে ক্ষতিটা হবে কার? তখন কি আর এমন করে পায়ের উপর পা দিয়ে দাদার মাথার কাটাল ভেঙ্গে খাওয়া চল্‌বে? না, দাদাকে বোকা বুঝিয়ে সর্ব্বস্ব লুটে নিতে পারবে?" মাসীঠাকুরাণী বলিলেন, "নে বাপু চুপ কর, ও সব কথায় তোর কাজ কি?" কথাটা ঝির পছন্দসই হইল না। সে সৈরিন্ধ্রীকে মধ্যস্থ মানিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তা আমি কি আর মিথ্যা বল্‌চি, কি বল গো সৈরিন দিদি?"

এখন আমাদের বাটীর যেটি গৃহিণী, সেটির ত সাত চড়েও মুখে রা নাই; বোঝা বহিতে বেচারা বড় মজবুত। কিন্তু হুকুম তামিলে যেমন তৎপর, হুকুম চালাইবার ক্ষমতা তেমন নাই। তা হোক, কিন্তু অতিথি তাদের সেবা করিবার শিক্ষা সে বৌমার নিকট লাভ করিয়া মাসীঠাকুরাণীদের সম্বন্ধে সে বেচারা প্রাণপণেই করিতে

প্রথম প্রথম দুই এক দিন, দাদা মাসীঠাকুরা বলিলেন, "ভাই কি বিপদেই পড়েছি!"

দুই দিন শুনিলাম না। দাদা যেন এখন নূতন কুটুম্বদের প্রতি দাদার আদ আগে দাদাতে আমাতে নির্জ্জনে প্রসঙ্গে দাদা যেন থাকিতেন ভাল

তেমন তন্ময় হইয়া এক তানে বলিতে পারেন না। আর বৌমার প্রসঙ্গও বড় উঠে না। দাদার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—এখনকার মনের ভাবটিও যেন কতকটা না বুঝিলাম, তা নয়। কিন্তু দাদা আমার এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুই এক দিন কি যেন বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। অন্য প্রসঙ্গ তুলিতেন, লজ্জায় আর আসল কথাটি বলা হইত না।

তবে দাদা ত আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক,—তিনি যাহাতে সুখী হন, সেই ত ভাল—তখন দাদার লজ্জার বাঁধ আমিই ভাঙ্গিয়া দিলাম। এক দিনে বাটীর মধ্যে সকলের সমক্ষেই, দাদাকে বিবাহের কথা বলিলাম,—কথাটা তুলিতেই, সেই কি, মাসীঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া একটু আঁচা আঁচি করিল। ঠোঁট ফুলাইয়া একটু ভাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চট্ করিয়া কাইল! দৈবক্রমে সেটাও আমার চক্ষে পড়িল। ঝির মনের ভাবটা—"উনি না বল্লেই যেন সব আটকাচ্ছিল!" তা যাই হোক, আমার বিবাহের প্রস্তাব, আর অমনি দাদার সম্মতিপ্রকাশ আর কি? একবার যখন চক্ষুর্জ্জা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আর বাধা কিসের বল? দাদা আমার উত্তীর্ণী হইয়া অগ্রহায়ণের প্রথমেই সৈরিন্ধ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের দশ পনর দিন দাদা সস্ত্রীক বাটীতেই থাকিলেন। বড় বধূঠাকুরাণী, এই কয় দিনের মধ্যেই ঘর সংসার বেশ চিনিয়া লইলেন। এই জন্যই বলে,

"যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।"

আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসার স্থানে গেলেন। যাইবার [illegible] -ভূতপূর্ব্ব মাসী মহাশয়া—স্বামী কন্যা সহ গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া যাইতে [illegible] সঙ্গে শ্বশুরবাটী যান। বিবাহের ছয় মাস অতীত [illegible] ঠাকুরাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। বড় [illegible] সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। দাদার পুত্র হই- [illegible] কি আছে? কিন্তু এই সন্তান যদি [illegible] এ কথার আর কাজ কি?

এইরূপ বিবিধবিতর্কনায় বড় বধূকে

দেবদত্ত প্রণয়িনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছে। সে এরূপ ঘটনায় কিরূপ কার্য্য করিবে, কিরূপ কথা বলিবে, আমাকে তাহা ঠিক গণিয়া হইবে। এইরূপ প্রত্যেক পাত্রপাত্রী যে কয়টি কথা বা যে করিবে, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে গণনা যদি আমার অনুমান প্রকৃত হয়, যদি আমার গণনা ঠিক তাহা চরিত্রাঙ্কন সত্যানুগত হইবে, তবেই আমার চরিত্রসৃষ্টি হইলেই আমার অমরতালাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত গণনার সাফল্য বৈফল্য জ্ঞানের প্রকর্ষ-পাত্রীর চরিত্র বিষয়ে যদি আমার অনুমান সত্য হইবে, আমার

অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম যে, এক জন দেবদত্ত না করিলেই নয়। এবার বড় বিপদে পড়িলাম। প্রতিকৃতি মাংস ও রক্তে চরিত্র আমার পরিচিত নরনারীর অপরিজ্ঞাত। ভাবিতেছিলাম; কিন্তু দেবদত্তের প্রকৃতি উপায় কি? অমরতার সাধে ত আর যায় না। সুতরাং কল্পনার সাহায্য লইতে হইল। ভঙ্গী ভাষা কার্য্য, সেই সমস্তের সমাবেশ করিয়া চরিত্রের সৃষ্টি করিলাম। যদি আমার কল্পনা তেজস্বিনী হয়, যদি চরিত্রের উপাদান সকল মিশাইতে পারিয়া থাকি, তবেই একটি ঠিক মানুষ গড়িলাম। সে সজীব সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইল। আর যদি আমার কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হয়, যদি আমি চরিত্রের উপাদান সকল পুঞ্জীভূত করিয়া থাকি মাত্র, রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এক কিম্ভূতকিমাকার জীবের গঠন করিলাম মাত্র। আমার মনোগত সাধ হৃদয়েই বিলীন করিতে হইল। আমার নাটক পাঠোপযোগী হইল না। উপরে আপনাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া চরিত্রচিত্রণের যে সকল প্রণালী রচনা করিলাম, সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে তাহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে সেক্সপীয়রসৃষ্ট চরিত্রের যথার্থ সত্যানুগততার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, তিনি যথাযথ চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, অন্য কবির ন্যায়

তাহা দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেক্সপীয়র তাহা ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথায়ও অতিরঞ্জন বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল, যে তাঁহার বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সেক্সপীয়র সৃষ্ট চরিত্রাবলীর বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। জগতের কোন কবিই এ চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। এক কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতার সা শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে ব্যক্তি নহে। তাঁহার চরিত্রস্থা কোন দুইটি চরিত্র অন্যতন্ত্র নহে। কেরই বিশে ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম, যুস এবং প্রস্পেরো এবং হটস্পার এবং ফলস্টাফ হেনেরি; ডোল ট ও ইস অ্যাণ্টো ও ক্লিয়োপেটরা ও রোজালিন্দ এবং ইমো মতএব স্ত্রী হ্যামলেট—তাঁহার মহা নাটকের পাত্রপ ঘটি হয় যে, অশেষ প্রকার মানবচরিত্রের সহিত সেক্সপীয়রে মানব-প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে তাঁহার প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানবের প্রকৃতি বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তবৃত্তি বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। মানুষের যত প্রকার ভাব আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রেম—সেক্সপীয়রের নাটকে সকল ভাবেরই যথাযথ সমাবেশ দেখিতে পাই। অতএব মানবের বিবিধ বিচিত্র চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধেও তাঁহার প্রকৃষ্ট আ তা ছিল—প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা, মানুষের চিত্তবৃত্তিবিষয়ে এই প্রভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, সেক্সপীয়র কোথা হইতে পাইলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি?

এ সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া সমালোচকগণ কিছু ফাঁফরে ছেন। কেহ তাঁহার নাটকে ব্যবহারাজীবের প্রণালী পদ্ধতির সহিত পরিচয়ের প্রমাণ পাইয়া তাঁ ক আইন-ব্যবসায়ী, কেহ উক্তি নিকটস্থ ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ তাঁহার

প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নাবিক স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কেহ তাঁহাকে ডাক্তার, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ বোদ্ধৃপুরুষ, কেহ কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও চেষ্টার সফলতা হয় নাই। কারণ, একের সিদ্ধান্তের সমর্থন পক্ষে যে প্রমাণ, অপরের পক্ষেও ঠিক তাহাই। তাঁহাকে উকিল প্রতিপন্ন করা যত সহজ, ডাক্তার প্রতিপন্ন করা তদপেক্ষা এক রত্তিও কঠিন নহে। যে যুক্তিবলে তিনি ধর্ম্মযাজক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ঠিক সেই প্রণালী প্রয়োগে তাঁহাকে সেনানায়ক প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আসর সর্ব্ববিধ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমান নিপুণতা। তিনি যখন [illegible] সজ্জায় সজ্জিত সৈনিকের [illegible] আহ্বান কেবল সেনাসংস্থান [illegible] যুদ্ধবক্ষে নেপ[illegible]সরাজের মজ্জমান [illegible], বুঝি তাঁহার সার[illegible] জীবন নাবিক[illegible] মিসরবাসী ক্লিয়োপেট্রার [illegible] স্বৈরতার প্রতিমূর্ত্তি সাপুড়িয়াকে স্থাপন [illegible], এই শ্রেণীর জীবই তাঁহার আলোচনার [illegible] হইয়া [illegible] তিনি অ্যান্টনি অথবা কোরায়োলেনস অথবা ম্যাকবেথ অথবা ইয়াগো অথবা ফলষ্ট্যাফ অথবা প্রস্পেরো অথবা সাইলক অথবা লিয়র অথবা হ্যামলেট অথবা টাইমনের বেশে মূর্ত্তিরূপী সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি কি ছিলেন এবং কি না ছিলেন, কি জানিতেন অথবা কি না জানিতেন, কোন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, কোন বিষয়ে না ছিল, এ সকল নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা বিভোর মনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকি, এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করি যে, তিনি সাধারণ মানুষের মত দেখিয়া শিখিয়া, বুঝিয়া শুনিয়া কিছু জানেন নাই বুঝেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শনজনিত নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী স্বতন্ত্র।

এইরূপে তাঁহার নাটকে বিচিত্র চিত্তবৃত্তির, বিবিধ ভাবের যথাযথ দেখিয়া অনেক সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি যে সকল ভাবের স্বরূপচিত্র তাঁহার নাটকে ফুটাইয়াছেন, তাহা আগে অনুভব করিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্য কিংলিয়র নাটকে পুত্র আরথরের বিয়োগবিধুরা জননী কনস্টেন্সের মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিয়া

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি পুত্রবিয়োগের অকৃত্রিম যাতনায় পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-জীবনের শেষভাগে বিরচিত সিম্‌বেলিন বা উইন্‌টারস্‌ টেল নাটকে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর পতি-পত্নীর পুনর্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে সেক্সপীয়র গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিয়া নির্য্যাতিতা প্রণয়িনীকে পুনরায় হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। আবার কোন সমালোচক প্রেমবৈচিত্র্যে তরঙ্গাদি [illegible] কাব্য-জগতের সারভূত সেক্সপীয়রের সনেট কবিতাবলীর [illegible] পূর্ব্বরাগ রসাভাস মিলন বিরহ ঈর্ষ্যা অভিমান [illegible] ভাবশবলতায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া সেক্সপীয়রকেই সনেটো [illegible] বা একাধিক প্রণয়িনীকে ভ [illegible] বন্ধুকে তাঁহার উপনায়ক সিদ্ধ [illegible] একবারে অসম্ভব বা অমূলক, [illegible] ভিত্তিতে কতকটা সত্য নিহিত আছে। কিন্তু [illegible] ঐ ঐ কারণে সেক্সপীয়রকে পুত্রশোকাতুর, [illegible] প্রেমবৈচিত্র্যে উদ্বেল-হৃদয় মনে করা সঙ্গত হয়, [illegible] মিওর প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া, ঈর্ষ্যাজর্জ্জরিত ওথেলোর মর্ম্মবেদনা শুনিয়া, নির্য্যাতন-গ্রস্ত লিয়রের অভিশাপবহ্নিতে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, শোণিতকর্দ্দমাক্ত ম্যাকবেথের নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবসাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, কবি-দার্শনিক হ্যামলেটের জীবনসমস্যার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানে কর্ণপাত করিয়া এবং মরুদ্বেষী টাইমনের বিকট আর্ত্তনাদে বধিরিত হইয়া আমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? ইহা হইতে কি এই নিশ্চয় করিব যে, সেক্সপীয়র ঐ সকল অসাধারণ ভাব স্বয়ং অনুভব করিয়া তবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন? অর্থাৎ, তিনি একাধারে ম্যাকবেথ হ্যামলেট ওথেলো লিয়র টাইমন অ্যাণ্টনি সিজার পসথুমস ব্রুটস্‌ রোমিও হটস্পার হেনরি কেলিগুলা প্রস্পেরো ফলস্টাফ প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। এ মতে তিনি পুরুষ হইয়াও নারীহৃদয়ের অসাধারণ ভাবনিচয় অনুভব করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ংই ডেসডিমোনা ওফিলিয়া মিরন্দা পরীক্ষিতা ইসাবেল পোরসিয়া রোজালিন্দ এমিলিয়া কুইকলি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিশালিনী রমণীও ছিলেন। তাহা কোন রূপেই সম্ভবপর মনে

হয় না। পরন্তু ইহাই মনে হয় যে, কি মানব-প্রকৃতি, কি মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি, কোন বিষয়েরই অভিজ্ঞতা সেক্সপীয়র ভূয়োদর্শন দ্বারা লাভ করেন নাই। তাঁহার এ সম্বন্ধে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালী কি? যদি সে প্রণালীর আমরা স্বরূপনির্ণয় করিতে পারি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার কি লক্ষণ বা বীজশক্তি, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিব। এবং একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ঐ প্রণালীর স্বরূপনির্দ্ধারণ চেষ্টা করিতেছি।

কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু পদার্থ আমাদের জ্ঞান অথবা তে পারে, বৃক্ষ নদী পর্ব্বত পশু পক্ষী নরনারী, প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি অবয়বের ইতে একটি বৃক্ষ আমার নয়নগোচর হইল। বৃক্ষটি পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, বৃক্ষটি গাত্র দি নানা অংশে বিভক্ত। দেখিলাম, বৃক্ষটির আকার আছে, মধুর গন্ধ আছে, কঠিন স্পর্শ আছে, আরও দেখিলাম যে, বৃক্ষটি বায়ুতে স্পন্দিত হইতেছে। রসসঞ্চার করিতেছে। পত্রহস্ত বিস্তার করিয়া সৌরকররাশি ন করিতেছে। আরও কত কি ক্রিয়া চলিতেছে। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, বৃক্ষ আর কিছুই নহে, কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চরাচর পদার্থ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। সেই বহুতা অবয়বের সংযোগে রচিত। প্রত্যেকেই বহুবিধ গুণ ও ষ্টি। কোন পদার্থের গঠন জটিল, কাহারও গঠন সরল; অর্থাৎ, থের সংহত অবয়বসমূহ সংখ্যায় অত্যল্প, কাহারও অধিক। নি পদার্থ ক্ষুদ্র, কেহ বা মহান্; অর্থাৎ, কোন পদার্থের পরি- ও ক্রিয়ার সমষ্টি অল্প, কাহারও বৃহৎ। এইরূপে পদার্থের মধ্যে বিশেষ ঔপলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। বুঝিয়া দেখিলে মানবচরিত্রের মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ, ইহার সংহত অবয়বসমূহ সংখ্যায় অত আর মানবচরিত্রের পরিচায়ক গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি অতি বৃহৎ।

মানবপ্রকৃতিকে অতি মহান্ পদার্থ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে পদার্থের গঠন সরল, যে পদার্থ ক্ষুদ্র, তাহার জ্ঞান অনায়াসগম্য, সাধারণ বুদ্ধির লভ্য। কিন্তু যে পদার্থের গঠন দুর্গম জটিল, যে পদার্থ মহান্, তাহার জ্ঞান সহজে লাভ করা যায় না, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহার ধারণা করা যায় না।

আমি একান্তে বসিয়া কল্পনার সাহায্যে কোন পদার্থ রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ চেষ্টার প্রণালী কিরূপ? সেই পদার্থ যে যে অবয়বসংযোগে গঠিত, প্রথমতঃ সেইগুলি কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। মনে করুন আমি বৃক্ষ কল্পনা করিতেছি। বৃক্ষের শাখা কাণ্ড পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি কল্পনাবলে গঠিত করিতে হইবে। যদি আমার কল্পনাশক্তি প্রবল হয়, তবে বৃক্ষের সমস্ত অবয়বগুলি আমি এককালে চিত্তে ধারণা করিতে পারিব। সুতরাং আমার দ্বারা বৃক্ষরচনা দুঃসাধ্য হইবে না। যে পদার্থের গঠন সরল হয়, সে পদার্থ যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার সৃষ্টি করা সহজ হইবে। কিন্তু সে পদার্থ যদি বৃহৎ হয়, তবে তাহার সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হইবে। যে পদার্থ দুর্গম জটিল হয়, তবে তাহার সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হইবে।

এইরূপে বৃক্ষের সংহত অংশগুলি রচনা করিয়া লইলে পর, সেই সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, সেই সমষ্টি কল্পনার সাহায্যে রচনা করিতে হইবে। এই সমষ্টি যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার কল্পনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। কিন্তু এই সমষ্টি যদি বৃহৎ হয়, তবে তাহার রচনা অতি কঠিন হইবে। যদি আমার কল্পনাশক্তি যদি দুর্ব্বল হয়, তবে এ কার্য্য বোধ হয়, আমার অসাধ্য হইবে। কিন্তু আমার যদি প্রবল কল্পনাশক্তি থাকে, তবে হয় ত আমি সেই বৃহৎ সমষ্টিকে কোন মতে কল্পনাবলে পুনর্গঠিত করিতে পারিব। যদি কল্পনীয় পদার্থের সমস্ত অবয়ব ধারণায় আনিতে পারি, কল্পনার সাহায্যে তাহার নিখিল গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির পুনর্গঠন করিতে পারি, তবেই আমার সে পদার্থ সুসম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না।

কল্পনীয় পদার্থ যদি সাকার না হইয়া নিরাকার হয়, স্থূল না হইয়া সূক্ষ্ম হয়, কল্পনার বস্তু যদি বৃক্ষ না হইয়া মানবচরিত্র হয়, তবে এ সৃষ্টিকার্য্য কিরূপ দুরূহ ব্যাপার হইবে! আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানব অপেক্ষা মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর নাই। আর যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া মানবচরিত্র, সে সমষ্টিও অতি বৃহৎ। অতএব কল্পনাবলে মানব-চরিত্রের সৃষ্টি করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। অতিতেজস্বিনী কল্পনার অধিকারী না

...নার ন... লাভ করা যায় না, অতি পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র ...ে চরিত্র যথাযথ ... করিতে প... যদি পুনর্গঠিত ...বতে প্রয়াস করেন, তবে কল্পনাবলে ...সুকৃতি রচনা কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা পরীক্ষা দ্বারা অনুভব ...রেন। আর সে চরিত্র যদি অর্দ্ধপরিচিত কিংবা অপরিচিত হয়, তবে ... কর্ত্তার রচনাপ্রয়াস যে সর্ব্বথা বিফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে আমি কল্পনাবলে বৃক্ষরচনা করিতে বসিয়াছি। যে সকল অবয়বসংযোগে বৃক্ষের গঠন, কল্পনার সাহায্যে তাহার পুনর্গঠন করিয়াছি। পরে যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, কল্পনাবলে তাহারও সৃষ্টি করিয়াছি। অনেকে হয় ত ভাবিবেন যে, এত দূরে আমার বৃক্ষরচনা শেষ হইয়াছে। আমি কল্পনার সাহায্যে একটি সত্যসঙ্গত যথাযথ বৃক্ষের প্রতিরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। রচনার জন্য যাহা প্রধান কার্য্য, যাহা অত্যাবশ্যক কার্য্য, তাহা আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী, নর, নারী, সমস্তই জীবন্ত, কেহই প্রাণহীন মৃতবস্তু নহে। প্রত্যেক পদার্থের অভ্যন্তরে একটা জীবনীশক্তি আছে, যে শক্তিবলে সেই পদার্থের নিখিল অবয়ব সুসংহত থাকে, যে শক্তি দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া সংসাধিত হয়, সমগ্র গুণ নিয়মিত হয়। সে শক্তি সেই পদার্থের জননী ও পালনী। ধান্যবীজে ধান্য হয় কেন, আম্র হয় না কেন? আম্রবীজে আম্র হয় কেন, ধান্য হয় না কেন? ইহার একমাত্র হেতু এই যে, প্রত্যেক পদার্থের এক একটি স্বতন্ত্র বীজশক্তি আছে। সেই শক্তির আধার বলিয়াই পদার্থের গুণ ও ক্রিয়ানমষ্টি রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত; বৈজ্ঞানিক সংযোগে মিলিতমাত্র নহে। সেই জন্য বিভিন্ন বহু গুণের সমবায়ে এক পদার্থের সৃষ্টি হয়। বহুবিধ ক্রিয়া একই পদার্থে লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমি কল্পনাবলে বৃক্ষ সৃষ্টি করিতেছি। যদি কোন মতে বৃক্ষের যাহা বীজশক্তি, সেই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আমার মনের মাটিতে বপন করিতে পারি, তাহা হইলে আম্রবীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে যেমন কাণ্ড-শাখা-পুষ্প-সমন্বিত আম্রবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ বীজশক্তি আমার ...ত্রে বৃক্ষের একটি সত্যানুগত যথাযথ প্রতিরূপ সৃষ্টি করিবে। সেই ...ক্ষের নিখিল গুণ ও সমগ্র ক্রিয়া রাসায়নিক সংযোগে সাধিত হইবে। তখনই আমার প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষসৃষ্টি হইবে। অতএব

যদি মানুষ কোন পদার্থের সৃষ্টি [illegible] করিতে [illegible] সেই বীজ মান[illegible] প্রকৃতির অনুকরণে সৃষ্টিকার্য্যে প্র[illegible] হইতে হইবে [illegible] সেই পদার্থের বীজশক্তিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। [illegible] হইবে কেবল কল্পনা করিয়া প্রকৃতির প্রণালীমতে ভিতর হ[illegible] পদার্থকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই পদার্থের যথার্থ পুনর্গঠন [illegible]।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, মানবচরিত্র সম্বন্ধেও সে কথাই বক্তব্য। প্রত্যেক চরিত্রেরই একটি বীজশক্তি আছে। ঐ শক্তিবলে তাহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ভাব, সমস্ত ভাষা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চিন্তা নিয়মিত হয়। যদি কোন মতে ঐ বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া আমরা চিত্তভূমিতে বপন করিতে পারি, তবেই মানস-পটে সেই চরিত্রের যথাযথ প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিবে। তাহা হইলেই আমাদের সৃষ্ট চরিত্র সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না। কারণ, চরিত্রের গুণ দোষ কার্য্যাকার্য্য মিলিত করিলেই মনুষ্য সৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা তাহাদিগকে মিশ্রিত করিতে হইবে। এক যুগকাষ্ঠ তৈল ও জল মিলাইয়া রাখিলেও তাহা মিশ্রিত হয় না; কিন্তু অম্লজান ও জলজান রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত একীভূত হইয়া নূতন বস্তুর সৃষ্টি করে। এইরূপে চরিত্রের বীজশক্তির সাহায্যে সমস্ত গুণ-দোষ কার্য্যাকার্য্য একীভূত হইয়া সজীব মনুষ্য-চরিত্র সৃষ্ট হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, ইংরাজ কবি ড্রাইডেন তীব্র বিদ্রূপের ভাষায় জিমরি নাম দিয়া বাকিংহামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র বিরোধী বর্ণের সমাবেশে উজ্জ্বলীকৃত; বিদ্রূপ-কাব্যের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঔপন্যাসিক স্কট তাঁহার উপন্যাসবিশেষে বাকিংহাম-চরিত্রের অবতারণা করিয়া ড্রাইডেনের বর্ণনার অনুকরণে সেই চরিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ, স্কট প্রতিভাবলে বাকিংহাম-চরিত্রের যে বীজশক্তি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি বাকিংহামে যে দোষগুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। তাহারা পুঞ্জীভূত হইয়া এক বীভৎস জীবের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, মিশ্রিত ও একীভূত হইয়া মানবচরিত্রে পরিণত করিতে পারে নাই। সেক্সপীয়র যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহার সহিত তুলনা করিলে তাঁহার প্রণালীর

হইবে। তাঁহার ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরায়োলেনস, হেনরি, হটস্পার ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসে তাহাদের দোষগুণ কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ আছে। সেক্সপীয়র সে বিষয়ের কোথাও অপলাপ করেন নাই। ঐতিহাসিক ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেনস, হটস্পার, হেনরি যে যে দোষগুণের অধিকারী, যে যে কার্য্যাকার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেনস, হটস্পার, হেনরীতে তিনি সেই সেই দোষগুণের, সেই সেই কার্য্যাকার্য্যের আরোপ করিয়াছেন। অথচ সেই সকল চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সেই সকল দোষগুণ কার্য্যাকার্য্য এমন ভাবে মিশ্রিত করিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সজীব মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। ব্রুটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেনস, হটস্পার, হেনরি জীবিত অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, তাঁহার কাব্যে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ঠিক সেইরূপই আছেন।

সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতেন। এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে বুঝা যায়, কেন তাঁহার চরিত্রচিত্রণ সজীব, সত্যনিষ্ঠ, সুসঙ্গত। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, সে সমস্তই ঐরূপে চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিবার অবশ্যম্ভাবী ফল। এমতে আমরা ঐ সকল বিশেষত্বের প্রকৃত হেতু অনুধাবন করিতে পারি। সে জন্য আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণের কষ্টকল্পনার ধাঁধায় পড়িয়া পথ হারাইতে হয় না।

চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করা কত কঠিন ব্যাপার, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। কি কৌশলে, কোন প্রতিভাবলে, সেক্সপীয়র এই কঠিন ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন? অতঃপর ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থ কয়েকটি অবয়বের সংহতি, এবং কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। আমরা আরও দেখিয়াছি প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি বীজশক্তি আছে,—ঐ শক্তির প্রভাবেই অবয়ব সংহত থাকে, এবং সমগ্র গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত হয়। মানব কল্পনাবলে ঐ অবয়বসংহতি, ঐ গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি আপন কিঞ্চিৎমাত্র প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিবিম্ব

সুসম্পূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ হয় না। কারণ, যে দর্পণে ঐ প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা হয় ব্যঙ্গ, না হয় কুব্জ; কদাচ সমতল নহে। সেই জন্য ঐ দর্পণ যথাযথ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিবিম্বের সহিত বিম্বগ্রাহক চিত্তের উপরাগ * মিশ্রিত হইয়া যে প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে, তাহাতে পদার্থের স্বরূপ যথাযথ প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য সে প্রতিবিম্ব সত্যনিষ্ঠ হয় না।

সেক্সপীয়রের ব্যাপক সহানুভূতি, উদার অপক্ষপাতিতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বত্র সহানুভূতিশালী; কোন পদার্থেরই প্রতি দ্বেষযুক্ত নহেন। সেই জন্য তাঁহার চিত্তরূপ জাগতিক-দর্পণ পদার্থের যথাযথ প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ ছিল; কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিকৃতির সহিত তাঁহার বিম্বগ্রাহক চিত্তের কোনরূপ উপরাগ মিশ্রিত হইত না। এই সহানুভূতিবলে তিনি সকল প্রকার চরিত্রে আত্মনিমজ্জন করিতে পারিতেন, নদী যেমন আপনা হারাইয়া সাগরে মিশিত হয়, সেক্স-পীয়র সেইরূপ আপনার ব্যক্তিত্ব যখন যে চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন, তাহাতে মিশাইয়া দিতেন। সৃষ্ট চরিত্রের সহিত একীভাব তাঁহার প্রতিভার অদ্ভুত বিশেষত্ব। সেই জন্য তাঁহার এত গ্রন্থ মধ্যে কোথাও তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানা যায় না। তিনি এত বিভিন্ন ভাষায় কথা কহেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা কি, তাহা জানা দুর্ঘট। যাহার মুখে যে কথা সাজে, যে মতামত যাহার প্রকৃতিসঙ্গত, তিনি তাহার মুখে সেইরূপ কথা, সেই মতামত বসাইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকমধ্যে একই বিষয়ে বিভিন্ন ও বিরোধী মতামতের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

সাধারণ কল্পনাসৃষ্ট পদার্থের প্রতিরূপ সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ হয় না। কেন সত্যনিষ্ঠ হয় না, তাহা আমরা বুঝিয়া দেখিলাম। কেন সুসম্পূর্ণ হয় না, তাহার হেতু ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতে অপারগ বলিয়া সাধারণ কল্পনাশক্তি তাহার সুসম্পূর্ণ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু এই কল্পনাশক্তি যদি অসাধারণ হয়, অমানুষী হয়, তবে সেই কল্পনার অধিকারী অমানুষ কবি কল্পনীয় পদার্থের সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপের সৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি প্রতিভাবলে কল্পনাধ্যান করিয়া সেই পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করেন। পরে সেই বীজ তাঁহার চিত্তভূমিতে উপ্ত

* ইংরাজীতে এই উপরাগকে Personal element বলে।

দার্ঢ্যকে বিকশিত করিয়া তুলে। এইরূপে পদার্থের সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়রের কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল, তাহারই সাহায্যে তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ চরিত্রাবলী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন। বিজ্ঞানবিৎ যেমন বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে কোনও বিলুপ্তজাতীয় পশুর ভূমধ্যপ্রোথিত অস্থির একাংশ দেখিয়া সমগ্র পশুশরীর পুনর্গঠিত করিতে পারেন, সেক্সপীয়রও সেইরূপ অমানুষী কবি-কল্পনার বলে চরিত্রের লেশমাত্র দেখিয়া সমগ্রচরিত্রের পুনর্গঠন করিতে পারিতেন। শুনা যায়, কুভিয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ অতীত কল্পের মাসটাডুন জন্তুর অস্থিপঞ্জরের একখান মাত্র হাড় দেখিয়া মাসটাডুন পশুর কিরূপ আকার গঠন দৈর্ঘ্য উচ্চতা ছিল, তাহা স্থির করিয়া তাহার একটা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রও সেইরূপ ওথেলো, হ্যামলেট, ক্লিওপেটরা, হট্‌স্পার, ব্রুটস, ম্যাকবেথ প্রভৃতির বিবরণ ইতিহাসে উপাখ্যানে বা নাটকান্তরে পাঠ করিয়া ঐ চরিত্রের কোন একটা গুণ বা ক্রিয়ার লেশমাত্র অবলম্বন করিয়া অমানুষী কল্পনাশক্তির সাহায্যে সেই সেই চরিত্র পুনর্গঠিত করিতেন। যে সকল চরিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকপোলকল্পিত, তাহাদিগের সম্বন্ধেও ঐ প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিত না। সেই সেই চরিত্রের কোন একটা কল্পিত ঘটনা বা গুণ (যাহা নাটকের আখ্যানবস্তুর উপযোগী যাহার অবতারণা উপাখ্যানের পরিণামসাধনের জন্য আবশ্যক) উপলক্ষ করিয়া সেই সেই চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতেন; পরে তাহার উপর ভিত্তিরচনা করিয়া সমগ্র চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। শুনা যায়, ঐন্দ্রজালিক যাদুকর যাদুবিদ্যার প্রয়োগস্থলীভূত ব্যক্তির সম্পর্কিত কোন একটা কিছু পাইলেই তাহার সমগ্র জীবনের উপর প্রভুত্বস্থাপন করিতে পারে। সেইরূপ সেক্সপীয়র কল্পনীয় চরিত্রের লেশমাত্রের সাক্ষাৎকার পাইলেই সমগ্র চরিত্র কল্পনাবলে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিপ্রতিভার এমনই অদ্ভুত সামর্থ্য ছিল যে, তিনি চকিতমাত্রে যে কোন চরিত্রের সমগ্র প্রতিকৃতি চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। সাধারণ মনুষ্য যেমন কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার মানসে একে তাহার অবয়বসমূহের সংস্থান করে, ক্রমে ক্রমে তাহার গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির যোজনা করে, সেক্সপীয়র সেরূপ করিতেন না। তিনি অমানুষী কল্পনাবলে পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া প্রতিভার বিদ্যুৎ আলোকে

আত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ভাবভঙ্গী, প্রকার, পদ্ধতি, সমস্তই দেখিতে পাইতেন। সেই জন্যই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এমন সজীব সত্যনিষ্ঠ সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইত। সেক্সপীয়রের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক ছিল না। তিনি লাটিন ও গ্রীক অত্যল্পই জানিতেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল। ইংরাজি ভাষায় তখন অনেক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। সেই অনধিকসংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে কখন পদার্পণ করেন নাই। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত প্রর্য্যাপ্ত জ্ঞান, মানব ইতিহাস বিষয়ে প্রগাঢ় প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? অমানুষী কল্পনাশক্তির নিকট হইতে। এই অমানুষী কল্পনাশক্তিই তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব, ইহার অধিকারী বলিয়াই তিনি মহাকবি সেক্সপীয়র।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফতেপুর শিকরি।

আকবরের পবিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর শিকরি আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণ অশ্বযানে আগ্রা হইতে যাইতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পথে দেখিবার জিনিসের অভাব নাই। পথের উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল উর্ব্বরক্ষেত্র ও দুই একখানি বৃহৎ পল্লীগ্রামও দৃষ্ট হয়। নানা ক্ষুদ্র বিহঙ্গম নির্ভয়ে পথোপরি বিচরণ করে। শকুনি ও বায়সকুল পথিপার্শ্বে বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া স্তিমিতলোচনে বিশ্রাম করে, লোক জনের গতায়াত গ্রাহ্যও করে না; কেহ নিতান্ত নিকটে আসিলে অলসভাবে এক আশ্রয় হইতে উঠিয়া অন্য আশ্রয়ে গিয়া উপবেশন করে। পথিপার্শ্বে পল্বলে সারসবলাকাদি নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গম কলরব করে। বিহগকূজিত প্রান্তরে সমুজ্জ্বলপক্ষধারী ময়ূরও নাহে। ইহা ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, টিয়া পাখীর ঝাঁক উড়িতেছে, বসি- [illegible] ছিন্নবস্ত্র স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র কইয়ে বস্ত্রাকারে গমনাগমন

ফারগুসনের মতে আকবরের স্থপতিশিল্পরুচিকৌশলের বিচার করিতে হইলে, ফতেপুর শিক্‌রি দেখিতে হয়। আকবরই এখানে গৃহাদিনির্ম্মাণের আরম্ভ করেন, তিনিই সে সকল সম্পূর্ণ করিয়া যান। অপর কোনও সম্রাট এখানে কোনও গৃহাদির প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড় শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর শিক্‌রি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর শিক্‌রি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানীনির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দরগায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ আকবর সপরিবারে ব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। শাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কানাৎ (পর্দ্দা) সংস্থাপিত হইয়াছিল। আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে পাছে বাদশাহের, তদ্ভোধিক বেগমের কোমলপদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেই জন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, নবাব ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। দরগায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে শিক্‌রির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী সেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। সেই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, যোধাবাইয়ের গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। যোধাবাই তখন গর্ভবতী; কাজেই তাঁহার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অগষ্ট তারিখে যোধাবাই একটি পুত্র প্রসব করিলেন, রাজ্যে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইল। সেই সাধুপুরুষের নামানুসারে, আকবর সাহ পুত্রের মির্জ্জা সেলিম নামকরণ করিলেন। এই মির্জ্জা সেলিমই ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন শিক্রিতে রাজধানীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন শিক্রিতে রীতিমত দুর্গনির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার এক স্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এ স্থান হতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগ্রা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়া রাজধানী; রাজার বাসস্থানপরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন। সম্রাটের আদেশে আগ্রার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর শিক্রি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর শিক্রিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে আর মানবপদধ্বনি ধ্বনিত হয় না, যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃতনগর; যেন কুশপরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশার,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে;
আপনার পথ হেরি মুখর উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।"

"খোদিত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হয়ে রয়েছে এখন;
তরু অহিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর-ত্যাগের কারণ।

দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই "বুলন্দ দরওয়াজার" মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফার্গুসনের মতে, ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ জগতে, আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছু "বক্‌শিস"-লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ মসজিদ হইতে সেই সরোবরসলিলে লাফাইয়া পড়ে। বুলন্দ দ্বারের উপর আরোহণ করিলে, পরিত্যক্ত নগরী ও পার্শ্ব-

বর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়নসমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অপর তিন পার্শ্বেই স্ত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি মর্ম্মরনির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ বিতান করা ও হর্ম্ম্যতল নানাপ্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রে সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান দ্বিতানে লিখিত খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে সেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্ত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমলধবল মর্ম্মরের গঠন। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ধবলপ্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণবস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি সেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধিমন্দিরা-ভ্যন্তরে খচিত মর্ম্মর আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধিনির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজি লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাট ফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিলে, আবুল ফাজেলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফয়জীর সুগঠিত নিবাসগৃহে উপনীত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা; এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে তাহার কিছু নষ্ট হয় নাই। তৎপরে যোধাবাই-য়ের মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে ও দক্ষিণে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি

প্রাকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা করা। প্রাসাদ ব্রহ্ম-প্রস্তরের গঠন; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নারাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে কতকগুলি অতি সুন্দর গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল প্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতিসুন্দর কারুকার্য্য-খচিত;—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, যেন কোন জাপানী শিল্পী দন্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরিতল কয়টি গম্বুজে সুশোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গনের অপরাংশে আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত। কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশ বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান মহিষীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকার পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি? বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তঃপুরচারিণীগণ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ "পঞ্চমহল"। ইহার প্রথম তলে ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ, তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি ও ত্রিতলে পনেরটি ও চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলার কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীরসেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিমণ্ডিত; অপরটি, একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফলচয়নে রত দর্শিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধমন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়টি কোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের

পরে অশোক ধর্ম্মপ্রচারের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন, এবং তাঁহার সাধারণ ধর্ম্মানুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেন। রাজাজ্ঞায় চারি দিকে ধর্ম্মভেরী বাজিয়া উঠিল, এবং ধর্ম্মার্থ জনগণের সম্মুখে হস্তী, রথারূঢ় দেবগণ ও অন্যান্য দিব্য রূপ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণের অহিংসা, জীব ও কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতার ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা প্রভৃতি সৎধর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। (৩) রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের প্রতি এই আজ্ঞা প্রদত্ত হয় যে, নানা রাজকার্য্যের জন্য ও নিম্নলিখিত ধর্ম্মার্থ প্রচারের জন্য, তাঁহাদিগকে প্রতি পঞ্চম বৎসরে স্ব স্ব ইলাকায় ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে—

পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের শুশ্রূষা সাধু,

জীবে দান সাধু,

অপভণ্ডদিগের প্রতি নিন্দাবিমুখতা সাধু। (৪)

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা আদেশ করেন যে, প্রজাগণের কথা কিম্বা মন্ত্রী ও পঙ্কের বিবাদ বা প্রবঞ্চনার কথা জানাইবার জন্য প্রতিবেদকগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন; তাঁহার ভোজনকালেই হউক, আর তিনি শুদ্ধান্তে, "খাসকামরা"য়, রথে, বা সুখোদ্যানেই থাকুন, প্রতিবেদকগণ যখন ইচ্ছা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন। (৫) সর্ব্বলোকহিতের জন্য কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহার মূলে পরিশ্রম ও (ক্ষিপ্র) কার্য্যকারিতা।

রাজা আজ্ঞা প্রচার করেন যে, আহারার্থ কোন জীব নাশ করা উচিত নহে, যজ্ঞরূপে জীবনাশ করাও অনুচিত। অধিকাংশ সমাজ-(পর্ব্বমেলন)-ও মন্দ, কেবল কতকাংশে ভাল। ভবিষ্যতে রাজরন্ধনশালায় আহারার্থ কোন জীব নাশ হইবে না। (৬) জীবের জীবনরক্ষার জন্য নিজ রাজ্যে ও অপরান্ত রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়;—এক প্রকার মানবের জন্য, অপর প্রকার পশুর জন্য। যেখানে ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেখানে রাজাজ্ঞায় নূতন বীজ রোপিত হইল। সাধারণের হিতার্থ স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইল। (৭) এই সকল ধর্ম্মানুশাসনের প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য হইতেছে কি

(৩) চতুর্থ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৪) তৃতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।
(৫) ষষ্ঠ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৬) প্রথম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।
(৭) দ্বিতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

না, তাহা দেখিবার জন্য, অভিষেকের ত্র
বৎসরে) অশোক ধর্ম্মমহামাত্য নামক এ

অশোকের গিরিলিপিসমূহের প্রধান

১। প্রাণীর অহিংসা,

২। পিতামাতার শুশ্রূষা,

৩। বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সদ্ব্য

৪। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান ও

৫। দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি সদ্ব্য

৬। বিধর্ম্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখ

৭। শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃ

এই সকল ধর্ম্মনীতি নীতিবিজ্ঞানের
প্রশংসনীয়। দ্বিসহস্রার্দ্ধ বৎসর পূর্ব্বে,
পূর্ব্বে, এই মহান্ উপদেশের প্রচার ক
চায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অ
ও শ্রমণদিগের নিকট হইতে সঙ্কলিত হই
কোনও মানসিক বিশেষত্ব নাও থাকিতে
মত জন কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের উপ
জনগণের নিকট আদৃত হয় নাই। অ
ধর্ম্মেচ্ছাপ্রণোদিতচিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়
শীঘ্রই এই সকল উন্নত মত স্বীয় বৃহৎ
বহুলভাবে প্রচারিত করেন, এবং আংশি
ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে কয়জন নৃপতি মান
করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে যুগাবতার বলি
পতির মধ্যে অশোকের স্থান যে অতি

অনেকে মনে করেন যে, প্রথম হইতে
পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এই গিরিলিপিমালা
ভ্রমমূলক। রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসর প
ধর্ম্মাবলম্বনের যথোপযুক্ত প্রমাণাভাব সহ
অনুশাসনসমূহ, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন,

(৮) পঞ্চম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

জন ছত্রধারী ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া শ্ম
আসিতে দেখিয়া দাসী বাসবদত্তাকে ত
বশতঃ বাসবদত্তা দাসীকে দিয়া আ
করাইয়া রাখিল। উপগুপ্ত সম্মুখে আসি
যখন বিকশিত বিসপ্রসূনবৎ রমণীয় ছি
সুশোভিত থাকিত, যখন ইহা নিজগু
আমি এমনই দুর্ভাগ্য ছিলাম যে, আ
ইহার কি আছে? এখন ইহার দুর্দ্দশা
হইতে আনন্দ, ভোগ, সুখ, সৌন্দর্য্য,
রুদ্দমাক্ত, রক্তাপ্লুত, ঘৃণার উদ্দীপক দে
উপগুপ্ত কহিলেন, "ভগিনী, আমি তে
নিকট আসি নাই। আমি এখন দেখিতে
বস্তু কতই না দুর্দ্দশাকর।"

ইহার পর তিনি সেই মরণাহতা পা
লাগিলেন। (১৪) তাঁহার উপদেশে
বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, এই তিনে আশ্রয় লইয়

(১৪) সেই ধর্ম্মোপদেশের ভাবার্থ Paul Ca
"I have seen with mine eyes the T.

সতী।

গাথা।

১

নাথ।" হয় না প্রত্যয়।
ক যদি সখা হয়।
ই আপনি দেবতা
ত্য-মঙ্গল-দায়তা।
ি, চতুর্ব্বর্গ-ফল,
ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থল।

দ্ধ কণ্ঠ স্ফুরে না বচন,
ভয়ে প্রাণে মহাত্রাস।
—ধরা বাষ্পময়,
বে—তাকুলে আশ্রয়।
পি সমুদ্র-উপরি
কূলে অবতরি।

দিন—কেন নদীকূলে
জল তব কথা ভুলে।
পাপ—এক ভ্রম-পাপ
ত—নরক-সন্তাপ।
আমি।" রক্তাক্ত কপাল।
নাথ, রাখ পরকাল।"

রূপ—পাপরূপে ধিক্,
থি পাপের-অধিক।
লে চকিতে আমায়—
া ক্রন্দন বৃথায়।
জলে, করিল বন্ধন—
নাই, জগতে মরণ।

দিন নাই রাত নাই, নিত্য এ কামনে
প্রবোধিতে আসে চেড়ী নানা আভরণে,
কহে কত পাপ কথা। ও পদ স্মরিয়া
এখনো এ দেহে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া।
এত দিনে, হে দেবতা, হলে কি সদয়!
মিলিল মরণমুখে হৃদয়ে হৃদয়।

পবিত্র কৃতার্থ দাসী, গৃহে যাও, স্বামী,
আপার অধিক ফল লভিয়াছি আমি।
আজি সে নির্দ্দিষ্ট দিন, পাপিষ্ঠ দানবে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আলিঙ্গিতে হবে।
যাও প্রভু হাসিমুখে, বল দাও মনে,
লুটে না পূজার ফুল দানব-চরণে।

সহসা খুলিল দ্বার, আলোক ঝলকি,
শুকাল যাতনা মুখ, নবাব দেখিল।
যুবক দাঁড়াল ফিরে স্থির নির্ব্বিকার,
বাম করে প্রিয়া-কটি, অন্যে তরবার।
নবাব হটিল পিছে, রোষে চক্ষু জ্বলে—
"লয় করি দগ্ধ কর মোহে চিতানলে।"

২

রাজপথে জনতায় পথ চলা দায়,
জ্বলিছে জ্বলন্ত রবি মধ্যাহ্ন-রেখায়।
আকাশ নিষ্কম্প স্থির, জগত নীরব,
নীরব নিস্তব্ধ সব, নড়ে না পল্লব,
প্রোথিত হইল দণ্ড, জনতা উগ্রীব,
বাজে ঘন জয়ঢাক, ফুকারে নকীব।

---

ms of a lovely form are treacherous and quickly lead into
which have proved too strong for you. But there is a beauty
fade; and if you but listen to the doctrine of our Lord,
will find that peace which you never would have found in
vorld of sinful pleasures"

তাহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেন। (৩) এক দিন তাঁহার চাপল্য ও উপদ্রবাদির জন্য তিরস্কার করিয়া তাঁহার জননী রাণু বাঈ তাঁহাকে বলেন, "স্থিরপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও ধনধান্য উপার্জ্জন করিতে না পারিলে সমাজে স্থান লাভ করা যায় না। বাছা! তোমার চিত্ত যেরূপ অব্যবস্থিত দেখিতেছি, তাহাতে তোমার গতি কি হইবে ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি।" এই কথা শুনিয়া নারায়ণ ধনধান্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি পরদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, তথায় ধান্যপূর্ণ গোণীর অভাব নাই। অমিতবলশালী নারায়ণ প্রতিষ্ঠালাভের উপায় সম্মুখে দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে একটি গোণী তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শস্যস্বামী পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। নিরুপায় বণিক্ পরিশেষে তাঁহার মাতার শরণাপন্ন হইল। বণিকের অভিযোগে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, নারায়ণ সত্বর তাহার শস্যগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আঃ! অকারণ গোলমাল করিতেছ কেন? শস্য লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, নতুবা আসিয়া জানিতে পারিলে তোমায় তাড়না করিবেন!" (৪) নারায়ণ

(৩) রামদাস স্বামীর বখর (৺মহাদেব বিনায়ক চৌবল কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত) দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২। এবং গোবর্দ্ধন দাস লক্ষ্মীদাস ঠাকুরের প্রকাশিত বখরের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১২৯ হইতে ১৫২ শ্লোক। রামদাস স্বামীর বখর নামক গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভক্তচরিতাধ্যায়ক মহীপতি বখরকার অপেক্ষা ৪০।৬০ বৎসরের প্রাচীনতর লেখক; সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ তথ্যমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী নারায়ণের বাল্যাবস্থায় দুরন্তপনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবকাশ পাইলেই কোমলমস্তিষ্ক নারায়ণ কলনাদিনী গোদাবরীতটে বা ঘনচ্ছায় ন্যগ্রোধমূলে বসিয়া পরিণতবয়স্ক দার্শনিকগণ যে সকল চিন্তায় "ব্যামোহিত" হন, সেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তনির্ণয়ের জন্য গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতেন। তিনি ব্রাহ্মণধর্ম্মের অবনতিদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া উহার অবনতির কারণনির্ণয়ে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়সের সময় ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্বিষয়ে লীন করিয়া নারায়ণ এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক "ভারতচিন্তায় চিত্রিত" থাকিতেন। নারায়ণকে ইহার জন্য অসীম ভৎর্সনা ও সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইত; ইত্যাদি। (শিবাজীর জীবনচরিত ১০২।৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কোনও মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে আমরা এ সকল কথার নামগন্ধও পাই নাই। কোনও দেশের অষ্টমবর্ষীয় বালকের চিত্তে এরূপ জটিল বিষয়ের গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধেও আমাদিগের গভীর সন্দেহ আছে।

বাল্যকালে কিরূপ দুর্দান্ত ও সুপ্রতিভ ছিলেন, এই ঘটনায় তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েও তাঁহার বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। তিনি এমন [illegible] ছিলেন যে, পঞ্চমবর্ষ বয়সে শিক্ষারম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম বয়সে মৌঞ্জীবন্ধনের পর তিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বেদাভ্যাসে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তদীয় অধ্যাপক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। (৫)

নারায়ণ বাল্যকালে যেমন দৌরাত্ম্যে অকুতোভয় ও দুর্নিবার ছিলেন, "কুলদেবতার" প্রতি ভক্তি ও স্বধর্ম্মানুরাগও তাঁহার তেমনই প্রগাঢ় ও প্রবল ছিল। ধর্ম্মশীলতায় তিনি যে কেবল পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার জনকজননী অপেক্ষাও তদীয় চরিত্রে অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছিল। একদা সূর্য্যাজী পন্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রদিগকে লইয়া মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন মহাপুরুষ একনাথ স্বামীকে দেখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান নগরে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, "শ্রীন (একনাথ) মাসকতিপয়মাত্রবয়স্ক নারায়ণের লক্ষণাদি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সৌভাগ্যশালী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক জগতের (দেশের) উদ্ধারসাধন ও কোনও শকপ্রবর্ত্তক নরপতির দ্বারা ভূভারহরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবে।" মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী বিফল হয় নাই। উত্তরকালে এই নারায়ণই "সমর্থ রামদাস স্বামী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে আসীন হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করিয়া "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

গৃহে নিত্য হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণ পাঠ, দেবার্চ্চনা এবং সদাচারপরায়ণ পিতামাতার ধর্ম্মশ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সুদৃষ্টান্তে অতি অল্প বয়সেই নারায়ণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল ভানুজী গোঁসাই একনাথ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তিনি পর্ব্বক্রমে

(৫) সন্তবিজয় ১ম অঃ ৭৮।৭৯ এবং ৯৪ শ্লোক। সত্য বাবু বখরকারের মতানুসরণ করিয়া ৫ম বর্ষে নারায়ণকে উপনীত করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাচীন লেখক মহীপতির মতানুসরণ করা সঙ্গত বোধ করিলাম।

হরিসংকীর্ত্তনাদি উৎসবের সময় সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া কথকতার দ্বারা "অদ্বৈতনিরূপণ" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। রামনবমী প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে বহু সাধুর সমাগম হইত। গৃহস্বামী অবসর পাইলেই স্ত্রী পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশের প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষদিগের সন্দর্শনের জন্য তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিতেন। এই সাধুসহবাসের ফলে ও গার্হস্থ্য শিক্ষার গুণে নারায়ণের ভগবন্নিষ্ঠা ও কুলদেবতার প্রতি ভক্তি অল্প দিনের মধ্যে ঐকান্তিক ভাবে পরিণত হইয়াছিল। পৌরাণিক ভক্তকথা শুনিয়া তাঁহার শৈশবসুলভ সরলচিত্তে ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের দর্শনলাভবাসনা সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপুরশ্চরণ না করিলে ভগবদ্দর্শন ঘটে না। এই কারণে, কৈশোরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য নারায়ণের অতীব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর তদীয় সংকল্পে বাধা প্রদান করিলে অভিমানক্ষুব্ধ নারায়ণ মারুতির মন্দিরে গিয়া সরল শিশু-হৃদয়ের স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাষায় "অভঙ্গ" (কবিতা) রচনা করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। স্তবপাঠ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ভক্ত বালক এক দিন দেবমন্দিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (৬) অদ্যাপি মহারাষ্ট্রবাসীর বিশ্বাস, ভগবান্ রামচন্দ্রের "একনিষ্ঠ সেবক ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ" মারুতির অনুগ্রহ ভিন্ন রামচন্দ্রের দর্শনলাভ অসম্ভব। এই কারণে বালক নারায়ণ মারুতির প্রসা-

(৬) বখরকার বলেন, সেই দিন মারুতি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া নারায়ণকে ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া "রামদাস" আখ্যা প্রদান করেন। পরন্তু নারায়ণের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনও ঘটে। কিন্তু মহীপতির সন্ত বিজয় ও ভক্তবিজয়ের বর্ণনামতে ইহার বহু বর্ষ পরে নাসিকের নিকটস্থিত পঞ্চবটীতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর প্রামাণিক জীবনলেখক মহ্লার রামরাও চিটনীসের লিখিত বিবরণও মহীপতির উক্তির পরিপোষক। বলা বাহুল্য, মহ্লার রাওয়ের গ্রন্থ সমালোচ্য বখর অপেক্ষা প্রাচীন। স্বয়ং রামদাস স্বামী আপনার দীক্ষাবিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও মহীপতির উক্তিই সমর্থিত হয়। সত্যচরণ বাবু এখানেও অন্ধভাবে বখরকারের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অষ্টম বর্ষীয় নারায়ণকে দীক্ষালাভের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ভারত-উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী সাজিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত বক্তৃতা করিতে দেখিতে পাই। দুঃখের বিষয়, কোনও মহারাষ্ট্রীয় বখরে এ প্রসঙ্গে রামদাস স্বামীর মুখে স্বদেশের হিতসাধন বা তন্নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের কোনও প্রস্তাবই আমরা দেখিতে পাইলাম না।

বের যে দুর্দ্দমনীয়ভাব তাহা পিতামাতার শাসন আতঙ্ক সকল বালককে "দুরন্তপনা"র অপবাদিত করিয়াছিল বয়ঃ সহিত ক্রমে তাহা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মসাধন- ও অবিচল করিয়াছিল।

অল্পকাল পরেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় নারায়ণের স্বচ্ছন্দাচার ছিল। (৭) ক্রমে নারায়ণ দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তথাপি ন্যূন কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলে তার কিছু লাঘব হইতে পারে বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে ার সংকল্প করিলেন। (৮) ইষ্টদেবতার উপাসনায় পুত্রের হে দেখিয়া ও মাতৃভক্তির আরাধনায় তাঁহার বৈরাগ্যশীলতার ও হয় ত তিনি পুত্রকে সংসারপাশে বদ্ধ করা আবশ্যক ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাধরের বিবাহ সূর্য্যাজী পন্থের জীবদ্দ- হইয়াছিল; এবং তিনি গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন র ইষ্টদেবতার দর্শনলাভবাসনা এরূপ দুর্দ্দম্য ভাব ধা তিনি অভীষ্টদেবের সান্নিধ্যলাভ আশায় ভগবান্ রামচন্দ্রের মারুতির ন্যায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতের পালনে কৃতসংকল্প সুতরাং মাতার মনোভাব অবগত হইবামাত্র তিনি গৃহপরি- ননাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার পর হে আনীত হইলেন বটে, কিন্তু কেহই সেই তেজস্বী বালককে বিরুদ্ধে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারিলেন না। বিবা- পিত করিলেই তিনি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একবার এক বনপল্লব বটবৃক্ষে আরোহণ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ দেখিতে পাইয়া অবতীর্ণ হইবার বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে তিনি নিকটবর্ত্তী এক প্রদান করিয়া সকলকে ভীত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় তাঁহাকে

---

৮ ইহার পরও প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের অধিক কাল সূর্য্যাজী পন্থকে জীবিত ছিলেন হইয়াছেন, বোধ হয়।

৭কৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১৫৫ শ্লোক।

নায় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যোগিগণ সাধারণতঃ নির্জ্জন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পার্থিব জগতের শুভাশুভ হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া ধ্যানমগ্নচিত্তে অক্ষয় ব্রহ্মানন্দভোগে হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবদ্দর্শনজনিত সাত্ত্বিক আনন্দলাভের কিঞ্চিৎকর সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিশোরবয়সে গৃহত্যাগী তিনি এক্ষণে কেবল আত্মসুখানুসন্ধায়ী হইয়া জীবনের উচ্চতর পক্ষা প্রকাশ করিলেন না। তিনি মোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রাপ্ত দর আস্বাদন করিয়াও দুঃখযাতনাসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ সংসার- হইলেন, এবং তাপত্রয়ক্লিষ্ট, দীনভাবাপন্ন ও পরস্পর-বিবদগণের ক্লেশবিমোচন ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মোন্নতিবিধানে আত্মশক্তি রিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দেশময় পর্য্যটন পূর্ব্বক, তাঁহার বহু নালব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া মহাকে সঞ্জীবিত, সম্মিলিত ও স্বধর্ম্মানুরক্ত করিবার বাসনা, তাঁহার র্ম্মানুরাগপরায়ণ উন্নত হৃদয়ে স্বতই উদিত হইয়াছিল। বাদশ বৎসরের তপস্যায় তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ ও শাস্ত্রজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র জাতির শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে নানাদেশপরিভ্রমণজনিত যে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার আবশ্যক, তখনও রামদাস স্বামীর তাহার সংস্থান ছিল না। এই কারণে এবং শাস্ত্রানুসারে, "পৃথিবী-প্রদক্ষিণ"-পূর্ব্বক তীর্থদর্শন না করিলে সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভ হয় না বলিয়া, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "পৃথিবী প্রদক্ষিণ" ও তীর্থাটনকার্য্য পরিসমাপ্ত করিবার মানস করিলেন।

এই সংকল্পানুসারে ২৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রামদাস স্বামী পৃথিবী-প্রদক্ষিণে (ভারতভ্রমণে) যাত্রা করিলেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিমাহাত্ম্য ও রামোপাসনার প্রচারপূর্ব্বক শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে করিতে ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। প্রথমে বারাণসীক্ষেত্র ও তৎপরে যথাক্রমে অযোধ্যা, গয়া, প্রয়াগ, গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবন ও পিণ্ডার্ক প্রভৃতি ক্ষেত্র পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীমূর্ত্তির (রামচন্দ্র মূর্ত্তির) প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে জ্ঞানধর্ম্মে ও রামোপাসনায় দীক্ষিত করিয়া দেবভূমি হিমাচলের উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি শ্রীনগর, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, উত্তর মানস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থসমূহের দর্শন ও

তথায় কিয়ৎ কাল অবস্থান করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রামদাস পূর্ব্বাঞ্চলের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় স্বমত প্রচার ও মঠস্থাপন করিয়া, তিনি দক্ষিণসমুদ্রতীরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিলেন। কথিত আছে, বিভীষণের রাজধানী দর্শন মানসে সিংহল দ্বীপেও গমন করিয়াছিলেন। রামদাস তথা হইতে করিয়া তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের নানা তীর্থে বহুদিনান্তে পুনর্ব্বার গোদাবরীতীরে নাশিকের সন্নিহিত গত হইলেন। পৃথিবীপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া তিনি "গঙ্গা-ও করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি গোদাবরীর (গঙ্গার) উৎ পর্ব্বতস্থিত "ত্র্যম্বকেশ্বর" হইতে পূর্ব্বসাগরের তীরবর্ত্তী "রাজন সমস্ত ভূভাগ পরিক্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তি যে সকল অংশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় প্রত স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মচার্য্যগণের সহিত তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। এইরূপ দেশপরিভ্রমণে দ্বাদশ বর্ষ অতি হয়। (১৬)

এত দিনে রামদাস স্বামীর সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সহিত অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছিলেন। (১৭) যৌবনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও শাস্ত্রবিচারে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

(১৫) মহারাষ্ট্রীয়গণ গোদাবরী নদীকেই গঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শিব-পুরাণে লিখিত আছে যে, মহর্ষি গৌতমের আশ্রম পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে ছিল। তিনি একদা গোহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্য শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান ত্রিলোচন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহর্ষি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করের বরে গঙ্গা গৌতমের আশ্রমের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইলেন। সেই গঙ্গাই কলিযুগে গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধা হন।

(১৬) রামদাস স্বামীর বখরের উভয় সংস্করণেই "পৃথিবী-প্রদক্ষিণের বিবরণ" সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(১৭) রামদাস স্বামীর বখরে ও মহীপতিকৃত সন্তবিজয়ে রামদাস স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অভ্রান্ত-লক্ষ্যতা সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আমরা উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। সেকালের প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় বালক অশ্বারোহণাদি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। রঙ্গনাথ স্বামী প্রভৃতি রামদাসের সহযোগিগণও অশ্বারোহণাদিতে নিপুণ ছিলেন। গ্রামলেখকের ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র—বিশেষতঃ রামদাসের ন্যায় দুর্দ্দান্ত বালক যে বাল্যকালে সে শিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন, ইহা আমাদের কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। সেকালের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও যে অশ্বারোহণাদি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, শিবাজীর বখরে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেশপর্য্যটনের ফলে লোকচরিত্র, রাজনীতি এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি, ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। মলিনতা প্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্মের পরিমার্জ্জন ও নিষ্কাম ধর্ম্মমূলক ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করিয়া, স্বদেশবাসিগণকে জ্ঞান ধর্ম্মে গরীয়ান্ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল। পৃথিবী পর্য্যটন পরিসমাপ্ত হইলে তিনি শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনাবিধানের জন্য কিয়দ্দিবসমাত্র জন্মগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজাতির হিতসাধন মানসে কৃষ্ণাতীরে—মহারাষ্ট্র দেশের কেন্দ্রস্থলে গমন করেন। কথিত আছে, তাঁহার ইষ্টদেবতার আদেশই তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ কৃষ্ণাতীরে গমনে উদ্বুদ্ধ ও ত্বরমাণ করিয়াছিল।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রামদাস প্রথমতঃ কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থান মহাবলেশ্বরে আশ্রম স্থাপন করিলেন। এবং হরিসংকীর্ত্তন, কথকতা, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নানা স্থানে "সগুণোপাসনার" প্রচার করিয়া "ভক্তিমার্গ বিস্তার" করিতে লাগিলেন। ক্রমে রবাম স্বামী, মোরয়াদেব, কেশব স্বামী, রঘুনাথ স্বামী ও তুকারাম প্রভৃতি তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয় সাধুবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবন্নিষ্ঠা ও সদাচার প্রভৃতি গুণে সাময়িক ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধুপুরুষগণের শীর্ষস্থানীয় হইলেন। রামদাস যাঁহাদিগকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারাই তদীয় 'মধ্যাত্মশক্তি' দর্শনে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে "সমর্থ" এই গৌরবাদ্যপ উপাধি প্রদান করিলেন।

আমরা এইখানে রামদাস স্বামীর সাধনাবস্থার ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সাধনালব্ধ শক্তির বলে মহারাষ্ট্র সমাজে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, বারান্তরে তাহা আমাদিগের আলোচ্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

শ্রীমতী ইডেরার্ড কোট্‌স।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ইংরাজ, আমেরিকান ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পাঠকসম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে পরিচিতা ও সমাদৃতা। অল্প দিন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও তাঁহার স্নেহপূর্ণ ও আনন্দপ্রদ রচনা ইতিমধ্যেই তিনি পাঠকসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নূতন পুস্তক, A Voyage of Consolation প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে "বর্ত্তমান" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব।

বংশপরিচয়।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ক্যানেডিয়ান। তিনি অণ্টরিও প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্রাণ্টফোর্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিষ্টার চার্লস ডন্‌কাম যৌবনে জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এখানে তিনি এক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্মানিত নাগরিক। তিনি নানা উচ্চ নাগরিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষা; বাল্যরচনা।

শ্রীমতী কোট্‌স্ ব্রাণ্টফোর্ড ও টরণ্টো এই দুই স্থানে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষার যোনও বিশেষত্ব ছিল না; সাধারণতঃ সকলের যেরূপ শিক্ষা হয়, তাঁহার সেইরূপ হইয়াছিল। বাল্যে বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশের জন্য সম্পাদকদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে সকল রচনা অধিকাংশ লেখকের বাল্যরচনার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রয়াসের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। দুই একটি রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহার রচনাস্পৃহাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীমতী কোট্‌স্ তাঁহার পিতার প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতাকে বৃহৎ সংসার চালাইতে হইত, সেই জন্য তিনি প্রথম হইতেই কন্যার সাহিত্যসেবায় অধিক অর্জ্জনস্পৃহার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রসেবা।

তিনি প্রথমেই কয়খানি দৈনিকপত্রের সংবাদদাতা হইয়া মিউ-অর্লিন্স প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। আমেরিকায় সাধারণতঃ বালিকাগণ একটু অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং তদ্দীয় পিতা তাঁহার বিদেশগমনে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। যৌবনসুলভ অদম্য উৎসাহসহকারে, যে প্রকারেই হউক, জীবনসংগ্রামে সাফল্যলাভ করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি অখণ্ড মনোযোগসহকারে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। প্রথমাবধিই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনলালসা ও রচনা দক্ষতালাভস্পৃহা বিশেষ বলবতী ছিল। এবার গৃহের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে মুক্ত জগতে জগতের সংঘর্ষে আসিয়া নানা ঘটনা ও নানা পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন। ধ্যানযোগীর পক্ষে আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া কেবল পুস্তকপাঠে যে জ্ঞান হয়, কর্ম্মযোগীর পক্ষে বিপুল জনতাসংঘর্ষে সে জ্ঞান সহজপ্রাপ্য। এবার ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন, সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁহার রচনা বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

নিউ-ঘর্লিন্স হইতে তিনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, সেগুলি সাদরে গৃহীত হওয়াতে, তিনি সংবাদপত্রসেবাতেই নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি "ওয়াশিংটন-পোষ্ট" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তখন কুমারী ডন্‌কানের বয়স বিংশতিবৎসরমাত্র। এই অল্প বয়সে সম্পাদকের সহকারিরূপে তিনি পুস্তকের সমালোচনা করিতেন, এবং কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধরচনাও করিতেন। সময় সময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরচনার ভারও তাঁহাকে লইতে হইত। ওয়াশিংটন হইতে টরণ্টোয় গমন করিয়া তিনি "টরণ্টো গ্লোবে"র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি প্রথিতকীর্ত্তি অধ্যাপক গল্ডুইন স্মিথের মুখপত্র "টরণ্টো উইক্‌লি" নামক সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক তাঁহাকে রচনাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম হইতেই তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, এই জন্য কিছু দিন পরে তিনি "মন্ট্রিয়েল ষ্টার" পত্রের সহকারিসম্পাদকরূপে তথায় গমন করেন। তখন "ক্যানেডিয়ান প্যাসেফিক রেলওয়ে লাইন" খোলা হইয়াছে। ব্রিটিশ বাষ্পীয়পোতে ভূপ্রদক্ষিণাভিলাষে তিনি ও আর একজন মহিলা দেশভ্রমণে বাহির হন। শীতকালের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন। এখানেই তাঁহার সহিত মিষ্টার হেভেরার্ড কোট্‌সের সাক্ষাৎ হয়। মিষ্টার কোট্‌স্ তখন ভারতগভর্মেণ্টের বিজ্ঞানবিভাগে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া পরিণয়পাশে বদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ভ্রমণ।

যে আমেরিকার সংবাদপত্রে যে সকল পত্র লিখিবার কথা ছিল, লেখিকা তাঁহার ভ্রমণাভিজ্ঞতা উপন্যাসে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ;—তাহার ফল তাঁহার A Social Departure গ্রন্থ। তিনি পুস্তক "লেডিস্ পিক্‌টোরিয়াল্" পত্রে প্রকাশের প্রস্তাব করিলে, ক সাদরে সে পুস্তক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। সম্পাদক যে, এই মনোরম ভ্রমণকাহিনীপূর্ণ উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত কর অনুরোধেই লেখিকা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আমেরিকান সহচরী রূপে বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলেই, র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা লেখিকার একখানি অতি সুখপাঠ্য চত হইয়া থাকে।

লে তিনি যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অবলম্বন erican Girl in London রচনা করেন। অনেকের মতে, তাঁহার হার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কারণ, প্রথম গ্রন্থের রচনাকালে তাঁহার া প্রাপ্ত হয় নাই ; অধিকন্তু, বহু দিন সংবাদপত্রসেবাবলম্বনে ও সেই গ্রন্থ দপত্রের জন্য লিখিত হওয়ায়, পুস্তকের রচনা সংবাদপত্রেরই উপযোগিনী হইয়াছিল।

দুই বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত হইবার জন্য কুমারী ডন্‌কান কলিকাতায় ফিরিয়া সন। প্রথমে বঙ্গদেশে অবস্থানকালে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন The Simple Adventures of a Memsahib রচনা করেন।

Idler পত্রে তাঁহার Vernou's Aunt নামক গল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের হিসাবে ইহাই তাঁহার নিকৃষ্ট রচনা। ইহার পর সাময়িকপত্রে পুরস্কারলাভাশায় তিনি The Story of Sonny Sahib রচনা করেন। তিনি পুরস্কার পান নাই বটে,

কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি অত্যন্ত মনোরম। তাঁহার এক বৃদ্ধা আয়ার নিকটে তিনি সিপাহীবিদ্রোহের বিবিধ গল্প শুনিয়াছিলেন। ইংরাজের সেই ভীষণ দুর্দ্দশার সময় ইংরাজ শিশুদিগের হত্যার বর্ণনা করিতে করিতে আয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়াই এই পুস্তকরচনার কল্পনা লেখিকার মনে উদিত হয়।

A Daughter of To-day নামক পুস্তকই তাঁহার প্রকৃত উপন্যাস রচনার প্রথম উদ্যম। পাশ্চাত্য সভ্যতায় উন্নতা আধুনিক মহিলাদিগের আত্মগরিমার ভাব দেখানই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

কিছু দিন য়ুরোপে বাসের পর ভারতবর্ষে আসিয়া লেখিকা তাঁহার His Honour and a Lady রচনা করেন। কলিকাতার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের জীবনকাহিনীর বর্ণনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই পুস্তক পাঠ করিয়ে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বার য়ুরোপের অভিজ্ঞতার ফলে লেখিকা তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের ভাষা তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোট্‌স দম্পতী আর ভারতবর্ষে আসিবেন না স্থির করিয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই লণ্ডনে অবস্থানকালে মিষ্টর কোট্‌স্ কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র "ডেলি নিউসের" সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। পূর্ব্বে মিষ্টার কোট্‌স্ ভারত গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু সংবাদপত্রসেবাই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। এই অনুরোধ পাইয়া সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিবা বিদুষী পত্নী সহ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। দুই বৎসর কাল "ডেলিনিউস্" সম্পাদন করিয়া, কলিকাতায় গ্রীষ্মকাল এবং সম্পাদকের কর্ম্মভারও গুরুতর বলিয়া, সম্পাদক-পদ ত্যাগ রূপে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাজধানী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চিরশৈত্যময়ী সিমলায় গমন করেন। এখানে গিয়া প্রথম নবপ্রকাশিত উপন্যাসের অধিকাংশ রচনা করেন।

অন্যান্য কথা।

শ্রীমতী কোট্‌স অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়া ও তন্বী। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল চক্ষু ধূসর। তাঁহার সরস মনোভাব যেন সর্ব্বদাই তাঁহার হয়। বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অবধান নাই। পুস্তকরচনাতেই প্রত্যহই কিছু কিছু রচনা করেন—গড়ে প্রতি দিন ৩০০ হইতে ৪০০ তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া রচনা করেন বলিয়া তাঁহাকে আর করিতে হয় না।

কলিকাতায় ও সিমলায় ইংরাজ-সমাজের প্রায় সকল উৎসবেই কো করিয়া থাকেন। শ্রীমতী কোট্‌স্ অশ্বারোহণ, দ্বিচক্র-রথচালন প্রভৃতি নান

ইতিহাস।

জিঞ্জী।

বিগত মাসের "মাদ্রাজ রিবিউ" পত্রে মাননীয় জষ্টিস্ রাওবাহাদুর মহাদেব রানাডে মহোদয় মহারাষ্ট্র জাতির স্বরাজ্যলাভচেষ্টা সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট চিন্তা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। রাও বাহাদুরের লিপিকৌশল ও প্রগাঢ় ইতিহাসজ্ঞান এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

শিবাজীর অকাল মৃত্যুর পর, মহারাষ্ট্র রাজ্যে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে অনেকে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন না। শিবাজীর জীবদ্দশায় —যখন তিনি মহারাজ জয়সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও পরে দিল্লী গিয়া সম্রাট্ অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, তখনই এইরূপ একটি বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও সৌভাগ্যের বলে তাহা প্রতিহত করিয়াছিলেন ও অবশেষে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট তাঁহাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিবাজী বুঝিয়াছিলেন, অওরঙ্গজেবের এই সন্ধি কেবল বলসংগ্রহ ও আক্রমণের সুযোগানুসন্ধানের অবসরমাত্র। সুবিধা পাইলেই সম্রাট তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। এই অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়নির্দ্ধারণে শিবাজীর জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় গৃহবিবাদ হইতে নিরস্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ও মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সন্ধি দ্বারা উক্ত নরপতিদ্বয়ের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। কারণ মোগলসেনা যখন উক্ত রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করিয়া, তখন তাঁহারা শিবাজীর সাহায্যবলে আত্মরক্ষা ও শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহারা শিবাজীকে কর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু শিবাজী ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বসংস্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ পরাপাতের আশঙ্কায়, দাক্ষিণাত্যে কাবেরী উপত্যকায় অসময়ে আশ্রয়গ্রহণের জন্য "বঞ্চয় ও বঙ্কুতা" দ্বারা একটি নিরাপদ স্থান প্রস্তুত করিলেন। সহ্যাদ্রি, ঘাট ও অন্যান্য গিরিমালার শিখরস্থ পার্ব্বত্যদুর্গগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া, তাহাতে রীতিমত সৈন্যসন্নিবেশ ও খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানাদি করিয়া রাখিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—জয়লক্ষ্মী সকল সময়ে যাঁহাদের অধিগামিনী ছিলেন—স্বাধীনতাপ্রণোদিত সেই সৈন্যদল তাঁহার বিশেষ সহায় ছিল। কিন্তু হায়! তাঁহার অকালমৃত্যু এই বিপুল আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপন, অথবা পরবর্ত্তী রাজার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বাধাবিমুক্ত প্রবল জলস্রোতের ন্যায় মোগল আক্রমণে তাঁহার যাবজ্জীবন চেষ্টায় সংস্থাপিত মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী (শম্ভুজী) তাঁহার প্রত্যেক আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করেন। পরে মোগল-সৈন্যদল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শিবাজী তাঁহাকে পন্হালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর, রায়গড়-স্থিত মন্ত্রিসভা সাম্ভাজীকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্ত্রণা করেন। কিন্তু তাঁহারা কোনও কোনও সেনানায়ককে এই ষড়যন্ত্রভুক্ত করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি হাম্বিররাও মোহিতে এর কিছুই জানিতেন না। সুতরাং ইহা বিফল হইয়াছিল। তাঁহার সহায়তায় সাম্ভাজী পন্হালা হইতে পলায়ন করেন, এবং মন্ত্রিদলকে পরাভূত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি যে রাজ্যশাসনের বিশেষ অনুপযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তরকালীন কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বিমাতাকে অনশনে হত্যা করেন। তাঁহার হস্তে অনেক পুরাতন মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

তিনি যত দিন রাজা ছিলেন, তত দিন এইরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

সাম্ভাজী স্বভাবতঃ বীরপুরুষ ছিলেন, এবং এক সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, তিনি এই সকল নিষ্ঠুরতাসত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাক্রমের শৌর্য্যখ্যাতি অটুট রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। অতিরিক্ত মদ্যপানে ও নীচ আমোদ প্রমোদে দিন দিন তাঁহার মানসিক বল ও সাহসের ক্ষয় হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি প্রিয়পরিচর কলুশার পরামর্শে দৈত্যপূজা ও যাদুবিদ্যার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যের অষ্টপ্রধানেরা (সচিববেরা) স্বীয় পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজপালনের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সাম্ভাজী, শিবাজীর রাজকীয় অথবা সামরিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেন না। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। সৈন্য সকল নিয়মিতরূপে বেতন পাইত না। পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অযত্নে জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। রাজস্বের আদায়ের ভার প্রকাশ্য নিলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। ঠিক এই সময়ে সম্রাট অওরঙ্গজেব কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ হইতে সংগৃহীত অগণ্য সৈন্যদল লইয়া "পার্ব্বত্যমূষিকের" অত্যাচারদমনে আগমন করিলেন।

এই সময়ে অওরঙ্গজেবের এক পুত্র পিতার সহিত বিরোধ করিয়া সাম্ভাজীর নিকট আশ্রয়লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাম্ভাজী তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। ইহাতে সম্রাটের সহিত সন্ধি করিবার একটি সুন্দর সুযোগ নষ্ট হইয়াছিল। পুরাতন মন্ত্রীরা তাঁহার উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শত্রুদের অনায়াসগতি রুদ্ধ করিবার কোনও আয়োজনই করা হইল না।

অওরঙ্গজেবের সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের তিন বৎসরের মধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিল। পরে অসহায় অবস্থায় সাম্ভাজীকে অনায়াসে ধৃত করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইহার পর মহারাষ্ট্র রাজ্যের সমতলাংশ মোগলসৈন্যে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। গিরি-দুর্গগুলিতে রীতিমত সৈন্যনিবেশ অথবা আত্মরক্ষার কোনও আয়োজন না থাকাতে, সেগুলি শীঘ্রই শত্রুগণের অধিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে রায়গড়ও অধিকৃত হইল। সাম্ভাজীর স্ত্রী পুত্র ধৃত হইয়া মোগল শিবিরে নীত হইলেন।

এইরূপে দাক্ষিণাত্যে আগমনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে অওরঙ্গজেবের চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল। তিনি নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। বোধ হইল, শিবাজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ষাট বৎসর ধরিয়া শিবাজী ও সাম্ভাজী যে প্লাবন প্রতিহত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিল ও ভবিষ্যতে বাধা দিবার কোন চিহ্ন রহিল না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ এখন দূরে শত্রুনগরে বন্দীকৃত। সাম্ভাজীর শিশু পুত্র সাহও তদ্রূপ অবস্থায় মোগল-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

এখন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভাগ্যনেমির নিম্নস্থানে অবস্থান করিতেছিল। তাহার পুনরুত্থানের কোনও আশা ছিল না। কিন্তু এই বিষম ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতেই মহারাষ্ট্র ভাগ্যরবি সগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শিবাজীর অধীনে শিক্ষিত এক দল স্বদেশপ্রেমিক সর্ব্বান্তোভাবে সাহায্যহীন ও অর্থশূন্য হইয়াও, স্বদেশকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া, অওরঙ্গজেবের বিজয়িনী চমূকে হিন্দুস্থানে পুনঃপ্রেরণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম বন্দিভাবে রায়গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তিনি

তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইঁহারের দলপতি হন। তখন তাঁহার বয়স বিংশতিবৎসরমাত্র। কিন্তু তিনি শিবাজীর শৌর্য্য ও সামরিক বুদ্ধি, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বভাবের মাধুর্য্য ও স্বাতন্ত্র্যানুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বকার্য্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

সাম্ভাজীর শিশু পুত্র শাহু তখন প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রের রাজা। কিন্তু তিনি তখন মোগল-দিগের নিকট বন্দী। সুতরাং রাজারাম রাজপ্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা এইখানে রাজারামের বিশিষ্ট অনুচর ও সহকারিগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব:—

(১) প্রধান মন্ত্রী প্রহ্লাদ নীরাজী—ইনি শিবাজীর মন্ত্রী ন্যায়াধীশ (Chief Justice) নীরাজী রাওজীর পুত্র। সাম্ভাজীর রাজত্বকালে প্রহ্লাদ নীরাজী পদচ্যুত হইয়া সামরিক ঘটনার একজন নিঃস্বার্থ দর্শকমাত্র ছিলেন। তখন সমস্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক ছিল না। মহারাষ্ট্র ইতিহাসলেখক মিঃ গ্রাণ্ট ডেফ্ সহজে ব্রাহ্মণ রাজপুরুষদিগের প্রশংসা করিতে চাহেন না; কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত ইঁহাকে নিঃস্বার্থপর ও অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রহ্লাদ নীরাজী স্বীয় আরব্ধ কার্য্যের শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই দেশের অনেকাংশ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সমূলে বিতাড়িত করা তখন কেবল সময়-সাপেক্ষ ছিল।

(২) হনুমন্ত রাও—ইঁহার পিতা সাহাজীর অধীনে একজন "কারকুন" ছিলেন। ইনি ধীমচেতা ও নিঃস্বার্থপর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। ইতিপূর্ব্বে রায়গড়ে অবস্থানকালে সাম্ভাজীকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা বিফল হইয়াছিল। দেশের এই বিপদের সময় তিনি রাজারামের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রহ্লাদ নীরাজীর সহিত একমত হইয়া তাঞ্জোর "জিঞ্জি" নামক দুর্গ স্বীয় দলস্থ লোকদিগের আশ্রয়স্থানরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।

(৩) প্রথম পেশোয়া মোরোপন্ত পিঙ্গলের পুত্র নীলো মোরেশ্বর "জিঞ্জি" দুর্গের রক্ষক ও সামরিক আয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে দুর্গসংস্কার ও দুর্গ-প্রাকারের আবশ্যকমত নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার আরম্ভ করিলেন।

(৪) সেনাপতি রামচন্দ্রপন্ত অমাত্য—ইনি কোল্হাপুরে বাসস্থিত বর্ত্তমান পন্ত অমাত্য-পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। রামচন্দ্রের পিতা অন্নাজী সোনদেব শিবাজীর প্রধান অমাত্য ও সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে এত দূর বিশ্বাস করিতেন যে, স্বীয় অনুপ-স্থিতিকালে তাঁহাকে যথেচ্ছ কার্য্যনির্ব্বাহের ক্ষমতা দিতেন। এই যুদ্ধের সময় ইনি রাজারাম ও অন্যান্য দলপতিগণের স্ত্রীপুত্রের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। ইনি লোকতঃ "বিদ্রোহি"-দলের অধিনেতা হইয়াছিলেন।

(৫) শঙ্করজী মল্হার—ইনি সাম্ভাজীর একজন সচিব ছিলেন। ইনি প্রথমে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বারাণসীধামে প্রস্থান করেন। সাহু রাজা হইবার পর দাক্ষিণাত্যের সৈন্যদ রাজপদের সহিত সম্মিলিত করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(৬) পরশুরাম ত্র্যম্বক—ইনি কিছুদিন "কুলকর্ণী" ছিলেন ও সেতারাবিভাগস্থিত ঔন্ধের পন্ত প্রতিনিধিপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ।

(৭) শঙ্করজী নারায়ণ—ইনি ভোর প্রদেশের পন্ত সচিবপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। উপরি-

লখিত দুই জন সেনাপতি আমন্ত্রণ পক্ষের প্রধান সহকারী ছিলেন। ইঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন।

(৮ ও ৯) ধনাজী যাদব ও সান্তাজী ঘোরপাদে—দায়িত্বজনক কার্য্য সকল ইঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। প্রথমে ইঁহারা সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ১৬৭০ অব্দে গনিমি হলেন নিফটে যে যুদ্ধ, প্রথমে সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শেষে জয়লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি হইয়া উঠেন। ত্রয়োদশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরাক্রান্ত মোগলদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা রাজারাম প্রভৃতির সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহাদের ভাণ্ডার অর্থশূন্য। কিন্তু তাহাতে ভগ্নমনোরথ না হইয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠন দ্বারা সৈন্যদিগের বেতন, আরোহণের অশ্ব, অস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে দেশময় বড় অত্যাচার হইতে লাগিল। ইঁহাদের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মোগলসেনা ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। এইরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই মোগলসৈনা দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র সেনা ক্রমে সাহস পাইয়া গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও বেরার আক্রমণ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময়ে সান্তাজী গুপ্তশত্রুর চক্রান্তে নিহত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার তিন ভ্রাতা অতি দক্ষতার সহিত সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা গুট ও সুনু নামক স্থানে ক্ষুদ্ররাজত্বস্থাপনে সফল হইয়াছিলেন। সাহুর রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত ধনাজী জীবিত ছিলেন।

অন্যান্য মহারাষ্ট্র দলপতিদিগের মধ্যে খান্দেরাও দাবাদের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা শিবাজীর সময়ে "তেলিগাঁওয়া"র "পাটিল" ছিলেন। তিনিও প্রথমে জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে, বিশেষতঃ গুজরাট ও খান্দেশ প্রদেশে, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। "খাণ্ডে" ও "দেওয়ান"এর পওয়ার-পরিবারের আদি-পুরুষ তাঁহার একজন সহযোগী ছিলেন। ইনি বহু দিন জীবিত ছিলেন। সাহুর রাজা হইবার পর পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ চৌথের সনন্দগ্রহণের জন্য যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, ইনি তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা স্ব স্ব অনুচরবর্গকে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করেন। এইরূপে পরস্পরী ভোঁসলে গওবল ও বেরারপ্রদেশে, নিম্বলকার "গঙ্গাধাদি" (?), দাবাদে গুজরাট ও ও খান্দেশ প্রদেশের চৌথ আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। অন্যান্য সেনানায়কেরা কর্ণাট, অথবা মোগলাধিকারচ্যুত দেশে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"প্রভু" দলপতিদিগের মধ্যে বান্দেল বল্লাল চীৎনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা শিবাজীর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে সাম্ভাজী কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন। বল্লাল প্রথমে রাজারামের সহিত জিঞ্জীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে বেল্লারীর মুসলমান শাসনকর্ত্তা ছদ্মবেশী পলায়নকারীদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, ইনি সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া, তথায় একাকী অবস্থান করেন। পরে মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হন। শত্রুপক্ষ অত্যন্ত নির্য্যাতন করিলেও, অশেষ যন্ত্রণা সত্ত্বেও নীয় প্রভুর আশ্রয়স্থান প্রকাশ করেন নাই। পরে তাঁহারই সহায়তাবলে রাজারাম জিঞ্জি দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পর, (কায়স্থ) দলপতিদিগের অপর এক জন, প্রয়াগজী, অওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সেতারা নগরী রক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

সহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সকল দলপতিগণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তখন রাজারাম জিঞ্জি দুর্গে আপন

দরবার স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। সেনানায়কেরা বিভিন্ন প্রদেশের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা পাইতেছিল। তাহাদের লুণ্ঠনে ও উৎপীড়নে দেশবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। অওরঙ্গজেব দেখিলেন, বিদ্রোহীদিগের এই নূতন আশ্রয়স্থান বিনষ্ট করিতে না পারিলে, তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি অচিরে জিঞ্জিদুর্গধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেনাপতি জুলফিকির খাঁ তাহাতে নিযোজিত হইলেন। ১৬৯১ অব্দে জিঞ্জির অবরোধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ১৬৯৮ অব্দে তিনি তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি দেশপতি পলায়ন করিয়াছেন।

এত করিবার জন্য সমস্ত মোগলসেনা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্য অংশে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণ নির্ব্বিঘ্নে বলসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন। ক্রমে মোগলসেনাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন। যিঞ্জি দুর্গ শত্রুপক্ষের যেরূপ যে দেশব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার ন্যায় তাহা অপসৃত হইল। ধনাজী যাদব ও সন্তাজী ঘোরপড়ে দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন-করিয়া জিঞ্জি পুনরধিকার করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজীর শিক্ষিত কতকগুলি সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। আর মোগলশিবির লুণ্ঠন করিয়াও যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রসেনা বিভিন্ন নায়কের অধীনে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছিল। ১৬৯২ অব্দে রামচন্দ্র পন্ত বিশালগড় হইতে সেতারায় উপস্থিত হইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপ্রেরিত সেনাদল বাঘগড়, সাঙ্গোলা ও মিরাজ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্র অধিকারের "সীমান্ত শিবিরে" পরিণত করিল। এই সকল বিভিন্ন দলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ১৬৯৩ অব্দে অওরঙ্গজেব ভীমা নদীর তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে আসাদ খান ও আপনার এক পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৬৯৪ অব্দে সন্তাজী ঘোরপড়ে মোগল সম্রাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দেশসমূহে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চিমে রামচন্দ্র পন্ত সসৈন্যে সোলাপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬৯৫ অব্দে সন্তাজী, পরসোজী ভোঁশলে ও নিম্বলকারকে বেরার দেশ লুণ্ঠন করিবার ভার দিয়া স্বয়ং কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া জিঞ্জি দুর্গের অবরোধকারী মোগলসেনা আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ধনাজী পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিয়া মোগলসেনাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। অবশেষে পরাজিত মোগলেরা সন্ধিপ্রার্থনা করাতে, একটি "সাময়িক সন্ধি" সংস্থাপিত হয়। ইহার সর্ত্তানুসারে মোগল সেনাপতি অবরোধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। অওরঙ্গজেব এই সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আসাদ খান ও স্বীয় পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া জুলফিকির খাঁর অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু জুলফিকির শীঘ্র দুর্গাবরোধ আরম্ভ করিতে পারিলেন না।

সন্তাজী উপস্থিত বিপদমুক্ত হইয়া বিজাপুরস্থ সম্রাট-শিবিরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে "দোদারি"র যুদ্ধে বিজাপুরের মোগলশাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁকে পরাভূত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। হিম্মত খাঁ নামক আর এক জন সেনাপতিও পরাভূত হইয়া বন্দী হয়েন।

১৬৯৭ অব্দে পুনর্ব্বার জিঞ্জি দুর্গের অবরোধ আরম্ভ হইল। কিন্তু রাজারাম ইতঃপূর্ব্বেই

তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৬৯৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে জিঞ্জিদুর্গ মোগল সেনার হস্তগত হয়।

জিঞ্জি হইতে পলায়নের পর রাজারাম সেতারায় রামচন্দ্র পন্তের সহিত মিলিত হন। অন্যান্য দলপতিরা ক্রমে তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সময়ে কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশে রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছিল। ধনাজী যাদব তথায় বিশেষ দক্ষতা সহকারে মরাঠাধিকারগুলি রক্ষা করিতেছিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দুর্গগুলি তাঁহার বিশেষ রক্ষিত। এ দিকে খান্দেজী আংরে বোম্বাই হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীর লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭০০ অব্দে অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্ব্বত্য দুর্গমালার অধিকার নিজে সৈনাপত্য গ্রহণ করেন ও জুলফিকির খাঁকে রাজারামের বিরুদ্ধে প্রে মোগল সম্রাট ক্রমে ক্রমে সমস্ত পার্ব্বত্যদুর্গগুলির অধিকার করিয়া অবশেষে রোধ করিলেন। বহুদিন ধরিয়া আত্মরক্ষার পর সেতারা শত্রুকবলগত হইল।

ঠিক এই সময়ে রাজারামের মৃত্যু হয়। শাহু তখনও মোগল শিবিরে বন্দী, সুতরাং রাজারামের দশমবর্ষীয় পুত্র রাজা হইলেন। রামচন্দ্র পন্ত পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেনাপতিগণ আহূত হইয়া ধনাজীর অধীনে মোগলসেনা সহিত অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র চৌথ ও সরদেশমুখী সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিন্তু গিরিদুর্গই মহারাষ্ট্র সেনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সেগুলি শত্রুকবলগত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সমতল রাজ্যাংশে ছড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদিগকে নূতন প্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যুগপৎ খান্দেশ বেরার ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন। এক দল নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মালবপ্রদেশে শিবির স্থাপন করিল।

অনন্তরে ১৭০৬ অব্দে, সেনাপতিগণের পরামর্শানুসারে, অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি এই ;—

১। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রদেশ আক্রমণ করিবেন না।

২। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ছয়টি সুবায় চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতে পারিবেন।

ইহা ব্যতীত সম্রাটের মতানুসারে শাহুর সহিত সিদ্ধিয়া ও যাদব নামক দুই মহারাষ্ট্রীয় মোগলসেনাপতির দুই কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অকলকোট, ইন্দাপুর, নেবাস ও বারামতী নামক চারিখানি জায়গীর প্রদত্ত হইবে, ইহাও স্থির হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। সুতরাং যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পিমাগা অধিকার করিয়া তথায় শিবাজী (রাজারামের পুত্র) ও তাঁহার মাতা তারাবাঈএর বাসস্থান স্থির করিল। পবনগড়, সিংহগড় ও রায়গড় শীঘ্রই পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ১৭০৭ অব্দে ধনাজী পুণা চাকন অধিকার করেন। ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করা দুঃসাধ্য দেখিয়া অওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিবার উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সাতারার পুত্র শাহু মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতিদিগকে একখানি পত্র লেখেন। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব ও শাহুর এই পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এখন দশায় অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র যুদ্ধের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তখন তাঁহার বিপুল সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজকোষ অর্থশূন্য। বিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে মোগল সম্রাটের অজেয় গৌরবখ্যাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিজে অত্যল্পমাত্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পটমণ্ডপে কালক্ষেপ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে ভীষণ অনুতাপ ও হতাশার উদয় হইল। অবশেষে তিনি আহমদনগরে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জুলফিকির খাঁ পরামর্শানুসারে আলিম শাহকে মুক্ত করেন। [illegible] রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে, আলিম শাহ তাঁহাকে স্বরাজ্য—যাহা তাঁহার [illegible] বিজাপুর রাজ্য হইতে অধিকৃত হইয়াছিল—ভীমা ও নর্ম্মদা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী [illegible] করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

[illegible] সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশে রাজরূপে স্বীকৃত হইয়া ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সেতারা [illegible] তিষ্ঠিত হয়েন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছয়টি সুবায় পাঁচটি চৌথ ও [illegible] ক্ষমতা স্বীকার করেন, এবং পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বাজাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া দিল্লী হইতে স্বরাজ্যপ্রদেশ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের রীতিমত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে কুড়ি বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে বোধ হয়, এই কয় বৎসরের ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ। শিবাজীকে কখনও সমগ্র মোগলসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। অথচ [illegible] যখন মহারাজ জয়সিংহের নিকট সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন, তখন তাঁহাকে [illegible] আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র দলপতিগণের এই দীর্ঘব্যাপী যুদ্ধে অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে প্রথমে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহাদের অর্থবল ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে একলেই প্রথমে এক এক জন ক্ষুদ্র সর্দ্দারমাত্র ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত ও একমত হইয়া পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহার বীর্য্য ও প্রতিভার দ্বারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাদের উপর এক মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছিল; কিন্তু এই সকল সেনানায়কদিগের যে সমস্ত কিছু ছিল না। তাঁহারা একমাত্র অধ্যবসায়বলে মোগল-বিক্রমে পরাজিত ও ভীত দেশবাসিগণের স্বাধীনতার জন্য অবিচলিত চিত্তে সংগ্রাম করিতে ও প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সাম্ভাজীর নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খল রাজপ্রণালী দ্বারা দক্ষ পুরাতন কর্ম্মচারিগণ নিহত বা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান বল পার্ব্বত্যদুর্গাশ্রয়। সেগুলিও তখন অব্যবস্থায় জীর্ণ হইতেছিল; ক্রমে তাঁহাদের রাজা নিহত হইলে, এক জন অপরিণতবয়স্ক যুবা তাঁহাদের দলপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি দক্ষ, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রভুভক্ত ব্যক্তি এই দলভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রমেই মহারাষ্ট্র দেশে পুনরায় স্বাধীনতা সূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। "রাজটীকা" গল্পটি সুন্দর। ইহা আদ্যোপান্ত উজ্জ্বল বিদ্রূপরাগে রঞ্জিত। "মদনভস্মের পূর্ব্বে" ও "মদনভস্মের পর" দুইটি খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পর যোগসম্বদ্ধ। এই কবিতাযুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরস্পরমধুর। বিশেষতঃ "মদনভস্মের পর" [illegible] কবিতাটির রচনাকৌশল ও শব্দযোজনানৈপুণ্য অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। কবিতা দেবীর মন্দিরগঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ওদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধ করি অনতিক্রমণীয়। [illegible] সৃষ্টির মোহে একান্ত মুগ্ধ হইলে অন্য দিকে কবির দৃষ্টি থাকে না। "[illegible] প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" সুচিন্তিত ও সুরচিত প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের এই চরিত্র-চিত্রে শাস্ত্রী মহ[illegible] চিন্তাপ্রবণতা ও বিশ্লেষণশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ [illegible] "হীরার মূল্য" একটি সুন্দর ক্ষুদ্র গল্প। সুনিপুণ লেখক অতিসাবধানে অথচ অ[illegible] রহস্যরক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগরিত রাখিয়াছেন। তাঁহার শর পাঠককে অনবরত বিস্ময়-চমকে চমকিত করিয়া উপসংহারে যখন শিল্পবমুক্ত বিহঙ্গিনী ন্যায় গল্প-রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন তরলার মিলনানন্দে পাঠকের চিত্তও অ[illegible] বেদনাবিধুর ও চঞ্চল হইয়া উঠে। অল্প পরিসরের মধ্যে এই গল্পে দক্ষিণ হয়দরা[illegible] বিল[illegible] লীলাচঞ্চল ওমরাহ-সমাজের ছবিখানির যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন মনোরম, তেমন [illegible] অভিনব।

মুকুল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। মুকুলের পূজার পরিচ্ছদ যেমন উজ্জ্বল, তেমনই সুন্দর। "রামতনু লাহিড়ী" প্রবন্ধটি যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই। "মুকুল" সকল সম্প্রদায়ের বালকবালিকার চিরসহচর হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। নীতিধর্ম্মের সাধারণ মূলসূত্র সার্ব্বজনীন, তাহাতে সম্প্রদায়ভেদে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। "মুকুল" সেই বিস্তৃত উ[illegible] ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই ভাল হয়। সকল বালক থিয়োডোর পার্কার নহে; তাই মনে হয়, উ[illegible] বিবেকবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক মতগঠনের ভার গুরুজনের হস্তে ন্যস্ত রাখিলে [illegible] "করুণার জয়" গল্পটি সুন্দর। "গাছের আহার" নামক বৈজ্ঞানিক [illegible] লেখকের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তাঁহার বলিবার প্রণালী [illegible] যে কয়টি গল্প বলিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে। [illegible] কুলের প্রাণি [illegible] শিশুপাঠ্য সাহিত্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য [illegible]। এই কবিতাটি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে; আমরা [illegible] শিশুর মুখে "বাহবা"র অর্দ্ধ-আধ ধ্বনি শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা রচনার আর কি সাফল্য বা পুরস্কার হইতে পারে!

"মজার মুলুক" একটি রহস্যপূর্ণ সচিত্র কবিতা। কবিতাটি বালকবালিকাদের উপযোগী ও সুন্দর হইয়াছে।

খৃষ্টি ছিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করা যে যারপরনাই কষ্টকর, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যাহাকে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করি, সেরূপ ভাবের কোনও প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতের তাৎকালিক যে কোনও তত্ত্বই নির্ণয় করিতে হইলে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। রাশি রাশি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার করা বড়ই দুষ্কর। তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আবার সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পরের মত এত বিভিন্ন যে, তাহাদের সাহায্য লইলেও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক স্থলে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অদম্য অধ্যবসায়ে ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা দের পক্ষে অপরিসীম আনন্দের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের মুদ্রা-আবিষ্কার ও তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার দ্বারা এ দেশে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিয়া, মুদ্রা, তাম্রফলক প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বারা যে সকল নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকেও বহুলপরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তগুলিই যে অবাধ্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত, তাহা বলা যাইতে পারে না। এই সকল আনুমানিক প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি লইয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। যত দিন হইতে ইতিহাস-রচনায় সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত; ইতিহাসেতর গ্রন্থের ত কথাই নাই। এমন কি, দুই শত বা এক শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতি-

হাসিক তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেও অনেক স্থানে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয় করা যে অতীব দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের মত যদি কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণে যে বিশেষ দোষগ্রহণ করিবেন না, অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস আমরা করিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেইরূপ দুই একটি মতপার্থক্যেরই উল্লেখ করিব।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে, অব্দ বা সময়-নির্দ্ধারণ একটি প্রধান বিষয়। একটি কথা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও সকলে একমত নহেন। এই অব্দনির্দ্ধারণেও তাঁহাদের যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। তবে এই অব্দ-নির্ণয়ে তাঁহারা সকলেই একটিমাত্র মূল অবলম্বন করিয়া থাকেন। মূলসূত্র এক হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে। উক্ত মূলসূত্রটি আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়। গ্রীক্ ইতিহাসের নির্দ্দেশানুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করেন। এই বৈদেশিক সাক্ষ্য যে এক প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উক্ত বৈদেশিক সাক্ষ্য হইতে ইহা না যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীক বিজয় সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রত্ন-বিদ্‌গণ অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডারের সময় যে চন্দ্র-গুপ্তের উল্লেখ আছে, তিনি মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। এ বিষয়ে আমাদের মত স্বতন্ত্র। যাহা হউক, এই একমাত্র নির্ণীত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা গ্রীক-বিজয়ের পূর্ব্ব পশ্চাৎ সমস্ত বিষয়ের সময় স্থির করিতে চেষ্টা করেন; তাহাতে অনেক স্থলে তাঁহাদের যে সিদ্ধান্তবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।—"ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিবৃত্তিক কালনির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মূল একটিমাত্র কথা। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজদূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে, এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা জানা হইয়াছে। এই একমাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদায় ঐতিহাসিক বিবরণের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গণ্ডগোলময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১১২-১১৩ পৃঃ) কেবল এক গ্রীকবিজয়ের উপর নির্ভর করিলে যে সকল ঘটনার সময়নির্দ্ধারণ করা যায় না, ইহা প্রকৃত কথা। গ্রীকবিজয় কেহই অস্বীকার করেন না, আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকি। তবে তাহা যে চন্দ্রগুপ্তের সময় ঘটিয়াছিল, ইহার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং কাহার সময়ে প্রকৃত গ্রীকবিজয় ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণিত করিতে না পারিলে, কেবল গ্রীক-বিজয়ের দ্বারা অন্যান্য সময়ের নিরূপণ কিরূপে হইতে পারে? এ সকল বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্দ্ধারণ আমাদিগের একটি প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত সময়ের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত উদ্ধৃত না করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ, রমেশ বাবু তাঁহাদের সকলের প্রতিধ্বনি; তাঁহার মত জানিতে পারিলে অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদেরই মত জানা হইবে। এই জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থলে রমেশ বাবুর মতেরই উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। মগধের প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল হইতে বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত ৩৫ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের ২০ বৎসর রাজত্ব ধরিলে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উক্ত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পুনশ্চ, মুদ্রাপরিদর্শনে স্থির হইয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজা কনিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র অভিমন্যু উক্ত শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক, অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণীকার বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত ৫২ জন রাজা ১২৬৬ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী স্থির হইতেছে। কিন্তু তিনি ইহার পর বলিতেছেন যে, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর প্রকৃত

সময় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের যে সময়, তাহাও ঐ এক গ্রীকবিজয় অবলম্বন করিয়া স্থির করা হইয়াছে। কনিষ্কের সময় মুদ্রাপরিদর্শনে আবিষ্কৃত, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ আনুমানিক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যুর সময় ১২৬৩ বৎসর হইলে, কনিষ্ক বা তৎপুত্র অভিমন্যুর সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হয় না। রাজতরঙ্গিণীকার সুস্পষ্টরূপে কুরুক্ষেত্রের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার একাংশের প্রমাণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে অপরাংশের প্রমাণই বা অকারণে পরিত্যাগ করিব কেন? আমরা স্বমতস্থাপনের সময় রাজতরঙ্গিণীর মত স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিব। রমেশ বাবুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, সময়নির্দ্ধারণের মূল সূত্র—Keynote সেই গ্রীকবিজয়; এক্ষণে সেই গ্রীকবিজয়ের রহস্যোদ্ভেদ হইলে, বোধ হয়, আর কোনও গোল থাকে না। আমরা পরে সে বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব। রমেশ বাবুর মতের সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের মতস্থাপনের সময়ে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইবে।

এক্ষণে আমরা আর একজন মহারথীর নিকট অগ্রসর হইতেছি। তিনি কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিধ্বনি নহেন, তাঁহার নিজের মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। এই কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ন্যায় গ্রীকবিজয় প্রভৃতি ব্যতীত নিজেরও কয়েকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যদিও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতের প্রচার আমাদের পক্ষে অতি-সাহসের কর্ম্ম, তথাপি আমাদের চিত্তে যেরূপ ধারণা হয়, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। তিনি আমাদের বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত, এবং দেশীয়গণ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কলির প্রথমে হইয়াছিল বলেন, এবং সেই সময়ে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই দুই মতের খণ্ডনের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে, কলির প্রথমে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ঠিক নহে। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে গোনর্দ্দ কাশ্মীরের রাজা হন। গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তাহা হইলে ২৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ

পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এক্ষণে কল্যাব্দ ৪৩২৯। বঙ্কিম বাবু রাজতরঙ্গিণীর এই খৃঃপূঃ ২৪০০ বৎসরের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মতপার্থক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কলির প্রথমেই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা যদিও এ কথা স্বীকার করি না বটে, তথাপি রাজতরঙ্গিণীকারের মতই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি, এবং ইহার সহিত বিষ্ণুপুরাণের যে বিশেষ পার্থক্য নাই, ইহাও আমাদের ধারণা। যাহা হউক, আপাততঃ বঙ্কিম বাবু কি বলিতেছেন, দেখা যাউক। তিনি প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন,—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ॥ ৩৩ ॥
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥

৪র্থ অংশ, ২৪ অ।

পরে ইহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন,—"সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্ব দিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" সুতরাং পরিক্ষিতের সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর হইলে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। 'তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ-শতাত্মকঃ' এই শ্লোকার্দ্ধের বঙ্কিম বাবুর কৃত 'তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল' এই অর্থ সমীচীন নহে। আমরা তাহা পরে দেখাইব। সুতরাং উক্তশ্লোকানুসারে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় স্থির হয় না। এ সমস্ত বিষয় পরে আলোচিত হইতেছে। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ৩৪ শ্লোক অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে হয়, এই গণনা ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিলে না। ৩৩ শ্লোক সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল বা Great Bear অথবা Ursa Major কতকগুলি স্থির তারা; মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা; স্থির তারার গতি নাই, তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে, ইংরাজীতে তাহাকে Precession of the Equinoxes বলে। হিন্দুমতে এই গতি ৫৪ বিকলা।

এক এক নক্ষত্রে ১৩৯ অংশ। এ হিসাবে কে
পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে, শত বৎস
রাশিচক্রের বাহিরে, মঘা রাশিচক্রে ; ইংলণ্ড যেম
পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকি
এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আমাদের

(১) সপ্তর্ষিমণ্ডল যে Great Bear বা U
কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন ; তাঁ
নক্ষত্রকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিতে চাহেন। শুনিয়া
এই মত। কৃত্তিকাকে সাধারণতঃ 'সাভেরে'
কারণে সপ্তর্ষির সহিত ইহার একতা স্থাপনের
সাধারণতঃ ছয়টি নক্ষত্রের অধিক দেখা যায় না।
কেই সপ্তর্ষি বিবেচনা করি। তবে Gre
কেহ কৃত্তিকা খাড়া করেন বলিয়া আমরা তাহার
সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, সে সম্ব
আমরা আপাততঃ দিতে সক্ষম নহি বটে, কি
নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না। কা
বিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক
অদ্যাপি বিচার করেন নাই। একমাত্র বেণ
কিছু আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার
দেশদর্শী যে, সে বিচারে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি ম
কেণ্টলী সাহেবের মত লইয়া সপ্তর্ষির গতি কিছুই
ঠিক নহে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, গর্গ
মিহির প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষি
নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কা
মধ্যে আছে, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে
বিষয় এক্ষণে আমাদের নিকট অজ্ঞাত, এইরূপ
বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থি
গুলি স্থির তারা ; সুতরাং যখন স্থির তারার গতি
নক্ষত্র কেমন করিয়া পরিভ্রমণ করিবে ? অতএ
মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। বঙ্কিম

না বলিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিম ঐরূপ আপত্তি যথার্থ হইলে তাঁহার আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া উচিত ছিল যে, সপ্তর্ষির অবস্থানই বা কোথায়, এবং মঘারই বা অব কোথায়, এবং সেই দুই অবস্থান চিরকাল একই থাকিবে, কখনও তাহ পরিবর্ত্তন হইবে না। বঙ্কিম বাবু না বলিলেও আমরা বলিয়া দিতেছি যে, যে হিসাবে দেশীয় গ্রন্থকারগণ সপ্তর্ষির মঘা নক্ষত্রে অবস্থানের কথা বলেন, উভয়ে স্থির তারা হইলে সে হিসাবে সপ্তর্ষির অবস্থান আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঘা বা সিংহ রাশির সমসূত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিতি করিতেছে। যখন সিংহ রাশির প্রকাশ, তখনই সপ্তর্ষির প্রকাশ, তাহার অস্তে সপ্তর্ষিরও অস্ত। অতএব যখন উভয়ে স্থির তারা হইলে চিরকাল সপ্তর্ষি মঘায় আছে, এরূপ বুঝা যাইতেছে। যে সকল হিন্দু জ্যোতিষী দৃগ্‌গণিতের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা কি এই সামান্য বিষয়টি লক্ষ্য করেন নাই যে, মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি চিরকালই আছেন? তবে বুঝিতে হইবে যে, সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ও কোনওরূপ গণনা ছিল, যাহা এক্ষণে আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। রাশিচক্রের নক্ষত্র বলিয়া হিন্দুজ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারেই স্থির তারা বলিয়া বুঝেন, এমন নহে। সচল রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগকে তাঁহারা এক একটি নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যায়, তাহারাও সেই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে স্থির তারা বলিয়া যে তাঁহারা স্বীকার করেন, এরূপ বলা যায় না। তবে সে হিসাবে গণনা করিতে হইলে বিষুবের গতির সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ১০০ বৎসর সপ্তর্ষির গতি নির্ণয় করা যে কঠিন হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর অভিমত আমরা অস্বীকার করি না। তবে রাশিচক্রের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কিরূপভাবে সপ্তর্ষির সহিত রাশিচক্রস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের সম্বন্ধ হয়, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। ফলতঃ সপ্তর্ষির গতির সম্বন্ধে আমরাও স্পষ্ট করিয়া যখন কিছুই বলিতে পারি না, তখন সে বিষয় লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির গতি লইয়া যেরূপ ভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের গ্রন্থকারগণ

সপ্তর্ষির দ্বারাই বর্ষ গণনা করিতেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা অনেক উপায়ে বর্ষাদির গণনা করিতেন, সূক্ষ্মভাবে গণনা করিবার তাঁহাদের অন্যান্য অনেক উপায় ছিল। সপ্তর্ষির গণনা মোটামুটি গণনামাত্র। তরাং তাঁহারা যে কেবল সপ্তর্ষির গণনা দ্বারা শত বৎসর স্থির করিতেন, এরূপ নহে। বরঞ্চ অন্যান্য উপায়ে শত বৎসর স্থির করিয়া, তদ্দ্বারা সপ্তর্ষির এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রে গমন, এই একটি নাম প্রদান করিতেন, এরূপও বলা যাইতে পারে। এবটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে,—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥

অর্থাৎ, পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর।

তাহার পর লিখিতেছেন,—

তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম। ৩৪।

অর্থাৎ, পরিক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

ইহার পর লিখিতেছেন,—

প্রবাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। এই কয়টি শ্লোকের দ্বারা কি বুঝায়? প্রথমতঃ, পুরাণকার যে পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর বলিলেন, ইহা কি সপ্তর্ষির গতি অনুসারে গণনা করিয়া, না অন্য কোনও উপায়ে তাহা স্থির করিয়াছেন? অবশ্য ইহা অন্য কোনও উপায়েই স্থির করিয়াছেন। কারণ, সপ্তর্ষির গতির দ্বারা ১০১৫ এরূপ সূক্ষ্ম গণনা এখানে হইতে পারে না। কারণ, পরিক্ষিতের সময় মঘার কত অংশে সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং নন্দের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ার কত অংশে তাঁহাদের অবস্থান ছিল, ইহা না জানিলে, ১০১৫ পর্য্যন্ত গণনা করা যায় না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। আর যে সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রমাত্র, তাহারা কোন নক্ষত্রের কত অংশে আছে, দৃক্‌গণিতের দ্বারা তাহা স্থির করিয়া পরে বর্ষগণনা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ, বিষ্ণুপুরাণের বচন দ্বারা সপ্তর্ষির গতিগণনায় ১০১৫ বৎসর স্থির হয় না। ১০০০, ১১০০ ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু ১০১৫, ১০২০, এরূপ সূক্ষ্ম গণনা হয় না; কাজেই

সপ্তর্ষির গতি একটি মোটামুটি গণনা, এবং কেবল উহা দ্বারাই শত বৎসর নির্ণীত হইত না। সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরের একটি নামান্তরমাত্র। যদি শত বৎসরের ঐরূপ একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা কাল্পনিক হউক, বা প্রকৃত হউক, তাহাতে প্রকৃত সময়গণনার যে বিশেষ গোলযোগ হয়, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ ঐ সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত করিতেন না, ইহা ঠিক। অতএব বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির উপর আক্রমণ করিলেও প্রকৃত গণনার কিছুই ক্ষতি হয় না।

(২) তৎপরে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে হওয়ায় মঘানক্ষত্রে থাকা অসম্ভব; যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কিরূপে সপ্তর্ষিমণ্ডল এক এক নক্ষত্রে থাকে, পুরাণকার নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলে বঙ্কিম বাবুর কথার উত্তর হইবে। পুরাণকার লিখিতেছেন,—

সপ্তর্ষয়োঽপি যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।

স্বামী ইহার এইরূপ টীকা লিখিতেছেন,—"তত্র যৌ পূর্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ পুলহক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে তয়োস্তৎপূর্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষিণোত্তররেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বন্যতমনক্ষত্রং দৃশ্যতে, তেন তথৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ, পুলহ ও ক্রতুর মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখার সমদেশস্থিত যে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র থাকে, তাহা দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডল যুক্ত হয় বুঝায়। পুলহ ও ক্রতু সপ্তর্ষির সর্ব্ব পশ্চিমে। পুলহ ও ক্রতুর মধ্য হইতে দক্ষিণোত্তরে রেখা টানিয়া তাহাতে অবস্থিতি করা বুঝাইলে, রাশিচক্রের ভিতর বাহির লইয়া যে বড় একটা আসিয়া যায়, এমন বোধ হয় না। এই 'সমসূত্র' কথাটি বঙ্কিম বাবু নিজের অনুবাদেও দিয়াছেন, অথচ, 'ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের অবস্থানের ন্যায় সপ্তর্ষির মঘাতে অবস্থান কথাটি' কেন লিখিলেন, বলিতে পারি না।

(৩) বিষ্ণুপুরাণের ৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে,—

তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

বঙ্কিম বাবু ইহার অর্থ করিতেছেন, 'সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময়ে মঘা

নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত ব
যে সমীচীন নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উ
পদটি কলির বিশেষণ ; ইহার অর্থ এইরূ
বৎসর, সেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; কলি
মোট পরিমাণ যত, সেইটিই এইখানে বি
পরিমাণ দ্বাদশ শত দিব্য বৎসর, এখানে
য়াছে। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিতে
দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ……সন্ধ্যারূপম
র্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ।" ঐ শ্লোকের ভাগ
লিখিতেছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি বি
যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিঃ তদ
সুতরাং বঙ্কিম বাবুর কৃত অর্থ সমীচীন
ছেন, তাহা ঠিক হইলে, "কলির্দ্বাদশাব্দ
"কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ" এইরূপ পাঠ
পদটি কলির বিশেষণ হওয়ায়,যে কলির প
কলিই প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হ
হইয়াছিল, এরূপ অর্থ নহে। তাহা হইলে
যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের
ঠিক নহে।

ইহার পর বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণ ও ভ
দেখাইয়াছেন যে, পরিক্ষিত ও নন্দের ব
সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন।
ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।
আশ্রয় করিয়া ১০০ বৎসর নন্দবংশের রাজ
চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক। বঙ্কিম বাবুর
অব্দে ভারত আক্রমণ করেন, এবং খৃঃ পূঃ
৩১৫ এর সহিত নন্দবংশের ১০০, এবং নন্দ
৩১১৫ যোগ করিলে ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হয়, এ
এখানেও বঙ্কিম বাবুরেও সেই মৌর্য্য
বিভ্রম ঘটিয়াছিল, সেই মূলসূত্র অবলম্বন ক

আমরা পরে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব বলিয়া এক্ষণে উক্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম। যাহা হউক, বঙ্কিম বাবু খৃঃ পূঃ ১৪৩০ কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলেন।

উক্ত সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি "চন্দ্রার্কে যত্র সাক্ষিণৌ" বলিয়া জ্যোতিষের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তাহাকে অখণ্ডনীয় প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আমরা তাঁহার উক্ত প্রমাণের মর্ম্ম প্রদান করিয়া আমাদের মন্তব্যপ্রদানেরও চেষ্টা করিতেছি।

বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, বৎসরের যে দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হয়, তাহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার ৯০° অন্তর অয়নপরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর বলিতেছেন যে, মহাভারতে লিখিত আছে যে, ভীষ্ম উত্তরায়ণে মরিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পর মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন;—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।

তাহা হইলে, তখন মাঘমাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ ও তৎপূর্ব্ব দিনকে মকর-সংক্রান্তি বলিলেও, এখন ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, যখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত, এবং তখনই ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইত। এখনও ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এক্ষণে আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং ১লা মাঘেও পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরায়ণ হয় না। এক্ষণে ৭ই বা ৮ই পৌষ (২১ এ ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ক্রান্তিপাতবিন্দুর গতির জন্য অয়নপরিবর্ত্তন বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। এই অয়ন-চলনই Precession of the Equinoxes; হিন্দুদিগের মতে তাহা বৎসরে ৫৪ বিকলা; ইউরোপীয়দিগের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। বঙ্কিম বাবু ষ্টকওয়েলের ৫০·৪৩৮ বিকলা মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। বঙ্কিম বাবু বলেন, মহাভারতের সময়েও সৌরমাস প্রচলিত ছিল। সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, তাহা লিখিত নাই। মাঘের শেষে

হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'মাঘোঽ
না। ২৮এ মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে
রবির মোটামুটি গতি ৪৮ অংশ। কিন্তু রবির
হইতে ২৯এ মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট ৪৪°·৪ পাও
পৃঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায় ; ৪৮° পুরা লই
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোনও মতেই হইতে পা
হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া যায়, তাহাই
শেষে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ হই
চান্দ্রমাঘও কখনও সৌরচৈত্রে হইতে পারে না

বঙ্কিম বাবুর মতের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল।
প্রকাশিত হইতেছে।

(১) বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্লোকার্দ্ধ ল
কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বিচার ক
শ্লোকার্দ্ধে সমস্ত বুঝা যায় না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লে ভবিতুম

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিতেছেন,—"মা
চতুর্ভাগীকরণে সার্দ্ধসপ্ততিথের্ভাগত্বাৎ অষ্টম
বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগশেষো ভবিতুমর্হতীত্য
শুক্লষ্টমীর কথা, নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধার
এবং গ্রন্থান্তর হইতেই, "হেমন্তে প্রথমে মা
ভারতযুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। অর্জ্জুনেন হতে
ত্রয়োদশ্যাস্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।"
ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানের বচন উদ্ধৃত
করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা এ স্থলে অনেক
তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা হউক তিনি
সম্পূর্ণ শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে,
স্থিত। কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদে লিখিত
সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সম
ত্রিভাগশেষ কথাটি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই,

'পবিত্র' কথায় বোধ হয় যে, 'পবিত্র' সৌম্যেরই অনুবাদ। তাহা হইলে মাঘ চান্দ্র না হইয়া সৌরও হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে ত্রিভাগশেষ যোগ করিলে সৌর মাঘের কোন্ দিন ভীষ্ম বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়। বঙ্কিমবাবু উক্ত শ্লোকের মাঘ মাসকে সৌর কি চান্দ্র বলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কথাটি তাঁহার স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকের 'সৌম্য' ও 'ত্রিভাগশেষ' কথাটি লইয়া নানারূপ অর্থ হইতে পারে। 'সৌম্য' কথাটিতে চান্দ্র ও পবিত্র এই [illegible] হইতে পা[illegible]র 'ত্রিভাগশেষ' লইয়া শ্লোকটির ৪।৫ প্রকার [illegible] 'ত্রিভাগশেষ' কথাটির অর্থ দুই প্রকারে সম্প[illegible]ৎ তিন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক ভা[illegible]য়; এবং ত্রিভাগ শেষ, অবশেষ, অর্থাৎ [illegible]াছে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাহার [illegible]ং ত্রিভাগশেষকে মাসের বিশেষণ ধরিলে তদ্ধ[illegible] সৌম্যকে পবিত্র বলিলে, সৌর ও চান্দ্র দুই মা[illegible]ব্যবহৃত হইতে পারে। [illegible]বার ত্রিভাগশেষকে [illegible] হইতেও দুই অর্থ হয়। সুতরাং উক্ত শ্লোকটি [illegible], তখন বঙ্কিমবাবু কোন্ প্রকার অর্থের পক্ষ[illegible] উক্ত শ্লোক লইয়া কোন একটি সিদ্ধান্ত করিতে য[illegible]ঙ্কিম বাবুর ন্যায় সাধারণভাবে ধরিয়া লইলে একেব[illegible] নহে, তথাপি সমস্ত শ্লোকটির অর্থ তিনি কি বুঝেন[illegible] যে স্ফুটতর হয়, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কেহই আপত্তি[illegible]

(২) বঙ্কিম বাবু বলেন যে, এখন আর [illegible]ণ হয় না, কিন্তু ৭ই। ৮ই পৌষ হইয়া থাকে। এ কথা ঠিক [illegible]ও তিনি পরে বলিতেছেন যে, যে সময়ে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত, সে সময়ে আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। কিন্তু এ আশ্বিন সৌর কি চান্দ্র, তাহা বঙ্কিম বাবু বলেন নাই। কিন্তু আশ্বিন সৌরই হউক কি চান্দ্রই হউক, ১লা আশ্বিন বৎসরারম্ভ হইলে কোনরূপে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইতে পারে না। চান্দ্র আশ্বিন হইলে ১লা পৌষ উত্তরায়ণ হইবে, ১লা মাঘ হইবে না। ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষ, ১লা মাঘ নহে। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, বিষুবের অর্থাৎ বৎসরারম্ভের ১০° অন্তর অয়ন পরিবর্ত্তন হয়।

তাহা হইলে, ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষই হয়, ১লা মাঘ হয় না। তিনি আবার বলিতেছেন যে, ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরব্ধ হয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক নহে। যেমন সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে সেই সময় হইতে সৌর বৎসরের গণনা হয়, সেইরূপ চান্দ্রবৎসর গণনা করিতে হইলে চন্দ্রকেও অশ্বিনী নক্ষত্রে আসিতে হইবে। ফসলীও চান্দ্র বৎসর। চান্দ্রমাস পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হয়। সূর্য্য যেখানে থাকে, তাহার সমসপ্তমে [illegible] থাকিলে [illegible] হয় না। যে সময়ে চন্দ্র মেষ রাশির অ[illegible] সে সময় সূর্য্য তাহার সপ্তমে তুলা রাশির [illegible] হইতে বুঝা যায় যে, ১লা কার্ত্তিক হইতে [illegible] দাচ ১লা আশ্বিন নহে। প্রকৃত কথা এই [illegible] চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইবে। তাহা চা[illegible] মাসের দিনের পার্থক্য হইয়া থাকে। [illegible] রিয়া বলাই যাইতে পারে না। আর চান্দ্র ১লা [illegible] হইয়াছে। আশ্বিনকে সৌর মাস ধরিলে [illegible] সৌর বৎসরারম্ভের ২৭ পরে উত্তরায়ণ [illegible] আশ্বিন যদি সৌর হয়, তাহা হইলে, উ[illegible]াচ ১লা মাঘ নহে। সুতরাং ১লা আশ্বিনে [illegible] হউক বা চান্দ্রই হউক, ঠিক কোনমতে [illegible] না। ১লা আশ্বিনে, যৎকালে সৌরই হউক [illegible] রম্ভ হইত, (যদি কোন কালে হইয়া থাকে) অ[illegible] বলে তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়। সুতরাং কু[illegible] তাহার কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, এবং ১লা আশ্বিনে কো[illegible] বৎসরারম্ভ হইত, বঙ্কিম বাবু তাহা না বলায়, আমরা উক্ত বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না।

(৩) বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই। অবশ্য উক্ত শ্লোকের যেরূপ নানাবিধ অর্থ করা যায়, তাহাতে সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের প্রাণত্যাগ হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, "মাঘোঽয়ং" শ্লোকের সৌম্য কথাটি পবিত্র অর্থে ধরিয়া লইলে, তাহা সৌর ও চান্দ্র দুই মাসই হইতে পারে, এবং ত্রিভাগশেষের দুই অর্থের যে কোন অর্থ লইয়া সৌরমাঘের কোন

দিন, তাহাও স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং একেবারে লিখিত নাই, তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, সে সময়ে মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে শেষ দিন নহে; কারণ, তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি মাঘ মাসের ২৮এ উত্তরায়ণ হইয়াছিল ধরিয়া এখনকার প্রকৃত উত্তরায়ণদিন, অর্থাৎ ৭ই। ৮ই পৌষ হইতে ২৮ মাঘের ব্যবধান ৪৮ দিনে রবিস্ফুট ৪৪ অংশ ৪ কলা ধরিয়া অয়ন-চলন দ্বারা খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর স্থির করিয়াছেন; এবং উক্ত ৪৮ দিনে পূর্ণ ৪৮ অংশ ধরিয়াও ১৫৩০ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্ব্ব কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিতেছেন যে, সে সময়ে সৌরমাঘের কোন দিন উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই, অথচ তিনি ২৮এ মাঘ ধরিতেছেন। তাঁহার কথানুসারে ধরিতে গেলে, ১লা মাঘ হইতে ৩০ এ মাঘ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হওয়া সম্ভব, এরূপ বলাই উচিত; তাহা হইলে অয়ন-চলন দ্বারা ১লা মাঘ হইতে ৩০ মাঘ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টজন্মের ৩য়, ৪র্থ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিতে হয়। তাহাতে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক ব্যবধান হইবার সম্ভব। সেরূপ গণনা নিতান্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমবাবু ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিবার জন্য ২৮এ মাঘ ধরিয়াছেন। কিন্তু নিজেই বলিতেছেন যে, একেবারে শেষ দিন ধরা যাইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটা বলা হয় না। ২৯এ বা ৩০এ না ধরিয়া ২৮এ ধরিলে কি 'সমনুপ্রাপ্তঃ' প্রয়োগ রক্ষা হয়? 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, মাঘ মাসের কতক দিন গত হইয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া আসে নাই; বঙ্কিমবাবুও তাহাই বলেন। কিন্তু তাঁহার ২৮এর সহিত ২৯এ, ৩০এর বড় অধিক পার্থক্য নাই। যদিও বঙ্কিমবাবু উক্ত ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ ও ১৫৩ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একরূপ শেষ সময় বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বে আর হইতে পারে না, এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সময় কি, তাহা তাঁহার জ্যোতিষ-প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় নাই। হইতে পারে, তাহা খ্রীঃ ষষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল; তাহা বেণ্টলী স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত জ্যোতিষের প্রমাণ বলবৎ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। মাঘমাসের কতক দিন গত হইলে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, এ কথা ঠিক, এবং 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথায় একেবারে শেষ দিকেও নহে, ইহাও বুঝা যায়। তাহা

আবার সায়নমত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় মাত্র। তাহার পূর্ব্বকার সময় কিছুতেই নির্দ্ধারিত হয় না। কারণ, মধ্যে নিরয়ণ মত প্রচলিত থাকায়, চিরদিনই মকরসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হইত। এক্ষণে যেমন পঞ্জিকায় মকর-সংক্রান্তি বলিলে পৌষের শেষ বুঝিতে হয়, এবং তাহাকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বলে, অথচ প্রকৃত উত্তরায়ণ দেখিতে গেলে ৯।১০ই পৌষের নিকট আসিতে হয়, তখন উত্তরায়ণ বলিলে পৌষের শেষই বুঝাইত। নিরয়ণের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা উত্তরায়ণকে ৬৭ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপে পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়ন-চলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিলে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। সৌর চৈত্রের উত্তরায়ণ কাল ৫ হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে হয়। উক্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আর নাই। বঙ্কিমবাবু আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁহার যুক্তি-খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে যে কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তিনি [illegible]তিষের যে প্রমাণ দ্বারা কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, [illegible]র নিকট তত বলবৎ মনে না হওয়ায়, আমরা তৎসম্বন্ধে [illegible]ত্র বলিলাম। আপাততঃ আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে [illegible]নিরস্ত হইলাম। আগামী বারে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও শ্রীকবিজয় [illegible]প্রকাশ করিব।

[illegible]থ রায়।

ভানুমতী।

১

[illegible]যারা কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী প্রকৃত নৃমুণ্ড-মালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহারকারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। শ্মশানবাসিনীর পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃত মহাশ্মশান বুঝি আর কখনও সজ্জিত হয় নাই।

সমস্ত বঙ্গদেশ সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান! আনন্দ আলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা! তুই উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনা সম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিনশ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবের মত "বাবা!" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধনে যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা!" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন! সেই মুখে, সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ! অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল, বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা বলিয়া ডাকিল, "বাবা!" "কি মা!" বালিকা বলিল, "বাবা! আমি চলিলাম।" "কোথায় মা?" "জন্মে একখানি নৌকা লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।"

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"হায়! মা! অমিয় বাঁচিবে?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

। লক্ষ্মীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সতীবালা আবার
অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচা-
ী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম্ম শিক্ষা দিবার
সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

বাবা! সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা
নিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, আমি এ সমুদ্র
ই দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বিদ্যুৎবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণ-
মাথিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ
তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখি-
রা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া
ী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি
রিয়া, দু'হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে
াইতেছে। এ শক্তি ত মানবীর নহে! এ কি তবে সত্য
মলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া

পী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্ণে আদিনাথ
ীচ্ছশেশ্বরসান্নিহিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার
ীরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত ৺শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন।
পুরী গোস্বামী বা পুরী বাবাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত
রদাস দেহত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে,
তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে
ক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া
সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার
। যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া
ে বেদে বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও
ন্যাসিভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও ৺পুরী গোস্বামীর
ার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস
ছিল যে, তিনি তাহার মতরূপ-গুণ-বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন রমণীরত্নকে

দেখিবেই বড়া মোটা টাকা দিবেন। অতএব উত্তরে আনন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাত্রি করিতে করিতে 'রোণাদিয়া' যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু ক্রমে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে উপস্থিত একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই এক সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা আশার নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সে বিশাল পার্ব্বত্যপাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চা বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চ চূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অর্দ্ধ নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা
অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
দেখায় নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ণ-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহানীলা নীলাম্বুর।

উত্তরে ধবল সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গিত যেন চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গিয়া আদিনাথ পবিত্র শেখর।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর, সিন্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে প্রখরবাহু-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। স্থান, কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা—সম্মুখে মহাযোগী—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় পুরী গোস্বামী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল। সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি শূন্য যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে পৃথিবীতে সে আর আসিবে না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে। তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মেরও বিঘ্ন হইবে।

ভা। আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা আবার কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতন ধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই কুলাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ওই সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ, দর্শন কর। এত তীর্থ জগতের কোথায়ও একস্থানে নাই। ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞানহীন মোহন্তদিগের সংস্রবে ভারতের পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে! ইহারা মোহন্ত নহে, মোহান্ধ। পূর্ব্ব মোহন্তগণ তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত করিতেন। শ্রীচন্দ্রনাথের পূজ্যপাদ মোহন্ত গোমতীবন ও রঘুবন স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী আস্তানে কৌপীনমাত্রপরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশ অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথা ইচ্ছা দর্শনী প্রদান করিয়া এবং পাদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে কি শোচনীয় পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে। এখন তীর্থধাম রেলওয়ে পরিণত হইয়াছে। এই মোহান্তেরা এবারে "টিকিট" কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে খেয়া দিয়া, পাহরী রাখিয়া, সযত্নপূর্ব্বক দর্শনীর স্থানে এত কাল "কর" আদায় করিতেছিলেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের ও সমস্ত আয় এখন তাঁহাদের আত্মসেবায় নিঃশেষ হইতেছে। দেবতা, অতিথি ও সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলী পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল, গয়াগঙ্গার চট্টগ্রাম এরূপ প্রগাঢ় ভারত যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্মরাজ্যের পর আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরম তত্ত্বের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' পৌত্তলিকতা নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয়

দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূল নীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে কে ধর্ম্মরক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এই এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন; যতদিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, ততদিন তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন, হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, [illegible] আছে। মহাত্মভেতে অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন, একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে দান্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার করেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই উষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম, কোনও একজন অবস্থাপন্ন শিষ্য অজ্ঞানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না; কারণ, কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামি! তুমি কি এই ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ তাহাকে সেই কার্য্য

ুয় দিবে? বারংবার
ল, তাহাদের এই
তেই বুঝি তোমায়

ত্যাগ ঘটিল!

র নয়নে জল আসিল নয়নেও জলধারা বহিল।
কা সদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা বাবা! ইংরাজ রাজা দোর্দণ্ড-
তাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। কস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা
বিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে? তাহাদেরও অন্য চোরের
ত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে—রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ, বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন, যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্পাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দরিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্য দিকে, দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থ-বল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না করিয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোনও উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া কার্য্য
ক্রমে নেতৃগণ এই
সাম্রাজ্যের একটি
চাটুকারের আবির্ভাব ছে
কহিতে পারে, এমন মিথ্যা ের সামান্ত কথা
না জানে, এমন প্রবঞ্চনা ন করিতে পারে এমন।
নিষ্ফল হয়। নীচাশয়দের চক্রান্তে অভি

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। পুণ্যবতী.....সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে।

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা! তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে এ অঞ্চলস্থ কর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিয়া হইতে দক্ষিণে কক্সবাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান ১০ লক্ষ লোক এক প্রকার গৃহহীন হইয়া, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া

প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রু সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর প্রভাতে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পূর্ণগৃহমাত্র নাই, শৈল-শেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন। বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহা মহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলীস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্য-দ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্র-বিশ্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তির ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবমেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। গর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সৎকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি-শবে দ্বীপাবলি ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে, এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চিরস্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত দুর্ব্বল

প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কৃষিখনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ চর বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্‌সন সাহেব পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ণ। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিনের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ণ-রবি-করে তরঙ্গিত তরল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এত দিনে আমি বৃটিশ রাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজাকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গ হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কমিষার সাহেব একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি, এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেব-প্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ম্মীবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কতবার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইঁহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চির প্রসন্নতা। ঐ দেখ, পাদুকাশূন্যপদে কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা

গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমান কাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

আ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া ১০ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত; তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও তাঁহার মুখে রুক্ষভাব শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের কাছে প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষের দানভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইঁহার পর আমাদের প্রিয়-ভাষী কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথনাথের সঙ্গে অভিবাদনবিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

অ। সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺রাম-মোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে এতদিন অর্দ্ধেক হিন্দু খ্রীষ্টান কি মুসলমান হইত। এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন। (ক্রমশঃ।)

জাপানের পত্র।

অন্তর্যামীর ইচ্ছারূপ পবনে অনন্তের স্রোতে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি কোথায় যাইব, তাহার স্থির নাই—স্থির করিবার শক্তিও নাই। বিধাতৃ ইচ্ছার বিরুদ্ধে—নিয়তির স্রোতের প্রতিকূলে যাইব, আমি দীনবুদ্ধি, হীনশক্তি মানব, আমার এমন সাধ্য কি? সে স্রোত আমাকে যেখানে লইবে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আমাকে সেইখানে যাইতেই হইবে। আজ এখানে আছি; কাল কোথায় যাইব, কে জানে? আজ আপনাকে ইয়োকোহামার কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ইয়োকোহামা কানাগোয়া বিভাগের অন্তর্গত; দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি মাইল, প্রস্থে প্রায় তিন মাইল। ইয়োকোহামা কতকটা উপদ্বীপের মত; তিন দিকেই বিস্তৃত সমুদ্র। সহরের মধ্যেও পাঁচ ছয়টি খাল আছে। বাণিজ্যের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত; মালপত্রের গতায়াত প্রায় সমস্তই নৌকাতে হয়। সহরের মধ্যে বসতির অংশের নিকটে একটা বাজার আছে। বাজারটি ক্ষুদ্র; এবং বিশেষ পরিষ্কারও নহে। শাকসব্জী, ফল মূল, মৎস্য মাংস প্রভৃতি দ্রব্য দোকানে বিক্রীত হয়। বিদেশীয়দিগের থাকিবার জন্য সমুদ্রের নিকটেই উপনিবেশ আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটি উচ্চ সমুদ্রপ্রাচীর। পূর্ব্বাংশে প্রায় বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণ এবং পশ্চিমাংশে জাপানীরা বাস করিয়া থাকে। পশ্চিমাংশকে Japanese Bluff বা নন্‌গিয়ামা (Nungiama) বলে। সমুদ্রতীরে একটি বিস্তৃত রাস্তা আছে। "জেটির" নিকট হইতে "গ্র্যাণ্ড্ হোটেল" পর্য্যন্ত রাস্তাটি কতকটা কলিকাতার "রেড্-রোডের" মত—তবে ইহা প্রস্তরমণ্ডিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যাসমাগমে বিদেশীয়গণ সমীরসেবনার্থ এ পথে আসিয়া থাকেন। এই রাস্তায় পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রতীরে দুইটি হোটেল অবস্থিত—"গ্র্যাণ্ড্ হোটেল" ও "ক্লাব হোটেল"। ইয়োকো-হামার এই দুইটি হোটেলই বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রথমোক্তটি—দ্বিতীয়টির অপে-

ফাও উত্তম। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এই রাস্তার পরই সহরের প্রধান রাস্তা। বিদেশীয়দিগের প্রায় সমস্ত আফিস, ডাকঘর, প্রভৃতি এই রাস্তায় অবস্থিত।

বসতির অংশের নিকটেই একটি উদ্যান আছে। উদ্যানটির চতুর্দ্দিক কেবল চেরীবৃক্ষে পূর্ণ; মধ্যস্থলে একটু ঘেরা জায়গা ও পার্শ্বে একটি কাঠের ঘর। বিদেশীয়গণ এইখানে "টেনিস" "ক্রিকেট" "ফুটবল," প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকেন। ইহার চারি দিক বেড়া দিয়া ঘেরা। যখন চেরীফুল ফুটে, তখন ইয়োকোহামার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই প্রভাত হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানীরা বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয়। অতি দরিদ্রের গৃহেও টবে দুই চারিটি ফুলের গাছ, কিম্বা লতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে কোনও পুষ্পেরই সৌরভ নাই।

কলিকাতায় কেল্লার নিকটে ঘোড়দৌড়ের মাঠের মত, এখানেও একটি ঘোড়দৌড়ের ময়দান আছে। ইহার মধ্যস্থল আবাদী জমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সেখানে নানাপ্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানেও ঘোড়দৌড়ের সময় বাজী মাথা হইয়া থাকে। ইহা সভ্য পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত জুয়াখেলা মাত্র। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল য়ুরোপীয় নীতিবাগীশ জুয়াখেলার বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার নিঃসঙ্কোচে এই জুয়াখেলায় যোগদান করেন। ঘোড়দৌড়ের এই জুয়াখেলা সভ্যজগতের ব্যাধিবিশেষ হইয়া পড়িতেছে।

জাপানে জাপানী হাঁসপাতাল, জর্ম্মণ হাঁসপাতাল, ইংলিশ হাঁসপাতাল প্রভৃতি আছে। সহরের যে অংশ জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত, সে অংশে অনেকগুলি রঙ্গালয় আছে।

জাপানে আর একটি নূতন প্রথার কথা বলি। এখানে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা কি দুইটা পর্য্যন্ত পায়খানা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। সংগৃহীত পুরীষরাশি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া সারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সহরের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকবেষ্টিত একটি স্থান আছে; ইহার নাম "মাগানী চোক্"। পূর্ব্বপত্রে যে সকল অভাগিনীদিগের কথা বলিয়াছি, তাহারা এইখানে বাস করিয়া থাকে। * সহরের পশ্চিমে রেলওয়ে ষ্টেশন।

ইয়োকোহামার প্রায় প্রত্যেক পথেই চারি পাঁচটি করিয়া সাধারণ স্নানাগার অবস্থিত। বোধ করি জগতে আর কুত্রাপি স্নানাগারের এরূপ বাহুল্য লক্ষিত

* "সাহিত্য"—১৩০৪, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

হয় না। প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল স্নানাগার উন্মুক্ত থাকে। অধিকাংশ জাপানী রাত্রি আটটার পর হইতে বারটার মধ্যে স্নান সম্পন্ন করে। প্রত্যেক স্নানাগারে পাশাপাশি দুইটি কাগজের প্রবেশদ্বার। অধিকাংশ গৃহে বামদ্বারে স্ত্রীলোক এবং দক্ষিণ দ্বারে পুরুষগণ গতায়াত করিয়া থাকে। প্রবেশ-পথে সম্মুখেই একটি উচ্চ বেদীর উপর স্নানাগারের কর্ত্তা অথবা কর্ত্রী বসিয়া থাকেন। স্নানের জন্য দুই সেণ্ট (প্রায় পাঁচ পয়সা) ও সাবানের জন্য এক-সেণ্ট এবং যদি কেহ গাত্রমর্দ্দনকারী অথবা গাত্রমর্দ্দনকারিণী চাহে, তজ্জন্য আর এক সেণ্ট দিতে হয়। সাধারণতঃ বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে কিছু অধিক আদায় করা হইয়া থাকে;—তবে দশ সেণ্টের অধিক আদায় হয় না। যাহাতে গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক প্রবেশ করিতে পায়, তজ্জন্য, কক্ষটির পশ্চাদ্ভাগ ব্যতীত, অপর তিন দিকের প্রাচীর, কাচের বা কাগজের। একটু চেষ্টা করিলেই রাস্তা হইতে স্নানার্থী বা স্নানার্থিনীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানাগারের হর্ম্ম্যতল কাষ্ঠবিনির্ম্মিত;—জাহাজের পাটাতনের মত মসৃণ ও রঞ্জিত। কক্ষমধ্যে সম্মুখেই দেরাজের মত একটা বস্ত্রাদি রাখিবার স্থান আছে। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিবস্ত্র হইয়া দেরাজের মধ্যে বসনাদি রক্ষা করে। হর্ম্ম্যতল দুই ভাগে বিভক্ত—সম্মুখের অংশে স্নানের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ত্যাগ ও স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিধান করা হয়। এই অংশ প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমাণ উচ্চ; প্রস্থে প্রায় পাঁচ হাত হইবে। এই উচ্চ স্থানের নিম্নেই স্নান হইয়া থাকে। আজকাল সহরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের স্নানের স্থানে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য হর্ম্ম্যতলের নিম্নাংশে একটি দুই তিন হাত উচ্চ কাগজের ব্যবধান প্রদান করা হইয়া থাকে। এই কাগজের দেওয়ালের মধ্যে আবার বাতায়াতের জন্য দুই তিনটি দ্বার থাকে। দ্বারগুলি উন্মুক্তই থাকে; ব্যবধান নামমাত্র। সকলেই ছোট ছোট টবে গরম জল লইয়া গাত্রমার্জ্জনে রত থাকে; সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদের সমালোচনাও চলিতে থাকে। পুরুষেরা ইচ্ছামত যে কোনও প্রকারে, এবং স্ত্রীলোকেরা একটি জানু নত ও অপরটি উত্থিত করিয়া বীরাসনে উপবেশন করে। সম্মুখে কাষ্ঠদণ্ডের উপর এক একখানি দর্পণ রক্ষিত হয়। কেহ স্বহস্তে বুরুশ ও বাবুই পাখীর বাসার মত এক প্রকার পদার্থ লইয়া গাত্রমার্জ্জন করে; কেহ বা কৌপীনমাত্রধারী বলিষ্ঠ যুবকদিগের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাইয়া লয়। মধ্যস্থিত দেওয়ালের

নিকট একখানি জলের কটাহ থাকে; ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য্য। এই সকল স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র গরম জলের বৃহৎ টব থাকে। গাত্রমার্জ্জনাদির পর সকলে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় প্রায় দশ মিনিট কাল এই গরম জলের টবে উপবেশন করিয়া থাকে। গাত্রের জল মুছিয়া উলঙ্গাবস্থায় কেশবিন্যাস সমাপ্ত করিয়া বস্ত্র পরিধান করা যায়। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামের স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই; সকলেই একত্র এক টবে স্নান করে। সহরে গলিঘুঁজিতেও এই ব্যবস্থা। পূর্ব্বে এই কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি নাই। একদিন এক সম্ভ্রান্ত জাপানী বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া বহু দূরে গিয়া যাই; প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বলিলেন, "আজ জাপানের একটি রহস্য দেখাইব।" আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখাইবেন?" তিনি আমাকে লইয়া একটি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র স্নান করিতেছে। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই নানা কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "ইন্দনো জাপানে ভারতবাসী বা সিংহলবাসীদিগের কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলে টি ছোট ছেলে মেয়েরাও খেলা ভুলিয়া "ইন্দনো কোকরো, ইন্দনো " বলিতে বলিতে পথিকের অনুগমন করে। আমার জাপানী বন্ধুটি কে স্নানাগারের সমস্ত ব্যাপার দেখাইলেন। বিস্মিত হইয়া আমি রাত্রি টটার সময় বাসায় ফিরিলাম।

আমি বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, আমার শয়নকক্ষে টেবিলের উপর একখানি পত্র রহিয়াছে। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আমাকে টোকিওতে লইয়া যাইবার জন্য ইহা ইনাওয়ের * নিমন্ত্রণপত্র। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অবধি জানিতে ছিলাম যে, এ দেশের ধর্ম্মের অবস্থা ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোনও ধর্ম্মসভায় যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তদবধি এখানকার ধর্ম্মের তথ্য জানিবার জন্য আমি মন্দিরে মন্দিরে এবং সাধু ও সাধ্বী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, যে ধর্ম্ম ও যে জ্ঞান এককালে ঋষি, মুনি, সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকদিগের জীব-

* ইনাওয়ে সমস্ত জাপানের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

নের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থদিগের আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকগণ এক্ষণে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণা অভিমানে ও জ্ঞানের অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান নাই, গর্ব্ব আছে। বিবেক নাই, বৃহৎ চক্ষু আছে। তাঁহারা আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ এবং জগতের আর সকলকে হেয় বিবেচনা করেন। এক্ষণে বরং গৃহস্থদিগকে ধর্ম্মালোচনা হেতু সরল ও সত্যপ্রিয় দেখা যায়। সাধুদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা আমি হতাশ হইয়াছিলাম। ভগ্নমনোরথ হইয়া আমি যখন এ দেশ বিষয় অবগত হওয়া একান্তই সুদূরপরাহত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি সেই সময় এই পত্র আমার মৃতপ্রায় আশা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। সত্যসন্ধানে প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে ভগবান স্বয়ং সত্যানুসন্ধিৎসুর পথ সুগম করিয়া দেন। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চা পান করিয়া আমি টোকিও যাত্রা করিলাম।

ডাক্তার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালগুলা আমার দুই চক্ষের বিষ, কিন্তু খোঁড়ার পা খালেই পড়িবে? যতই তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, ততই তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বাল্যকালে এই বাঙ্গালের অত্যাচারে লেখাপড়া ছাড়িতে হইয়াছে; যৌবনে সংসারপথে পদার্পণ পূর্ব্বক একটু মান সম্ভ্রমের যোগাড় করিয়া লইয়াছি, দেখি, সম্মুখেই আমার পথরোধ করিয়া একটা বাঙ্গাল দণ্ডায়মান! ক্রোধে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল, কিন্তু নিরুপায়; এই রক্ততেজোবর্জ্জিত কলিকালে ব্রাহ্মণের মুখের অগ্নি নিষ্ফল আস্ফালনে পরিণত হইয়াছে, নতুবা এক এক সময়ে আমাদের যে পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহাতে সত্যযুগের মত কথায় কথায় মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিবার ক্ষমতা থাকিলে, প্রতিবাসেই দুই চারিটা খাণ্ডবদাহন করিতে পারিতাম; যাহা হউক, আক্ষেপ ছাড়িয়া এখন প্রকৃত কথা বলি।

বাবার কিছু জমীদারী ছিল; লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিলাম; মনে করিলাম, বি. এ., এম. এ, পাশ না করি, লেখাপড়া ত শিখিয়াছি, কাহারও দাসত্ব করিবারও আবশ্যক নাই। আমাদের জগা পাগলা বলিত, "কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং।" তাহাও হইয়া গিয়াছে, বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই সৌদামিনী-রূপ মাধবীলতায় এই নবীন সহকার পরিবেষ্টিত করিয়া আমি এখন সংসারের কর্ত্তা। স্থির করিলাম, সংসারে একটা কিছু করিব।

একটা মাইনর ইস্কুল ছিল। অনেক কাল আগে বাবা তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। আমি দেখিলাম, অগ্রে সেই পৈতৃক গৌরবটি হস্তগত করা আবশ্যক; ইস্কুলফণ্ডে কিছু টাকা সাহায্য করা গেল। টাকাটা আমার নিজের পকেট হইতে ব্যয় করিতে হয় নাই, আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রজারা কিছু কিছু মাথট দিয়াছিল, তাহারই কতক টাকা বাঁচিয়া ছিল, সেই টাকা ব্যয় করিয়া খুলনাতে 'দেশহিতৈষী' নাম ক্রয় করিলাম।

শিক্ষাবিস্তারে আমার উৎসাহ দেখিয়া ইস্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী বাবু বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি আমাদের মহকুমার একজন খ্যাতনামা সেকেলে উকীল; আদালতে তাঁহার অখণ্ড পসার; একদিন অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া তিনি বলিলেন, "ভায়াহে! তোমরা নূতন জমিদার, তাতে এডুকেটেড; দেশের উন্নতি করা তোমাদেরই কাজ, ইস্কুলের ভারটা তুমিই লও. এ বৃদ্ধবয়সে পাঁচ কাজে আমি ব্যতিব্যস্ত থাকি, সময়ও নাই, উৎসাহও নাই, তুমি হইলে কাজ চলিবে ভাল।" আমি প্রথমে একটু আধটু আপত্তি করিয়া সেক্রেটারী হইতে স্বীকার করিলাম।

আমি সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইলে, ষ্টেটস্‌ম্যানে কে একটা করসপন্‌ডেন্স বাহির করিল যে, আমিই এখন আমাদের গোপীনাথপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট, নিঃস্বার্থপরতার অকৃটরলোনী মনুমেণ্ট, এবং দয়ার আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র; এ অঞ্চলের মধ্যে আমিই একমাত্র শিক্ষিত জমীদার।—আমি তখন নূতন ষ্টেটস্‌ম্যানের গ্রাহক হইয়াছি, বড় লোকের দুই একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত জিনিষ রাখা দরকার—তন্মধ্যে খবরের কাগজ একটা। আমি নিজে কখনও ঐ কাগজ খুলিতামও না, পাড়ার ছেলেরা খুলিয়া এক আধবার দেখিত, তাহার পর পরাণে বেনে মশলা বাঁধিবার জন্য দোকানে লইয়া যাইত।

ষ্টেটস্‌ম্যানে এই করেসপণ্ডেন্স বাহির হইলে আমার ইস্কুলের সেকেণ্ড

মাষ্টার তাহাতে একটা নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া আমার বৃষ্টি আর্ক
আমার কাছে পাঠাইয়াছিল। আমাকে স্বীকার করিতেই হই
অক্ষরের নামের একটা মোহ আছে। আমি পেটি, ছাপার হর
মুদ্রিত দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল; মনে হইল, পৃথ্বীরাজ
সিংহ, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী, পার্কার ও ওয়াশিংটন, ইহারা
আমিও সেই দলের, কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্ম
গিয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ; স্বদেশহিতৈষী হওয়া এতই সহজ। বুঝি
সেই সেকেণ্ড মাষ্টারই আমার এই জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়াছে। আ
নহি, আমার সেই জয়চাকটাকে আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউ
করিলাম।

কিন্তু স্বদেশহিতৈষীর সম্মান যশঃশশধরও অনেক সময় দুর্বৃ
রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকে; ষ্টেটস্ ম্যানের করসপন্ডেন্স্ বাহির হইবা
পরে "আর্য্যপ্রদীপ" নামক সাপ্তাহিক কাগজে আমার স্বদেশ
সমালোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। তাহ
লিখিয়াছে যে "প্রবন্ধটি নিকট হইতে আমি যে মাথট সংগ্রহ করিয়
জোর করিয়া ভিক্ষা আদায়ের নামান্তরমাত্র, এবং এই অর্থের
গোবধ করিয়া তাহার চর্ম্মে ব্রাহ্মণকে জুতাদানের ব্যবস্থার সহিত
আমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলাম, একবার মনে হইল, সম্পাদক কুল-
এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা ছাপাইতে পারে; তাহাকে ধরিয়া
আসি। ক্রোধের প্রথম উচ্ছ্বাস কিছু প্রশমিত হইলে আমা
নব্য উকীল মহেশ বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তখন
চার ফেলিয়া মকেল-মৎস্য ধরিবার জন্য নিজের বৈঠকখানায় বি
পুস্তকরূপা 'হইল' লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, তিনি আমাদে
দিলেন, "এডিটারের কাছে উকীলের চিঠি দিয়া আগে লেখকের ন
পাঠাও, তাহার পর ডিফামেসন সুট, এ ত জলের মত সোজা মক
কথাটা সঙ্গত বোধ করিলাম, তখনই উকীলের চিঠি লইয়া ডাকে
লাম, কিন্তু সম্পাদক লেখকের নাম প্রকাশ করিল না, পত্রের উ
দিল না, অধিক 'পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি'—নামক কলমে স্লে
লিখিল, "গরু মারিয়া জুতাদানের রীতি সভ্য এবং অসভ্য স
বর্ত্তমান আছে, বাবুজী অনর্থক মনঃকষ্ট পাইয়াছেন; যদি মস্তিষ

হয়, কিঞ্চিৎ মধ্যমনারায়ণ ব্যবহার করিলে সুফল লাভ হইতে পারে।"—পাঠাইলাম উকীলের চিঠি, উত্তরে কবিরাজের ব্যবস্থা আসিল। আমি ক্রুদ্ধচিত্তে মহকুমার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী উকীল নীলাম্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, "ডিফামেশন সুট করা সহজ বটে, কিন্তু ফলাফলের কিছুই বলা যায় না; তোমারও কিছু কিছু গলদ বাহির হইতে পারে; সহ্য যাওয়াই ভাল, জানই ত, 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।' পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেকেরই গালাগালি সহ্য করিতে হয়। গ্ল্যাডষ্টোন হইতে ভারতের সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি নাই।"—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" ঠিক কথা,—আমি মোকদ্দমা রুজু করিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্থির করিলাম বটে, কিন্তু এই পত্রপ্রেরক লোকটা কে, গোপনে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অবশেষে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, কাজটা আর কাহারও নয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেদের আশ্রিত, আমার চিরশত্রু, সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবুরই এই কীর্ত্তি।

বাঙ্গালের উপর হাড়ে চটিয়া গেলাম। গগন বাবুর বাড়ী কোথায় খবর রাখি না; চট্টগ্রাম কি শ্রীহট্ট, বরিশাল কি বাখরগঞ্জ, এই রকম কোন একটা জেলায় হইবে। লোকটা কিছু ব্রাহ্মতন্ত্রের; বাছবিচার কিছু করে না, যে যেটা ধরে, তাহা কিছুতে ছাড়ে না; পরস্ত্রীকাতরের অগ্রগণ্য। এমন লোককেও মানুষে কাজের ভার দেয়? কিন্তু সে ঘোষেদের বড়বাবু প্রাণকৃষ্ণের বন্ধু, বন্ধুকে সম্মানিত করিবার জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবু তাহাকে তাঁহার সংস্থাপিত মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী করিয়া দিয়াছেন। আমিও স্কুলের সেক্রেটারী, আর এই নামহীন, অর্থহীন, পরান্নভোজী, সামান্য ডাক্তারও স্কুলের সেক্রেটারী! আমার বন্ধু জয়লাল বলিত, হস্তীও চতুষ্পদ, ভেকও চতুষ্পদ। স্থির করিলাম, একবার তাহাকে আমার ক্ষমতাটা দেখাইব, হাতে না পারি, ভাতে মারিব।

আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার সেই সেকেণ্ড মাষ্টারকে দিয়া "ব্যবহার-দর্পণ" নামক মাসিকপত্রিকায় গোটাকত প্রবন্ধ লিখাইলাম। সম্পাদক প্রথমে সে প্রবন্ধ ছাপিতে আপত্তি করিয়া [illegible] কাপী

কাগজের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইতেই সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল; সেই সকল প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীশিক্ষাটা আমাদের দেশের উপযোগী নয়, ইহাতে রমণীর সতীধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এই শোচনীয় শিক্ষায় রমণীর সুযোগমত বৃত্তি বিনষ্ট হইতে পারে, ইহাতে বিধবাবিবাহের সংখ্যা বাড়িবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের আস্থা থাকিবে না, এবং জীবনসংগ্রামে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যে [illegible] তাহাতে পুরুষেরই [illegible] নাসিকা, নাসিকাময়না ললনাকুলকে [illegible] পুরুষকে কেহই [illegible] নিযুক্ত করিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার স্ত্রীকর্ম্মচারিগণের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। স্ত্রী [illegible] আমার যে বিশেষ বিরাগ ছিল, তা নয়; তবে ব্রাহ্ম ডাক্তারটাকে জব্দ করার জন্য আমাকে এই প্রকার ফুট নীতির পক্ষ সমর্থন করিতে হইল, এই কারণেই, উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে আমি যে মাসিক চাঁদা দিতাম, তাহা বন্ধ করিলাম। আমার দলস্থ যে সকল লোক গার্লস্ স্কুল কমিটীর মেম্বর ছিলেন, তাঁহাদিগকে সভাশ্রেণী হইতে উঠাইয়া আনিলাম। কিন্তু হায়! এত চেষ্টা করিয়াও স্কুল উঠিল না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেরা ডাক্তারের পরম সহায়। তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুল চালাইতে লাগিল। ডাক্তার অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং কাহারও কোনও ক্ষতি হইল না; কেবল আমার স্বদেশহিতৈষী অন্তরাত্মা নিষ্ফল আক্রোশে অধিক করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

শেষে আমি অধিক পরিমাণে রাজকর্ম্মচারীর লাভের জন্য সচেষ্ট হইলাম। বুঝিলাম, ইহাতেই শুধু প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ করা যাইতে পারে। গগন ডাক্তার তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। আমাদের মহকুমার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রসুল উদ্দীনকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে এই প্রকার সখের চাকরী লাভ হইতে পারে শুনিয়া, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আরম্ভ করিলাম, এবং তাঁহাকে মাছ, মুরগী, খাসি, ঘৃত ও বালাম চাউল প্রভৃতি আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্যদ্রব্য উপহার পাঠাইতে লাগিলাম। মুসলমান শাস্ত্রে আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং পীর ও পয়গম্বরদিগের লোভ-নামক রিপুটার প্রাধান্য সম্বন্ধে কোনও পরিচয় পাই নাই, কিন্তু মানবচরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, অতএব উপহারপ্রভাবে ডেপুটী রসুল উদ্দীন সাহেবকে হস্তগত করা আমার পক্ষে কঠিন হইল না।

দুই মাস্ পরে কলিকাতা গেজেটে সংবাদ বাহির হইল, ছোটলাট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর অনাহারী হাকিম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জমীদারের ছেলে হাকিম হইলাম; আমার পার্শ্বচর প্রাইভেট টিউটার হাসিয়া বলিল, "ইহারই নাম সোনার উপর মিনের কাজ"—যাহারা পূর্ব্বে এক হাত তুলিয়া সেলাম করিত, তাহারা এখন দুই হাতে সেলামের বৃষ্টি করিতে লাগিল।

নির্ব্বিঘ্নে সরকারী কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই যে একটা বাদাল পথভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অন্নবস্ত্রের চেষ্টায় কোথা হইতে আমাদের গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ডেপুটি সাহেব তাহাকে ও আমাকে এক বেঞ্চে কাজ করিতে দিলেন। আমরা দু'জনেই তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম, কিন্তু ডাক্তার সিনিয়ার, কাজেই রায়-প্রকাশের ভার তাহার হাতে! আমার বড় রাগ হইত, কিন্তু যুক্তিতে তাহাকে হারাইতে পারিতাম না; হারিয়া জেদ বাড়িয়া গেল, স্থির করিলাম, শীঘ্রই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

পর বৎসর শীতকালে কালেক্টর সাহেব সফরে বাহির হইলেন, এবং আমাদের মহকুমা-পরিদর্শনে আসিলেন; আমি এই সুযোগে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা দেখিলাম। ডেপুটী সাহেবের অনুগ্রহে কাজটা কঠিন হইল না। দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে খানা আনাইলাম, কেলনারের গ্রীনসিল হুইস্কি ও শ্যাম্পেন, ম্যানিলার সুগন্ধি চুরোট, সিজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানভবনে কালেক্টর সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডেপুটী সাহেব এবং একদল কুঠিয়াল সাহেবকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলাম। আমাদের ডেপুটী সাহেব কালেক্টরের কাছে আমাকে introduce করিয়া দিলে সাহেব আমার অমায়িক ব্যবহার ও রাজভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সে বৎসর বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বলে সর্ব্বত্র অজন্মা, গৃহে গৃহে লোক উপবাসী; কালেক্টরের অনুরোধে Central Famine Fundএর খাতায় আমি এক শত টাকা দান স্বাক্ষর করিলাম। আহারান্তে পরিপূর্ণ উদর, লব্ধতৃপ্তি, সুধাপানপ্রফুল্লচিত্ত, মুখভঙ্গিতে সাহেব সুগন্ধি চুরোটে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "বাবু! তোমাদের মত লয়াল এন্‌লাইটেণ্ড ইয়ং জমীন্দারস্ বাঙ্গালা দেশের অর্ণামেণ্ট, Now good bye, your public-spirit should be rewarded."

মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল।
ও পিতামহগণ বৃথা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা ক
দের উদর পূর্ণ করিয়া রাশি রাশি টাকার
লোকের মূর্খতার সীমা ছিল না।

আমি প্রফুল্ল অন্তরে গৃহে ফিরিলাম।
বাজারের মুদী তেল-সরষের উঠনার দেন
নতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছে। অ
বিমুগ্ধ হইয়া 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভে
ভাল এবং মুন্সেফী আদালতের ক্ষুদ্র ডিক্রী

তৃতীয় পরি

পরবৎসর এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্রক
ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে কেবল আমিই সুন
কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। পঞ্চ গেজেট
হইলাম। আনন্দে আমার বুক ফুলিয়া উ
দলস্থ বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া; গে
শুনাইলাম। শুনিয়া সকলে একবাক্যে ধন্য
ঘোষেদের মূর্খতা লইয়া অনেক উপহাস চা

কিন্তু নিন্দুকেরা আমায় নিন্দাঘোষণা
সুনাম এবং রাজদ্বারে প্রতিপত্তি ঘোষে
আমাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহারাই
আমার নামে মকদ্দমা করাইয়াছিল; এবং
আমি পাওনাদারদিগের প্রাপ্য টাকা
কোন ঠিক নাই, আমি দেনা করিয়া সা
আত্মীয়েরা অনাহারে থাকে, দেশের সাহে
হউক, আমার স্বদেশিগণ আমাকে প্রতা
ইত্যাদি।

কথাগুলা আমার কানে না পঁহুছিত,
গ্লানি আমি গ্রাহ্যও করিতাম না। দেশে

হইবার আবশ্যক? ক্ষুদ্র মুদী ময়রা, কাপড়ওয়ালার সামান্য দেনা পরিশোধ না করিলে কি এমন অন্যায় হয়? "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এ ত শাস্ত্রের কথা, বিশেষতঃ যাহারা প্রেষ্টিজের মর্ম্ম অবগত আছে, যাহাদের কাছে 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করিয়া না চলিলে প্রাতপত্তিহানির সম্ভাবনা, তাহাদের কাছেই সাবধান হইয়া চলিব; নিজের মা ঘরের কোন্ কোণে অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে শীর্ণদেহে হাহাকার করিতেছে, তাহার সংবাদ না লইলে কি ক্ষতি!—ভারতমাতার জন্য আমি কতখানি বাক্য এবং অর্থ ব্যয় করিতেছি, ছুটাছুটি ও কলরব করিয়া দেশের কানে তালা ধরাইতেছি, সংবাদপত্রে কি পরিমাণে জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতেছে, তাহাই আলোচনার বিষয়; private characterএর দিকে কটাক্ষ করিয়া দোষগুণের বিচার করা সভ্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। public career দেখিয়া যাহারা মানুষের ওজনামের আলোচনা করিতে শেখে নাই, তাহারা সভ্যসমাজের নিম্নতম সোপানে অবস্থিত, ঘোষেদের সভ্য হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তাহাদের নিন্দায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না।

দুই এক মাসের মধ্যেই আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিলাম। আমার, প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ বলিয়া অভিমান করিত। আমার এই পদবৃদ্ধিতে সে বিষম ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। তাই মানসিক সন্তোষলাভের অভিলাষে বন্ধুমহলে প্রকাশ করিতে লাগিল, "তোষামোদ করিয়া সকলেই এমন পদ পাইতে পারে।"—এ কথার একটা জবাব দেওয়া আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের মোসাহেব জহরলালকে একদিন পথে দেখিতে পাইয়া কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিলাম, "তোষামোদ করাও একটা ক্ষমতা, সকলে কি সকলের কাছে কল্‌কে পায়? তোমার বাবু তোমাকে যেমন ভাল বাসেন, আর কাহাকেও তেমন ভাল বাসেন কি?"—ভাবিয়াছিলাম,—সে তাহার প্রভুর কথার মর্ম্ম আমার কথারও প্রতিধ্বনি করিবে; কিন্তু আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, জহরলাল বলিল, "সকল লোকেরই খানিক করিয়া দুর্ব্বলতা আছে, সেই রন্ধ্রপথে শয়তান তাহাদের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষমতাশালী লোককেও কিয়ৎপরিমাণে নিজের অধীন করিয়া লয়, ইহাতে শয়তানের কোন গৌরব নাই। তৈলমর্দ্দনের অনুরোধে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা ভাল রকম চলিলে অধিক লোকে আমাদের হিংসা করে না, বরং কৃপাপাত্র বলিয়াই মনে করে; কিন্তু সে জন্য যদি প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তৈলদাতাকে উচ্চাসন

দেওয়া হয়, তাহা হইলেই লোকে নিন্দা করে; তোষামোদ করিয়া বড় হওয়া সহজ হইলে কে হইবার চেষ্টা করিবে কেন? আবার যে নিন্দায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মন্ত্রিত্ব বা বিচারকের প[দ] সর্ব্বদা মঙ্গল হয় না।"—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের এই মত বক্তৃতা করিতে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্ব কিন্তু এখনও বিপদ হইতে উদ্ধার নাই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না, তেমনি সে [ও] করিয়া দিতাম। আমি তখন আমার অ[ফি] দেখি, ডেপুটি সাহেব একটা গরুচুরীর মকদ্দমা এবং আমাকে ও গগন ডাক্তারকে একত্র দিয়াছেন।

আমি অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নব্য ডেপুটি ও এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অনুসারে এই মকদ্দমার আমিই রায় লিখি 'থার্ডক্লাস পাওয়ার্সে'ই পড়িয়া আছে। কি করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে ভয়ানক মতভে[দ] বেটা নিশ্চয়ই গরুচুরী করিয়াছিল, নতুবা [ক] মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিবে?—বিশেষতঃ, "tion" কথাটা অনেকদিন হইতে আমার হাকিমদের বেতন নাই বটে, কিন্তু পদবৃদ্ধি, কয় জন প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট বে[ঞ্চ] dent Bench) শোভিত করিয়াছে?—আ[র] আর বেতন না থাকিলেই বা কি? অনাহ[ার] নাই? আহার যে একবারেই নাই, এ[ক] না। ইংরাজী প্রবচনে লিখিত আছে, "[ই] লওয়া যায়", আমাদের ন্যায় "ইনটেলিজে[ন্স] ফৌজদারী হাকিমী করিয়া মোক্তার দলের সেলামবৃষ্টি, সস্তা দরে গোপপল্লীর দধিদুগ্ধ, পুষ্করিণীর মাছ, ক্ষেতের তরি তরকারী, বা[ড়ী]

দারের স্কন্ধে ভর করিয়া ইঙ্গিতমাত্রে যে গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত হয়, ইহার কি কোন মূল্য নাই? তথাপি মূর্খেরা বলে, এ চাকরী "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান মাত্র।" ঢোঁড়া সাপের যে কিছুমাত্র বিষ নাই এ কথা গগন ডাক্তারের জানা ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞানীদের দোষই ঐ। সে গরুচুরীর মকদ্দমায় আমার সঙ্গে কিছুতে একমত হইল না। চোরের পরমাত্মীয় হইয়া বলিল, বলিল, "অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ নাই, এরূপ অবস্থায় ইহার দণ্ডবিধান করিলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অবমাননা করা হইবে।" অগত্যা মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে 'রেফার' হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন লোক, আমার সঙ্গে তখনও পক্ষতা জন্মে নাই, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে পুনর্ব্বিচারের ভার দিলেন, গরুচোর বেটা বেকসুর খালাস পাইল।

আমি একটু ব্যথিত হইলাম। আমি কখন এমন আঘাতপ্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এখানেই অব্যাহতি নাই। আমাদের পক্ষের অসভ্য মোক্তারটা একদিন এক নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইয়া দশনপংক্তি বিকশিত করিয়া সহাস্যে এবং সালঙ্কারে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের কাছে যখন আমার সেই বিচারকাহিনীর বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, "হে মা বসুমতি, বলি তুমি দ্বিধা—" কিন্তু সে কথা থাক্। গগন ডাক্তারের স্পর্দ্ধায় আমি আরও বিচলিত হইয়া উঠিলাম; ডাক্তার সেই মোক্তারকে আহ্বান করিয়া বলিল, "ছিঃ নন্দলাল বাবু, এ সমস্ত তুচ্ছ কথা লইয়া নিমন্ত্রণসভায় এক জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে বিদ্রূপ করা উচিত কি? ভ্রম ত সকলেরই হয়। মহাকাব্য বাবু বলিলেন, তিনি যদি একটা ভুল করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ না করাই ভদ্রতা, বিচারকার্য্যে বড় বড় বিচারকগণেরও ভ্রম ঘটিয়া থাকে।" ব্রাহ্মের উদারতা দেখিয়া রাগে ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণ্যমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপমানিত হইয়া ক্রোধে, ক্ষোভে ও মনস্তাপে আমি নিমন্ত্রণসভা ত্যাগ করিলাম। সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি বিচারকদের সাধারণ লোকের সহিত মেশা-মিশি না করার প্রথা অতি প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে এক এক দিনের এক একটা ঘটনায় ডাক্তারের উপর আমার ক্রোধ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার চাকরীর উপর যমদণ্ডক্ষেপের ভার

একটা কঠোর এবং অব্যর্থ আঘাত করিবার জন্য আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি পরিচালনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঙ্গালকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি যতবার তাহাকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ততবারই সে ধৈর্য্যের সহিত উদার সকরুণ ব্যবহারে, কখনও অটল নির্ভীকতায়, কখনও নিরুত্তর অবজ্ঞাভরে, আমার আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রতিপন্ন করার সে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, আমি তাহার নিকট বুদ্ধিহীন বালক ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমি আপনার ক্রোধে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

গগন ডাক্তার মিউনিসিপালিটীর ডাক্তার। অবশেষে যেবার আমি আমাদের গোপীনাথপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলাম, সেই বার তাহাকে হাতে পাইলাম; প্রত্যেক বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে আমার খুটি-নাটি চলিতে লাগিল। আমি ভাবিতাম, সে চেয়ারম্যানের ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমার সমস্ত আদেশ বিনা প্রতিবাদে এবং নতশিরে সে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু গগন ডাক্তারের বিশ্বাস ছিল, তাহার কর্ত্তব্যে আমার হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই।

যাহা হউক, কিছু দিন পরে একটা সুযোগ ঘটিল। প্রমাণ পাইলাম, গগ ডাক্তার কোনও রোগীর নিকট মিউনিসিপালিটীর ঔষধালয় হইতে একটা ঔষধ বিক্রয় করিয়াছে। আমার সুযোগ্য বন্ধু হরিচরণ ডাক্তার এ বিষয়ের একজন প্রধান সাক্ষী; অন্যান্য সাক্ষীরও অভাব হইল না। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি তখন মিউনিসিপালিটীর সভাপতির কঠিন কর্ত্তব্যসম্পাদনে কৃতসংকল্প, কাহারও সুপারিসে কর্ণপাত করিলাম না।

কিন্তু বাঙ্গালদের কি অপূর্ব্ব একতা! সবডিবিজনাল কোর্টে মকদ্দমা, আদালত লোকে লোকারণ্য। কোর্টের প্রধান উকীলগণ কেহ কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে এজলাসের সম্মুখে উপবিষ্ট। গগন ডাক্তার, নির্ভীকভাবে ডকে দণ্ডায়মান; কেন জানি না, তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার একটু লজ্জা বোধ হইতেছিল, তাই একটু তফাতে বসিয়া মকদ্দমার গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। মকদ্দমা আরম্ভ হইবে, এমন সময় হাটকোটধারী এক বাঙ্গালী সাহেব প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী লিভারি-শোভিত চাপরাশীর ঘাড়ে আইন-পুস্তকের গন্ধমাদন চাপাইয়া ধীরমন্থরগমনে এজলাসে প্রবেশ করিলেন। দর্শকগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমিও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি-

নাম, বাঙ্গাল ব্যারিষ্টার মিঃ বোস সাহেব। তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম্মবিন্দুর অপসারণপূর্ব্বক ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন, তাহার পর টেবিলের উপর হ্যাট রাখিয়া মৃদুহাস্যে হাকিমকে বলিলেন, "এই শব্দমায় আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য আমি কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করি।"

শুনিলাম, বোস সাহেব স্বদেশী ডাক্তারকে রক্ষা করিবার জন্য বিনা ফিসে কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক মফঃস্বল কোর্টে আসিয়াছেন। আসামী পক্ষ সমর্থন চালাইবার জন্য এতখানি আয়োজন করিয়াছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও অগ্রে জানিতে পারি নাই। আমাদের ডেপুটি হাকিম মৌলবি সাহেব বোধ করি আর কখনও ব্যারিষ্টারের হাতে পড়েন নাই, মিঃ বোসের প্রভাবে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রস-এক্সামিনেশনে আমার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; দেখি, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া চাষাগুলা পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্ত হইতে হাসিতেছে। আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলাম। চারি ঘণ্টার পর আসামী বেকসুর খালাস পাইল। আমার প্রদত্তমাছ ও মুরগী, ঘৃত ও খাসীতে উদর পূর্ণ করিয়া ডেপুটী সাহেব রায়ের ভিতর আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহাতে আসামীর পক্ষে আমার নামে 'ড্যামেজ সুট' আনিবার বিশেষ সুবিধাই হইল; আমার একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "Oh Treachery! thy name is Musulman.

[illegible] আমার [illegible]

অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া ইংরাজী
ক্রমাগত কড়ের সপ্তর্ষি বাহির হইতে লাগি
উইটার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আ
করিতে লাগিল; মাসেক খানেক ধরি
আলোচনার অন্ত বিষয় নাই; দলাদলির
উদ্ভব হইল, শেষে গোলমাল দেখিয়া
ইন' দিলাম।

কিন্তু এ-জন্য আমার কোন আক্ষেপ
বিলম্বেই আমি জেলাবোর্ডের সহকারী সভা
পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে কিছু অর্থ
টাভলিংটা বথারীতি ঘরে আসিবার কথা,
বিক্ত নয়; বিশেষতঃ, যে সকল ক্ষমতা
আমার এই পদলাভে, তাহা আমার পক্ষে
আমার গ্রামসম্পর্কের বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বলি
'সাহায্য করে নিলে যা হোক।" আমি
লোকে নিন্দে কত্তে ছাড়ে না, বলে লেখা
হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই, ইঁদুর ধরা
কাঠের বিড়াল। এখন হাকিমীর সনদখানা
পেলেই

দিবার জন্য আমি সদরে নিমন্ত্রিত হইলাম। এবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, আমার পুত্র কয়েক দিনের জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে; জ্বরটার লক্ষণ কিছু খারাপ। কিন্তু পৃথিবীতে প্রত্যহ উপস্থিত হইলেও আজ আমাকে সদরে যাইতে হইবে। আমার হিতৈষী বন্ধুকে, আমার সংসারসুখের বিধাতাকে, তাঁহার বিদায় উপলক্ষে আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রদর্শনের সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

তিন দিন পরে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বাড়ী ফিরিলাম। যখন বাড়ীর কাছে আসিলাম, তখন রাত্রি তিনটা। সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, রাত্রিশেষে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়ের শব্দে, অরণ্যের সুবিশাল বৃক্ষপত্রের আকুল শব্দে, এবং মেঘমণ্ডিতা সেই বর্ষানিশীথিনীর দিগন্তব্যাপী সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘনবিজলীচ্ছটায় ও মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে একটা খণ্ডপ্রলয়ের আশঙ্কা মনে পড়িতে লাগিল। পথে কেহ কোথাও নাই, শুধু একখানি রুদ্ধদ্বার শকটে আমি একাকী। বৃষ্টির শব্দের সহিত সম্মিলিত প্রভঞ্জনধ্বনি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিরাশ্রয় দৈত্যশিশুর আর্ত্তনাদের ন্যায় তীব্র, সকরুণ এবং দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মনে পড়িল, আমার গৃহে আমার স্ত্রী একাকিনী রহিয়াছে, এবং তাহার শয্যাপ্রান্তে আমার শিশু পুত্র রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে; কে জানে, শিশুর দেহে এখনও প্রাণ আছে কি না?—আর আমি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষমতালাভের আশায়, রায় বাহাদুর খেতাবলাভের দুর্দ্দান্ত যুদ্ধ হইয়া, শুধু পরের পদে অর্ঘ্য ও তোষামোদ-পুষ্পাঞ্জলি-বর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। সংসারে আমার কিসের অভাব?—আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার প্রজাপুঞ্জ, আমার আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী এবং গ্রামবাসী, সকলের হৃদয়ের উপরে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মহিমাজ্যোতিঃসমলঙ্কৃত সম্মানাসন সংস্থাপন করিবার জন্য আজীবন শুধু আত্মসম্মান বলিদান করিয়াছি, মনুষ্যত্বলাভের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আসিতেছি, সাধারণের নিন্দা ও অখ্যাতিকে গণ্য করি নাই। আজ এই তৃতীয় প্রহর রাত্রে, এই বৃষ্টিপ্লাবিতা ঝঞ্ঝালুণ্ঠিতা ধরণীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে আমার সুপ্ত হৃদয় এতকাল পরে সহসা প্রায় কঠোর মনুষ্যত্বের তীব্র কশাঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। আমি বৃথা পদগৌরবের নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল আলোকবেষ্টনের মধ্যে

অবিদ্ধ রমণীপ্রেম, পুত্রস্নেহ এবং গৃহধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় মধুর কর্ত্তব্য ফুটফুলের গন্ধময় সুকোমল মনের ন্যায় বিকশিত দেখিলাম।

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার পুত্রের অবস্থা শোচনীয়। জীবনের আশা অতি অল্প। গৃহকোণে একটি মৃদু বাতি জ্বলিতেছে, দ্বার প্রান্তে আমাদের বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য রামধন বসিয়া একটা ষ্টোভে দুধ গরম করিতেছে, এবং আমার প্রিয়তমার সুখদুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া চুলিতেছে; আমার স্ত্রী রোগক্লিষ্ট শিশুর মুখের দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া নিশ্চল ছবির ন্যায় বসিয়া ছিল। তাহার ম্লান মুখ ও নির্ব্যুজাগরণপাণ্ডুর নিরাশাকাতর চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় দুঃখে, অনুতাপে এবং বেদনায় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।—কিন্তু অদূরে টেবিলের ধারে বসিয়া বাতির আলোকে কে ঐ ভদ্রলোক এই গভীর রাত্রে একখানি বৃহৎ পুস্তকে সমাহিত-চিত্ত? আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য সংযত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, এ ভদ্রলোক আর কেহ নহে, আমাদের সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবু।

ডাক্তার আমার পদশব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় আপনার পুত্রের অবস্থা বড় মন্দ সংবাদ পাইয়া আমি চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি; সমস্ত রাত্রি সাবধানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, এখন অবস্থা অনেক ভাল। আপনার গৃহচিকিৎসক হরিচরণ বাবু আজ দুই দিন হইতে মফঃস্বলে আছেন। আপনার আগমনপ্রতীক্ষায় আর আমি বিলম্ব করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

আমি ডাক্তারের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। নতমস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; লজ্জায় আমার মস্তক মাটির সহিত মিশিয়া গেল। অবশেষে অতিসঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, আমি অনেকদিন আপনাকে চিনিতে পারি নাই, শতবার আপনাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, রাজদ্বারে আপনাকে বিড়ম্বিত করিবার ত্রুটি করি নাই, আজ এই মহৎ ব্যবহারে আপনি আমাকে সমুচিত দণ্ড দিয়াছেন; যে চিরদিন আপনার অশুভ কামনা করিয়াছে, তাহার পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপনার নিজের সুখ ও সুবিধার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি করেন নাই।" আমি একেবারে ডাক্তারের নিকটে আসিয়া উচ্ছ্বসিতভরে তাহার হাত দুখানি আমার উত্তপ্ত,

কম্পমান হস্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম, আমার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় আমার পুত্র 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইলাম, আমার পুত্রের শুষ্ক বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; আমার অভিমানিনী সাধ্বী পত্নী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অঞ্চলে তাহার অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, এবং বাহিরে দুর্য্যোগ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

তাহার পর আমি, আমার স্ত্রী এবং ডাক্তার, তিন জনে আমাদের ক্ষীণ কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় দ্বারসমাগত যমদূতগুলার সহিত প্রবল যুদ্ধ করিলাম; প্রত্যূষে জ্বরত্যাগে শ্রান্তরোগী শান্ত ভাবে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

প্রভাতে ডাক্তারের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, আকাশের কোথাও আর মেঘ নাই, প্রকৃতি স্থির, প্রভাতবায়ু সিক্ত ধরণীর শ্যামাঙ্গে আপনার অদৃশ্য কোমল অঞ্চল বুলাইয়া, বর্ষার ধারাপাতপরিতুষ্ট ললিত ধরণীকে দুলাইয়া, বৃক্ষশাখা কম্পিত করিয়া, নদীতরঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া, চপলা বালিকার ন্যায় লঘুপদক্ষেপে দিক্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; এবং তরুণ অরুণ পারদলক্ষ্মীর সীমন্তমূলে সমুজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত করিয়া আলোকতরঙ্গের সহিত ধরাতলে কুসুমকাননে, বিহঙ্গমকণ্ঠে, সুপ্তোত্থিত নরনারী প্রাণে নবরাগ, প্রমোদগীত, নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত করিতেছে। এই উষালোকপ্রদীপ্ত, শোভন সুন্দর সুরঞ্জিত শারদপ্রভাতে হৃদয়ের কৃত্রিমতা এবং অহঙ্কারের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া আমি নূতন করিয়া আমার উপেক্ষিত পারিবারিক কর্ত্তব্যের সহিত সনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইলাম; এতদিন যাহাদের শত্রুতা সাধন করিয়াছি, তাহাদিগকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলাম। গ্রামের বৃহৎ দলাদলি মিটিয়া গেল, এবং তাহার পর যদিও আমি প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করিতে পারি নাই, তথাপি আমার শত্রুদলের সহিত নিবিড় আত্মীয়তাস্থাপনের পুলকালোকে আমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতাপ্রিয়তা নিতান্ত অসার এবং তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অম্বা।

ধীরে ধীরে বনভূমে বহিছে যমুনা।
অতি ধীরে সায়াহ্নের কিশোর সমীর
কিশোরী কুমারী যত তরঙ্গিণী সাথে
একান্তে খেলিছে সব প্রণয়ের খেলা।
সুধীরে পশ্চিমনভে তমালের শিরে
সন্ধ্যার সুবর্ণ আভা যেতেছে মিশায়ে,—
পূরবেতে ঘনাইছে আঁধার গোধূলি।
বিদায়ের গান গেয়ে বনের বিহগ
নীড়ে ফিরিতেছে সরে মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বিজন অরণ্য-ছায়ে নিশাচর পশু
গুপ্ত গুহা তেয়াগিয়া হ'তেছে বাহির;
উঠিছে কানন-প্রান্তে ফেরু-কোলাহল।
জোনাকী আলোক-পাখা মেলিয়া আলসে
আঁধার-বধূর কেশে ফিরিছে উড়িয়া।
আকাশে জ্বালিছে দীপ দেবের বালিকা।
হেন কালে একদিন যমুনা-পুলিনে
অভাগিনী অম্বা আসি বসিলা নীরবে।
আলুলিত কেশরাশি মেঘরাশি প্রায়
ক্ষীণ কটিতটে তার পড়েছে লুলিয়া।
বন্ধুর বুকের পরে দুকূলের সাথে
দুরন্ত আরণ্য-বায়ু করে ছেলেখেলা,—
আধ আবরণ তাহে পড়িছে খসিয়া!
অম্বার নয়ন কিন্তু নাহি তার পানে।
কি গভীর শোকে তার কাঁপিছে হৃদয়,
থেকে থেকে উথলিছে গভীর নিশাস,
আঁখি দুটি অশ্রুজলে আসিছে পুরিয়া।
নীরবে আলেখ্য-লেখা ছবির মতন
কতক্ষণ অম্বা হেন রহিল বসিয়া,
কতক্ষণ পরে পুন অশ্রুজল মুছাবে
ধীরে ধীরে একবার মুছিলা নয়ন;
দুঃখের কাহিনী তার আরম্ভিলা শেষে।
"লো যমুনে! বলে পদে অম্বা বিষাদিনী।
কাশীরাজ-সুতা আমি, ত্যজি লোকালয়
আসিয়াছি তোর পাশে সান্ত্বনার আশে!
শুনেছি যমুনে! তুই বড় স্নেহময়ী।
বিরহ-বিধুরা বালা রাধা বিনোদিনী
হেথা আসি অশ্রু-আঁখি বসিত বিজনে,
তোরে শুনাইত যত প্রাণের বিলাপ।
তুই তার আঁখিজল দিতিস্ মুছায়ে,
শুনাতিস্ কানে কানে আশ্বাসের বাণী।
তাই সে আশার ভরে এসেছি হেথায়,
জীবন-কাহিনী মাগো শুনাইব তোরে।
প্রাণের পাষাণ-রুদ্ধ বিষাদের ভার
বিন্দু বিন্দু করি তোর কলির সলিলে।
গাসসমাপনে যবে যাইব ভাকিয়া
তরল স্নেহের কোলে ঘুমাইব সুখে।
"লো যমুনে! দেখ ভাবি, পড়ে যদি মনে
সুদূর সে অতীতের স্বপন-কাহিনী।
সেই সে তোমারি তীরে মধুর শৈশবে
তিনটি ভগিনী মোরা কত শত বার
আসিতাম করিবারে শৈশবের খেলা।
তিনটি তটিনী সম তিনটি ভগিনী
বন হ'তে বনান্তরে উপত্যকা-ভূমে
নাচিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে বেড়াতেম ভ্রমি!
স্মৃতির উজ্জ্বল পটে স্বর্ণরেখা সম
আজিও মা সেই কথা রয়েছে জাগিয়া।
আজিও জাগিছে মনে, ভ্রমি' বনে বনে
রাশি রাশি তুলি ফুল বসিতাম তীরে,

ফেলিতাম একে একে সুনীল সলিলে।
তরঙ্গের সঙ্গে তারা যাইত ভাসিয়া,
গাইতাম গান মোরা দিয়া করতালি!
কভু বা নগন-তনু নামিয়া সলিলে
যাইতাম পিছে পিছে ধরিবার আশে।
"এইরূপে গেল কাল, কাটিল বরষ,
কৈশোরের লীলা ক্রমে এল ফুরাইয়া।
যমুনে! সে সব খেলা, সে সব কাহিনী,
আজি এ দুর্দ্দিনে অম্বা পারে কি ভুলিতে?
আজি হেন মনে হয় মুহূর্ত্তের খেলা
মুহূর্ত্তেই যদি, হায়, না যেত ফুরায়ে,
এ যৌবন তেয়াগিয়া পুন এ অভাগী
যদ্যপি ফিরিত সেই শৈশবের দেশে।
"কৈশোর তেয়াগি যবে প্রথম যৌবনে
ধীরে ধীরে অভাগিনী করিল প্রবেশ,
কত যে অজ্ঞাত সুর, অজ্ঞাত সঙ্গীত
একেবারে এ পরাণে উঠিল বাজিয়া,
কাজ নাই সে সকলে করিয়া স্মরণ।
যাদ্যের সারল্যময় তরুণ স্বপন
কি কুহক-আবরণে হ'ল আবরিত;
কি এক উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন আশা
হায়ার মতন প্রাণে উঠিল ভাসিয়া।
কে যেন বসিয়া দূরে বিজন পুলিনে
মধুর বচনে মোরে ডাকিত সতত,—
কানেতে বাজিত তারি বাঁশরীর ধ্বনি।
মন যেন তারি তরে বেদনা-ব্যাকুল
অন্বেষিতে দিশি দিশি হ'ত ধাবমান;
তারি পদতলে গিয়ে চাহিত লুটাতে!
যমুনে! কেন যে সদা অম্বা উদাসিনী
একাকিনী আসি তোর বসিত পুলিনে,
কভু বা চঞ্চল-আঁখি চপলা হরিণী
নিবিড় নিকুঞ্জ ছায়ে করিত ভ্রমণ,
তুই কি কখনও তাহা ভাবিতিস্ মনে?
"এইরূপে শূন্য প্রাণে পুষিয়া স্বপন
কেটে গেল যৌবনের কতক দিবস।
গোপন না রহে আর প্রাণের উদাস,
সখীরা বুঝিল মোর হৃদয়ের দশা।
দুখে দুখী অশ্রুমুখী ভগিনী দু'জন
জানিতে চাহিত সদা প্রাণের বাসনা;—
কি বলিবে কালামুখী, বুঝিত না কিছু,
আপনারে হ'ত লাজ আপনার লাগি!
উদাস হৃদয়ে মোর ভুলাইতে ভুলে
দিবানিশি কত তারা কবিত প্রয়াস,
প্রত্যহ নূতন গান করিয়া রচনা
কলকণ্ঠে অভাগীর চালিত শ্রবণে,
প্রত্যহ খেলিত নব প্রমোদের খেলা।
যমুনে! সকলি হ'ত শুধু ছেলেখেলা,
বাহিরে অঙ্কিত পড়ি বাহিরের গান,
হৃদয়ে অঙ্কিত সেই ছায়ার স্বপন।
"একদিন অবশেষে সন্ধ্যা-সমাগমে
বসন্ত-বধূর দেহ পরশি সুধীরে
কাননে বহিছে যবে মৃদু সমীরণ,
উদিছে পূর্ণিমা-শশী দূর তরুশিরে,
বন-বিহারেতে মোরা হইনু বাহির।
যমুনে লো! সে দিনের অপূর্ব্ব কাহিনী
মুহূর্ত্তেরও তরে অম্বা পারেনি ভুলিতে,—
জন্মজন্মান্তরে বুঝি ভুলিবে না কভু।
একাকী দাঁড়ায়ে তোর তীরতরুতলে
কে জানে ভাবিতেছিনু কোথাকার কথা।
সহসা পশ্চাতে মোর বন-অন্তরালে
কার মৃদু পদধ্বনি করিনু শ্রবণ।
চকিতে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে চাহিনু
একেবারে হ'য়ে গেল নয়নে নয়ন।
দেখিনু পুরুষবর,—হিমশৈল-শিরে
প্রভাতের দীপ্তকান্তি প্রভাকর সম।
কে জানে মা পোড়া লাজ গিয়েছিল কোথা,
কালামুখী আঁখি মোর ফিরিল না আর,
বিবশ বিহ্বল হেন রহিল চাহিয়া।

কতক্ষণ পরে পুন মুখরি' আপনা—
সমুখে সে আবে আর নারিনু গাহিতে ;
ধীরে ধীরে নত চক্ষে সমর্পণ দিয়া
দিনু হৃদয়-যন্ত্র বিকাশের চরণে।
অবশ্য তেমনি যবে প্রবেশিনু গৃহে—
লজ্জা আসি কণ্ঠে মোর রুধিল দুয়ার।
তবু অতি সন্তোপনে করিয়া সন্ধান
হৃদয়-চোরের মোরে পেনু পরিচয়।
পাঠাইনু প্রেম-দূতী, লিখিনু লিখন,—
'এস তুমি নবরাজ! আপনি বরিয়া
তোমারে করিনু আজি যৌবনের রাজা।'
এইরূপে অকস্মাৎ জীবন-প্রদেশে
প্রেমের প্রভাত রবি পাইল প্রকাশ—
উজলি' যৌবন-বন সোনার কিরণে।
এইরূপে সেই দিন মানস-সরসে
প্রথম প্রেমের পদ্ম উঠিল ফুটিয়া,—
স্বপ্ন মোর সত্যরূপে দেখা দিল আসি।
শুভ কি অশুভ সেই প্রথম চাহনি
এইরূপে বক্ষে মোর করিল আঘাত,
হৃদয়ের দিশি দিশি উষাটিল তাহে!
"বসুন্ধরা—বুঝিতে তুই পারিবি রহস্য
প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে পুন সে কাননে
কি আশা-হৃদয়ে লয়ে যে ছুটিল অভাগী।
ভেবে দেখ, কি আগ্রহে কিসের লালসে
প্রাণ তোর-ধায় সদা দুর সিন্ধু পানে!
"মাথার উপরে মোর দু' খানিটি তারা
নিদ্রিত পল্লববক্ষে যেতেছিল দেখা।
প্রদোষের অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের কিরণ
সরল সোহাগভরে ভূতলে আসিয়া
শুয়েছিল পথপ্রান্তে অন্ধকার কোলে।
নীরব সে বনপথ, নীরব গোধূলি ;
শুধু মোর হৃদয়ের স্পন্দনের ধ্বনি
কাননেরে বাজিতেছিল গানের মতন।
ধরা দিল তনু মোর ? নিশীথ শয়নে
স্বপন-সাথীর মৃদু পরশ সমান
অধরে সে কা'র স্পর্শ হল অনুভব ?
কে জানে যমুনে। এই গোড়া আঁখি মোর
দিনু দুই অশ্রু কেন নারিল বারিতে।—
কপোল গোলাপে তা'রা আসিত অমনি
চুম্বন-অঞ্চল-কণা গেল শুকাইয়া!
"তা'র পরে কত সন্ধ্যা মিলিনু দু'জন।
কভু ধীরে আধ কথা ফুটিত অধরে,
কভু বা মিশিয়া যেত চুম্বনের সাথে।
অবশেষে অভাগীর অদৃষ্ট আকাশে
বিষাদের ঘন মেঘ উদিল আসিয়া,—
কাল বিদায়ের কাল হ'ল উপনীত।
সেই সে বিদায়-ক্ষণে, অধরে অধর,
চিরপ্রেম-ডোরে মোরে হৃদয়ে বন্ধন,
নিশান্তের স্বপ্নসম-চলি গেলা বীর।
কে জানিত সেই হবে অন্তিম বিদায়?
কে জানিত সে দিনের সেই শশী সনে;
অস্তার পশ্চিম শশী হ'ল অস্তমিত?
প্রথম মিলনমোহে, প্রথম উল্লাসে,
ভেবেছিনু এইরূপে যাবে চিরদিন ;
ভেবেছিনু সে সুখের সমুদ্র-মাঝারি
সমস্ত জীবন তরি বাহিবে তরণী,
তবু তার সীমা বুঝি পাব না খুঁজিয়া।
কে জানিত সখি; হায়, হবে মরীচিকা?
কে জানিত, দু'দিনের হাসির মাঝার
সার্দ্ধ জীবনের অশ্রু ছিল লুকাইয়া?
"বিরহীর মরুময় নরকের মাঝে
দুরাশা বসিয়া নিজ অনল-আসনে,
বহুকাল বরষিল বিষের নিশাস।
অবশেষে উপজিল দারুণ সংশয়,—
ভাবিলাম, বসন্তের বিলাসী মধুপ,
ক্ষণিকে মিটায়ে বুঝি ক্ষণিকের আশ—

নবমুকুলিকা আশে গিয়েছে উড়িয়া!
হৃদয় হইল কালো অভিমান বিষে!
সুপ্ত এক আশা পরে উঠিল জাগিয়া।
মহাসমারোহে পিতা তিন-কন্যা লাগি
সার্ব্বভৌম স্বয়ম্বর করিলা ঘোষণা।
আশার ছলনে ভুলি' ভাবিনু অভাগী—
বিরহ-হিমানী-অন্তে বসন্ত আমার,
প্রেমের বকুল-ফুল-ফুটাইল বুঝি!
যমুনে-লো! শুনিবি কি কেমনে সে-আশা
দারুণ হতাশরূপে দহিল আমায়?
হায় মা! জানিনে হেথা কেন আসি মোরা,
জানিনে জীবন-ল'য়ে কা'র হেন খেলা,
জানিনে মৃত্যুর পরে কি হ'বে কোথায়,—
জানি শুধু, ভবিষ্যের অন্ধকার গৃহে
মানুষের আঁখি কভু পশিত যদ্যপি
নিমেষে জনম লভি' নিমেষের জীব
নিমেষে ভবের খেলা ফেলিত ঘুচায়ে!
"কি বর্ণির স্বয়ম্বর? শিহরে হৃদয়
এখনও স্মরিলে সেই স্বয়ম্বর-কথা!
ইন্দ্রপুরী-সম সভা, হায় মা! সহসা
ভীষণ প্রলয়-দৃশ্যে হ'ল পরিণত!—
চমকি' আতঙ্কে আমি হারানু চেতনা।
যখন ভাঙ্গিল মোহ, মেলিয়া নয়ন
দেখিনু বসেছি এক রথের উপরি;
দুই পাশে বসি মোর ভগিনী দু'জন।
সম্মুখে হিমাদ্রিসম ধনুর্ব্বাণ হাতে
বীর সাজে যোদ্ধা এক আছে দাঁড়াইয়া।
অগণ্য রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রথে
পিপীলিকাশ্রেণীসম ঘেরিয়াছে তারে।
"জলদগম্ভীর বাণী শুনিনু শ্রবণে,—
'শুন কাশীরাজ, শুন নৃপতি-সমাজ!
ভাবিও না ভীষ্মদেব এতদিন পরে
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তার গিয়েছে ভুলিয়া।
বিচিত্র বিচিত্রবীর্য্য, প্রিয় ভ্রাতা মোর,
তা'রই লাগি ক্ষত্রধর্ম্ম নীতি অনুসরি
এ তিন রমণী আমি করিনু গ্রহণ।
লহ সাজি, লহ রণ, যথা অভিলাষ,—
একা ভীষ্ম সবে আজি জিনিবে সমরে।'
"ইঙ্গিতে তুমুল রণ উঠিল বাজিয়া।
দেখিলাম মদ্ররাজে সম্মুখে সবার;
অযুত নৃপতিবৃন্দ ধাইছে পশ্চাতে।
কে আঁটে ভীষ্মেরে রণে? ক্ষণেক যুঝিয়া
ভঙ্গ দিলা বীর সব, অম্বার হৃদয়ে
অন্তহীন-অশ্রু উৎস হ'ল উৎসারিত।
"তখন সম্বরি' লাজ শান্তনু-তনয়ে
জানানু বেদন, অন্তর্যামী হেরি মোরে
বর্জ্জন করিলা বীর। নব আশাভরে
ভেটিলাম হৃদয়ের নাথে। কিন্তু, হায়,
যে অশনি সম বাণী শুনিনু সে মুখে,
যমুনে মা! কেমনে তা' শুনাইব তোরে?—
'অসতী,—অসতী অম্বা,—অন্যের গৃহীতা,
শাল্বের হৃদয়ে আর নাহি তার ঠাঁই!'
ধরিলাম পদযুগ, কহিনু কাঁদিয়া,—
'হা নিষ্ঠুর! পুরুষের এই কি হে রীতি?
মনে কি পড়ে না, সখা, সেই নবালোকে
মধুর বেদনা-ভরা বিদায়ের ক্ষণে
চুম্বনে চাপিয়া কি যে কহেছিলে কথা;
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন-চাতুরী?
পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম-আচ্ছাদন?
অসতী, অসতী আমি! এ বক্ষ বিদারি'
মরমের মাঝে যদি পারিতে পশিতে,
গৃহ-দেবতার মত দেখিতে সেথায়
কার প্রেমমূর্ত্তিখানি রয়েছে জাগিয়া;—
দেখিতে কে মোরে, হায়, করেছে অসতী!
ভালবাসা কি গো সখা, শুধু ছেলেখেলা?
ক্ষণস্থায়ী পিপাসার ক্ষণিক তর্পণ?
দাবানল জ্বলে নাকি মর্ম্ম মাঝে তা'র?
বুক তা'র ফাটে নাকি চিরতৃষ্ণা-ভরে?

নাহি চাও, ক্ষতি নাই ; শুধু বলে দাও,
সিন্ধু আসে যে তটিনী এসেছে ছুটিয়া,
কি হ'বে নির্দ্দয় যদি নাহি চায় তারে ?
বল, সখা, উজানে সে নহিবে কোথায় ?
যমুনে ! কিছুতে মন গলিল না তাঁর,
ডুবিয়া অতল জলে মরিব অভাগী।
"যমুনে মা ! মরি নাই, মরিব না একা।
যতখানি ভালবাসা ছিল এ পরাণে
ততখানি হিংসানল উঠিল জ্বলিয়া।
যে ঘালিল সে অনল চিতানল সম,
অহস্তে সাধিব আমি নিধন তাহার ;
ভীষ্ম-বধ, ভীষ্ম-বধ প্রতিশোধ মোর।
"প্রচণ্ড পরশুরাম, পরশুর ধার,
তারই পদতলে গিয়া পড়িল বাসিনী ;
জানাইয়া মর্ম্মব্যথা, করি আরাধনা
পলাইল পরশুর পরশু লভিয়া।
মরণ-সংগ্রামে ভীষ্মে করি আরোহণ
দাঁড়াল পরশুরাম, দাঁড়াল বাসিনী
সচক্ষে দেখিতে ভীষ্ম ভীষ্মের নিধন।
কিন্তু, হায়, চিরদুষ্ট অদৃষ্ট আমার !
কোথা হতে কা'রা আসি দাঁড়াইল মাঝে,
সাধিতে না দিল রামে, ভীষ্মে বুঝাইল ;
প্রণয়-মিলনে যেন ভঙ্গ দিলা রণে।
হায় বিধি ! সেই সব শির লক্ষ্য করি
কেন না হানিলে তব তীব্র বজ্রানল ?
কেন না হানিলে বজ্র অম্বার এ শিরে ?
"যমুনে মা ! মরি নাই, মরি নাই তবু।
যমুনে মা ! মরিব না, মরিব না একা।
শোন তবে এ বাসিনী কি করিল শেষে।
সুদূর উত্তরে আছে ভীষণ গহন,

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কার্লাইল।

ভিন্ন ভিন্ন রুচির সমালোচকগণ কার্লাইলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কেহ কার্লাইলের দোষবিশেষের অতিরঞ্জনে ব্যস্ত; কেহ বা কার্লাইলকে সেক্‌স্‌পীয়র ও হোমরের সহিত তুলনা করিয়া প্রশংসাবাদের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে স্থাপন করিয়াছেন; আবার গুণবিশেষের অভাব-নিবন্ধন তাঁহাকে নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের মতে কেবল দোষানুসন্ধিৎসা ও শেষোক্ত প্রকারের স্তুতিবাদ, উভয়ই ভয়াবহ। কার্লাইলের ওজস্বিনী ভাষা, আদর্শোপলব্ধি, গভীর চিন্তাশীলতা, ও হাস্যোদ্দীপক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। কার্লাইলের আদর্শ (Ideal) অতি উচ্চশ্রেণীর। কেবল চিন্তোপলভ্য, অবাস্তব আদর্শ লইয়া থাকিলে, সেই আদর্শের তুলনায়, যাহা কিছু বাস্তব, তৎসমস্তই আকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কার্লাইলের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার মনে আদর্শের যত বিকাশ হইতে লাগিল, ততই পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয় সম্বন্ধেও, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ পদার্থের উপরই তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কখন ঘৃণা, কখনও বা উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহা হইলেও, তাঁহার আদর্শের বিষয় মনে রাখিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ ও আন্তরিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা নিম্নে কোন সহযোগীর কার্লাইল সম্বন্ধীয় একটি সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কার্লাইল সম্বন্ধে ভ্রান্তি-বারণা।

লেখক বলেন যে, সপ্তদশবর্ষ মাত্র কার্লাইলের মৃত্যু হইলেও এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই শুনা যায় না। সাহিত্যে কার্লাইলের স্থান, মানবজাতির শিক্ষয়িতৃগণের মধ্যে তাঁহার আসন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল তর্কবিতর্ক তাঁহার জীবদ্দশাতেই একরূপ সীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল। এক দিকে অতিরিক্ত নিন্দা অপর দিকে অযথা স্তুতিবাদ উভয়ই কার্লাইলের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ফ্রুডের Reminiscences প্রকাশিত হইবার পর হইতেই কার্লাইলের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া আসিয়াছে। কার্লাইলের পরিণত বয়সের রচনা যে তাঁহার যৌবনের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, Reminiscences তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কার্লাইলের অবনতির হয় ত অবধি থাকিত না কারণ একবার ভাঁটার টান পড়িলে তাহা ফিরান সহজ নহে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে কার্লাইলের পত্নী ও জীবনবন্ধু জেন বেলি ওয়েলশের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অসাধারণ মহত্ত্বের কথা শুনিয়া জনসাধারণ কার্লাইলের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ফ্রুডের আলেখ্যে কার্লাইল যেরূপ অর্দ্ধ আলো

অঙ্গে অন্ধকারের মলিনতার চিত্রিত হইয়াছেন, হয়
দোষদর্শনপূর্ণ আজকাল অত্যন্ত প্রবলতা। কিন্তু কার্লাই
তাঁহাকে ধর্ম্মবিদ্বেষী, বস্তুসর্ব্বস্ব, ইংলণ্ডের নীতির অ
প্রতি যে সকল তীব্র দোষারোপ করা হইত তাহা নিত্য
ঘৃণামিশ্রিত সহানুভূতির সহিত, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ক
না। এই সমস্ত অপবাদ যে কার্লাইল নিজেই আপন
সন্দেহ নাই। তাঁহার কল্পনার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বে
গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রৌঢ়দিগের অবশ্য মনে থাকি
যখন কার্লাইল লেখনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হইত
তাহাতে সন্দেহ থাকিত। তাঁহার যৌবন-বসন্তের
সাহিত্যোদ্যানে চিরপ্রফুল্লতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া
কার্লাইলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাও শ্লাঘ্য মনে করিতেন
দেশের জন্য স্বপ্ন ছিল। এই সময়ে যদি তিনি সাহিত্যে
এই সকল প্রশ্ন যাহাদের বিরুদ্ধে, ক্ষুদ্রশফরীবৎ সমালোচ
তিরস্কার করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। আমরা নি
কোন সমালোচনা, এমন কি, তাঁহার রাজনৈতিক মতে
সধ্যে বিন্দুমাত্রও সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। নগণ্য সম
সমালোচনা করেন, তাহাতে বোধ হয়, যেন কার্লাই
বাস্তবিকই যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের অত
জন সাধারণের মনে স্থান পায় নাই, এবং যাহা ভবিষ্য
আশঙ্কাও নাই, তাহা লইয়া তাঁহারা আর বৃথা বকিয়া
যে, ঐ সকল সমালোচকগণ কার্লাইলের রচনার যে অ
তাঁহারা নিজেই বিশ্বাস করেন না।

লেখক কার্লাইলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মতে
প্রথম, তাঁহার Gospel of labour কার্লাইলের হিসা
লোকশিক্ষামূলক নূতনা কিছু সন্নিবিষ্ট
কর্ম্মবাদ। নামের যোগ্য নহে। কার্লাইলের Gosp
"ইহজগতে কর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কর্ম্ম কা
দিন নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন প্রদলিত করিয়া কর্ম্ম
কার্লাইল এত পুনঃ পুনঃ এই উপদেশের উল্লেখ করিয়া
পড়িয়াছে। কিন্তু কার্লাইল জানিতেন যে, কতকগুলি
থাকে যে, লোকে তাহার উপকারিতা অনুভব করিতে
বিশেষভাবে এইগুলির সফারি করিতে হইলে খুব জলন্ত

যে উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক স্বীকার করিবেন যে, তাহা অতীব মহৎ। সমগ্র কর্ম্মক্ষম জনসমাজকে এক কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য কার্লাইলের যে ব্যগ্রতা ছিল, তাহা আন্তরিকতাপরিপূর্ণ। Latter day Pamphlet-এর অনিন্দ্য ভাষা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ সত্যগুলির মূল্য কিছুতেই হ্রাস করিতে পারিবে না।

রাজনীতি সম্বন্ধে কার্লাইলের মূল এক কথায় এই,—"প্রকৃত শাসনক্ষমতিনের হস্তে সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক।" কার্লাইল বলেন যে, "আমাদের ইচ্ছা যে শাসনকর্ত্তার ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইবে, এবং যাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের কল্যাণ সংসাধিত হবে, পৃথিবীতে তিনি মহৎদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শাসনকর্ত্তা। অধিক উপকারক্ষম। যিনি আমাদের নিয়ামক, যিনি নানাপ্রকার বিদ্যা বিস্তার করিয়া আমাদিগের কল্যাণসাধন করেন, তিনি সমস্ত আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবের মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত; তাঁহাকে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় 'রাজা,' 'নিয়ামক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী ভাষার নামটি অতি কতব অর্থদ্যোতক; King অর্থাৎ 'দক্ষলোক'।

কার্লাইলের Hero Worship বা 'মহদর্চ্চনা উপরিউক্ত মূর্ত্তি বা উপদেশের ভিত্তির উপর গঠিত। এ মতের পোষকতায় কার্লাইলের শিষ্যগণ অধিক দূর গুরুর অনুসরণ করিতে পারেন না, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি সমাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত কোন শক্তি ক্রিয় না করিত, তবে সমাজ বন্ধনশূন্য নিয়মবিহীন জনসমষ্টিমাত্রে পরিণত হইত। এই শক্তিই এক বা তদধিক ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়; কার্লাইলের মতে, এই শক্তির নিয়ন্তৃদিগের প্রতি, ভক্তি না হউক, সম্মানপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

যে সময় Hero and Hero Worship প্রকাশিত হয়, তখন কার্লাইলের মনে তাঁহার রাজনৈতিক মত পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং ইহাতে তখন অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল। কিন্তু Latter Day Pamphlets ও Frederick the Great প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই ভ্রম আরও বাড়িতে লাগিল, এবং তাঁহার মতও যেন নানা প্রকারে বিকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কার্লাইলের রাজনৈতিক মত। সমস্তই যে দোষাবহ ও পরিবর্জ্জনীয়, এমন হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন না। তাঁহার প্রচারিত মতে অনেক ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন দেশকালাবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মতের বৈষম্য ও ত্রুটী সকল স্পষ্টই বুঝা যায়, কেবল দোষানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যের এবং সেই সত্যের প্রকাশক কার্লাইলের, সম্মান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

কার্লাইল সাধারণতন্ত্র রাজ্যের নিতান্তই দোষ গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রকৃত মত এবং আজকালকার উদারনৈতিকদিগের উদ্দেশ্য একই প্রকার। তবে যদি শেষোক্ত সম্প্রদায় বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের মতই অধিকতর যুক্তি-অভিজাততন্ত্র। সঙ্গত, তাহা হইলেও কার্লাইলের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তাঁহারাও উপকার পাইতে পারেন। কার্লাইল বলেন যে "প্রকৃত বীরত্বই ইংলণ্ডের লর্ড[illegible]র সৃষ্টির

উপাধিধারণ কিন্তু এদেশে ব্রেডলের প্রবর্ত্তন হইতে এই গুণটির তিরোধান হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহার বাহুল্যের পূর্ব্বভাগে হইতেই, কোনও গুণ না থাকিলেও অর্থভাগ্য ও কুটুম্বভাগ্য দেখিয়াই, লর্ড উপাধি বিক্রীত হইত। তাহার ফলে, আমাদের "লর্ড" মহাত্মগণ বাজারের পিত্তলমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাহিরে মলেই চাকচিক্যশালী, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। অবশ্য, কার্লাইল বহুপূর্ব্বতন লর্ডদিগের গুণগরিমা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়াছেন, এবং আধুনিক সকল জিনিসের উপর বিরক্তি-বশতঃ বর্ত্তমান লর্ডদিগের কিছু অধিক নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কার্লাইলের উদ্দেশ্য দেখিতে গেলে, ইহাতে কেবল দোষ দেখিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কার্লাইল অভিজাততন্ত্র শাসন (Aristocracy) বলিতে সর্ব্বোৎকৃষ্টদিগের কর্ত্তৃক শাসন বুঝিতেন; যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান এবং প্রজাধর্ম্মী, তাঁহাদিগকে উন্নীত করিয়া দাও,—তাঁহারা আমাদিগকে শাসন করুন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমরা নিকৃষ্ট ও অনুপযুক্তদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছ। অনেকে বলেন, লর্ড ব্রিকনফিল্ড কার্লাইলের মতানুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে অতি সামান্য সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয় না। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই লর্ড বিকনসফিল্ডকেই কার্লাইল তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছিলেন।

কার্লাইল যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রকৃতিরঞ্জনাৎ রাজার আদর্শ দিয়াছেন, বাস্তবিক তেমন আদর্শ মিলিয়া উঠা দুর্ঘট। পরন্তু তাঁহার প্রকৃত আদর্শ রাজার পরিবর্ত্তে তদ্রূপ কোন কৃত্রিম আদর্শ সংস্থাপন করাও বিপজ্জনক। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ রাজার আদর্শ আদর্শ রক্ষা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার অভীষ্ট আদর্শ শাসনকর্ত্তা না পাওয়া গেলেও ঐরূপ আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে আমরা অনায়াসে 'প্রকৃত' হইতে 'কৃত্রিম' পৃথক করিতে পারি। অবশ্য, আদর্শ শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধে কার্লাইল যেমন নিরাশ হইয়া গিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যও সেইরূপ; কিন্তু তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে। "Latter-Day Pamphlets"এর এক স্থলে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কথা বলিতে বলিতে কার্লাইল বলিয়াছেন যে, "পার্লেমেণ্ট যতদিন কেবল বাক্যযন্ত্রমাত্র থাকিবে, ততদিন ইহার সহস্র উৎকর্ষ হইলেও, তাহাতে কোন জাতীয় উপকার সাধিত হইবে না। ইংলণ্ডের সমস্ত পরিশ্রম, শক্তি, মান, গৌরব, কার্য্যকুশলতা ব্যয় করিয়া ও কায়মনে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আরাধনা করিয়া বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে ১২ জন, ১০ জন, অভাবপক্ষে ৬ জন প্রকৃত শাসনকর্ম্ম লোক কি মিলে না?" Latter Day Pamphlets কার্লাইলের মতের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করা বোধ করি ঠিক নহে। তিনি যে বাক্যবন্ধ বলিয়া পার্লেমেণ্টের নিন্দা করিয়াছেন, অনেক সময়ে প্রকৃত কর্ম্মযন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার উপায়স্বরূপ বাক্যযন্ত্রের সাহায্য আগে চাই। কিন্তু "আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে সমস্ত দিয়াও অন্ততঃ ৬ জন প্রকৃত শাসনকর্ত্তা আবশ্যক হইয়াছে", এ বিষয়ে কার্লাইলের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কার্লাইলের সমস্ত গ্রন্থই প্রজাতন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং তৎসম্প্রদায়ের সমর্থন আমাদের

অভিপ্রেত নহে। তবে কার্লাইলের প্রতি এক সম্প্রদায়ের অসম্মানসূচক অভক্তি দেখিলে আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। কার্লাইলের প্রচারিত কতকগুলি শেষ কথা।

সত্য আমরা ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহার অনেক বিষয় চিরকাল নিত্য সত্য ভাবে পৃথিবী মনে রাখিবে। যদি ইংরেজেরা কার্লাইলের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা করিত, এবং কার্লাইলের উপদেশানুযায়ী স্বদেশহিতৈষী হইতে পারিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজ তাহারা আপনাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি নেতৃগণের অসৎপ্রকৃতিজনিত অনেক অপমান ও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইত। তাঁহার উপদেশগুলি স্বতঃই কেমন সারগর্ভ! বর্ত্তমান সময়ের কেমন উপযোগী। উপসংহারে তাঁহার শেষ-সময়ের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—"আমি শুনিয়াছি, ইংলণ্ডের গৌরব (Prestige) নাকি মহাদেশে এখন আর অক্ষুণ্ণ নাই; ইহাতে সম্পাদক মহাশয়েরা আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি ত আক্ষেপের বিষয় কিছুই দেখি না। গৌরব ব্যাপারটি হ্যাম্লেট বাক্তির ন্যায়। দরিদ্র ইংলণ্ডের খুব ভাল সময়েও যে 'মহাদেশে' তাহার এই গৌরব কোন দিন ছিল বা কখনও তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, তাহা ত আমি জানি না।"

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভোটান।

ভোটান আমাদিগের আবাসস্থান বঙ্গদেশ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই অনধিগম্য দেশাংশ আমাদিগের নিকট "চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান" হইতেও অধিক অপরিচিত। কারণ সেখানে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে, সেখানে ভ্রমণকারীর জীবন নিরাপদ নহে, সেখানকার অসভ্যতার উৎপীড়ন বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ভোটান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

কলিকাতা হইতে ন্যূনাধিক ৩২০ মাইল ভ্রমণের পর আমরা এক অদ্ভুত রাজ্যে উপনীত হই। তথায় ভূখণ্ডে রাজ্যপালন যুগিত; নরহত্যা, উৎপীড়ন ও রাজদ্রোহ নিত্য ঘটনা, দাসত্বপ্রথা অবাধে প্রচলিত। বঙ্গদেশের অতি সন্নিকটেই এই দেশের নাম কি? সকল বিদ্যমান। এই অদ্ভুত দেশ ও তথাকার উচ্ছ্বাস অধিবাসিগণের বিবরণ আমরা প্রায় কিছুই অবগত নহি। এমন কি, আমরা ইহার নাম যথাযথরূপে লিখিতে জানি না। লেখক বলেন, স্যর উইলিয়ম হণ্টারের প্রচলিত মতানুসারে ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "ভুটান" নাম ভ্রমাত্মক। বোত শব্দ হইতে উক্ত নামের উৎপত্তি। "বোত" শব্দে তিব্বতীয়েরা স্বদেশকে নির্দ্দেশ করে। ইহা লাডক ব্যতীত সর্ব্বত্র ভোট অথবা ভোণ্ড উচ্চারিত হয়। ইহার যথার্থ নাম ভোটান।—এই নাম ভোটের অর্থাৎ তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশ বুঝাইবার জন্য প্রথমে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। ভুটীয়ারা স্বদেশকে ড্রুকযুল অথবা ধর্ম্মযুল বলে। তিব্বতীয়েরা ইহাকে লোযুল ভ্রু সিকিমের লেপচারা এক বলে। "ভোটান"ই প্রকৃত উচ্চারণ—"ভুটান" নহে।

লেখক যে সকল মূল হইতে তাঁহার প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি নীরব। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভোটানে রাজকার্য্যে দুইবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী হইতে তদ্দেশীয় ভৌগোলিক তথ্য অথবা মানবপ্রকৃতির কোনও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু যে সকল কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারী দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক এই দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতীয় জরিপ-বিভাগের যে সকল এদেশী কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রোজনামচা ও পথবিবরণীতেও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিবরণ সাধারণের গোচর হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক এই সকল বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

পূর্ব্বপশ্চিমে ভোটানের দৈর্ঘ্য ১৮০ মাইল ও প্রস্থ ৮০ মাইল মাত্র। ইহার অধিকাংশ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন। মধ্যে কতকগুলি সুজলা উপত্যকা আছে। সেই সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলস্রোতগুলি ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রধান নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা। দেশের ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু রাজ্যশাসনের বিশৃঙ্খলা ও অধিবাসিগণের অত্যধিক লুণ্ঠনপ্রবণতায় ইহা বন্যজন্তু নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ। সিমলা শৈলের শস্যহীন ভীষণ দৃশ্য হইতে ইহা অনেকাংশে বিভিন্ন। পার্শ্বগাত্রে বিশাল বরফশ্রেণী উন্নতমস্তকে আকাশের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। কর্ষণহীন সমভূমি অনাবশ্যজাত তৃণগুল্মে সদা শ্যামলা। আকৃতিক দৃশ্যে হিমালয়ের এই অংশ বড় সুন্দর ও পথিকের নয়নানন্দদায়ক। সিমলায় জলকষ্টের অন্ত নাই; পর্ব্বতপার্শ্ব গভীর অন্ধকার শুভ্র সূত্র জলরেখা কদাচিৎ সূর্য্যালোকে পথিকের নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে পর্ব্বতগাত্র হইতে সর্ব্বত্র অসংখ্য ঝরণা নামিয়াছে। তাহাদের অবিরাম পতনশব্দে সমস্ত দেশ সর্ব্বদা মুখরিত। ঝরঝর শব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেই নয়নসমক্ষে একখানি চারুচিত্র আবির্ভূত হয়। রবিকরে জলরাশি হীরকের মত দীপ্তি পাইতেছে।

ক্ষেত্রজাত উৎপন্নের মধ্যে চাউল, গম ও বার্লি প্রধান। উন্নতপর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এক প্রকার নিকৃষ্ট বার্লি জন্মে। বপনের দুই মাসের মধ্যেই তাহা সুপক্ক হইয়া উঠে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে বীজবপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে হলকর্ষণাদি আবশ্যক হয় না। কঠিন জমির উপর বীজ ছড়াইয়া একবারমাত্র হলকর্ষণ করিলেই যথেষ্ট। দেশের সর্ব্বত্র নানা-জাতীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা রন্ধনান্তে বা বিনা রন্ধনে ভক্ষিত হইয়া থাকে। আলুর চাষও অনেক স্থানে আরব্ধ হইয়াছে। কোন কোন প্রশস্ত উপত্যকায় পশুপালন সাধারণের প্রধান জীবিকা। পশ্চিম ভোটানে অ, মুচু ও ওয়াচু নামক স্থানদ্বয়ে ইহা অধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পালিত পশুগণের মধ্যে ভারতীয় গো ও মিশ্রজাতীয় ইয়াক প্রধান। তাহারা আকারে বড় ও যথেষ্ট দুগ্ধ প্রদান করে। দুগ্ধ হইতে প্রচুরপরিমাণে নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা দেশের সর্ব্বত্র ঘৃতরূপে ও মন্দিরে পূজার্থ ব্যবহৃত হয়। এখানে শিকারোপযোগী বিস্তর পশু দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয়েরা পশুহননে বিরত, কিন্তু বন্য-

পশুবধে কাতর নহে। সুতরাং গণ্ডার, বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, নানাজাতীয় চিতা, বৃহৎ বন্যছাগ, কস্তুরীমৃগ ও অন্যান্য পশুর শিকারে শিকারী প্রচুর আমোদলাভ করিতে পারেন, তাহাতে দেশবাসিগণেরও উপকার হয়।

দেশের শাসনপ্রণালী অনেকাংশে তিব্বতের ন্যায়,—ইহাকে আংশিক 'দেবতন্ত্রীয়' বলা যাইতে পারে। দেশীয় বিভিন্ন সর্দ্দারেরা একজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের অধীনতা স্বীকার করে। এই সকল সর্দ্দারেরা এক প্রকার স্বাধীন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় শাসনপ্রণালীর ব্যারণদিগের সহিত ইহাদের শাসনকার্য্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দেশের প্রধান পুরোহিত ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি অতি ঐতিহাসিক যুগে জীবিত ছিলেন ও "সাবড়াং নগাগওয়াং নামগ্যাল" নামক বীরের অবতার। ইনি চল্লিশ বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু সহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ গোলাপের ন্যায় লোহিত ও পদ্মগন্ধী। তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ, তদ্রচিত গ্রন্থাবলী ও তন্নির্ম্মিত বেদু প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হয়, তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উচ্চ স্থল সর্দ্দারেরাই দেশের প্রকৃত রাজা। সমস্ত দেশ নয়টি বিভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক বিভাগে একজন সর্দ্দার আছে। তাহারা স্বেচ্ছামত স্বাধিকারের শাসন ও অবসরমত পার্শ্ববর্ত্তী বিভাগের লুণ্ঠনে সময় ক্ষেপ করে। স্বাধিকারসমুদ্ভূত পণ্যদ্রব্যে তাহারা অত্যধিক শুল্ক আদায় করে। একে ত প্রতিপদে জীবননাশের সম্ভাবনা; তদুপরি এই অত্যধিক শুল্কে বাণিজ্যব্যবসায় যে অতি সঙ্কুচিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধলেখক ইহাদের দৈহিক বল ও গঠনের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা আকারে দীর্ঘ ও সুগঠিত। তিব্বতীয়গণ অপেক্ষা ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। ইহারা বড় কলহপ্রিয় ও কিছুতেই পরের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। এ জন্য কোন কার্য্যে দেশবাসিগণ "নিযুক্ত" হইলেও বড় অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইহাদের অনেকে নানা কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিকিম অথবা দুয়ারে আসিয়া বাস করিতেছে। অনেকে দার্জ্জিলিঙ্গের চা-বাগানে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা সর্ব্বত্র অসন্তুষ্ট, অবাধ্য ও শীঘ্রই কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অসাধারণ দৈহিক বল সত্ত্বেও তাহারা সহজে ভারবাহকের কর্ম্ম করিতে চাহে না। কিন্তু স্বদেশে তাহারা আলস্যে জীবনযাপন করে না।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা বেশ বলিষ্ঠ ও দৈহিক সামর্থ্যে প্রায় পুরুষের সমতুল্য। অনেক সময় স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে "বহুপত্যাত্মক বিবাহ" প্রচলিত। এক পরিবারের তিন, চারি ভ্রাতায় মিলিয়া এক জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া এক সংসারে বাস করে।

ভারতবর্ষের সকল দেশীয় রাজ্যে এক জন করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট আছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভোটানে তাহা নাই। গত ত্রিশ বৎসর ইহাদের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু বহু দিন হইতে ইহাদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভোটীয়ারা কুচবিহার আক্রমণ করিলে, তদ্দেশীয়েরা বৃটিশ গবর্মেণ্টের সাহায্য

পার্থনা করে। তদনুসারে কাপ্তেন জোন্স দুইটি কামান ও দুই দল সিহাহি সৈন্য সহ ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। ইনি সমভূমিতে পর্ব্বতীয়দিগকে যথেষ্ট ক্ষতি-

বুদ্ধক্ষেত্রে॥ সহকারে পরাভূত করিয়া তাহাদের পর্ব্বতস্থ আশ্রয়স্থান পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্ব্বক কুচবিহারের বালক রাজার উদ্ধারসাধন করেন। তিনি ডালিং ও অন্যান্য দুর্গ তোপে উড়াইয়া দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। অতঃপর তিব্বতের প্রধান লামার বিশেষ অনুরোধে তোটান ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১৭৭৪ অব্দে তিব্বতগমনকালে মিঃ জর্জ্জ বোগ্‌ল ভোটানের মধ্যে দিয়া তিব্বত গমনে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। তাঁহার আদেশানুসারে তিনি গমনপথের স্থানে স্থানে আলুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজ ভোটানের সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। উক্ত ঘটনার দশ বৎসর পরে কলিকাতা হইতে তিব্বতযাত্রী একদল রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন।

পরে সাধারণের অজ্ঞাত কোনও কারণে ভোটিয়া ও ইংরাজের মধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে বহুদিনব্যাপী "বিচ্ছিন্ন" যুদ্ধের পর পর্ব্বতীয়গণের উপদ্রবশান্তির আশায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট দুয়ার নামক স্থান ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু শীঘ্র তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইংরাজের দুর্ব্বলতাবশতঃ ও আত্মরক্ষায় অক্ষমতাপ্রযুক্ত এই প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছে ভাবিয়া তাহারা পুনরায় সমতলভূমিতে লুটপাট আরম্ভ করিল। তখন এদেশে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় কিপ্রকারী ও দূরদর্শী কোনও শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। সুতরাং প্রায় বিংশ বৎসর তাহারা অবাধে সীমান্তবাসিগণের উপর উপদ্রব করিয়াছিল। অবশেষে ১৮৬৪ অব্দে শান্তি ও সন্ধির স্থাপনের জন্য এসলি ইডেন রাজকীয় দূতরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অবমানিত হইয়াছিলেন। পেশমধ্যস্থ পর্ব্বতরোধিত উপত্যকায় সন্ধিসংস্থাপনার্থ সমবেত সর্দ্দারদিগের উৎপীড়নে তিনি ইংরাজের হীনতাজ্ঞাপক এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া পর্ব্বতীয়গণের দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। গত শতাব্দীতে মুষ্টিমেয় সৈন্য ও তৎকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহায়ে কাপ্তেন জোন্স কয়েক মাস মধ্যেই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার অসংখ্য সৈন্য সজ্জয় অর্থনাশ করিয়া দুই বৎসরে তাহা সংসাধিত হইল না। যুদ্ধশেষে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, অনেকের মতে তাহা বৃটিশ রাজশক্তির অবমাননাব্যঞ্জক। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই সন্ধির দ্বারা ডালিংকোট ও কালিমপুর নামক সুন্দর ভূমিখণ্ডদ্বয় ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। ভোটানের প্রধান সর্দ্দার এখন ইংরাজের নিকট হইতে বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সীমান্তবাসিগণ লুঠন ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—"দেবতার গ্রাস" কবিতায় লিখিত একটি সুন্দর গল্প। ভাষার উচ্ছলিত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে গল্পটি অবলীলাক্রমে উপসংহারের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ছন্দের কঠোর বন্ধনে কোথাও তাহার লীলাময়ী গতির রোধ হয় নাই। যেহ প্রেম সৌন্দর্য্যের সুকোমল অরুণাভায় সমস্ত আরম্ভটা সুরঞ্জিত,—কিন্তু এই স্নিগ্ধ আলোকের পর কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার!—নেপালে অন্ধ কুসংস্কার, তামসী স্বার্থপরতা, ও অকরুণ নিষ্ঠুরতার কি ভয়াবহ প্রতিষ্ঠা! তাহাতে সঙ্কুচিত শঙ্কিত মথিত হৃদয় শিহরিয়া চমকিয়া মুহ্যমান হইয়া আসে; এবং সর্ব্বশেষে এই বিচিত্র ছায়ালোকসম্পাতমন্ডিত চিত্রশ্রেণির মধ্যে সহসা করুণরসোচ্ছ্বাসপূত ব্রাহ্মণের পরার্থে আত্মদান কি মহনীয় কি বরণীয় কি স্পৃহনীয় বলিয়া মনে হয়! কবির নিষ্ঠুর কল্পনায় হৃদয় পিষ্ট হউক, কিন্তু তাঁহার কাব্য-কৌশল প্রশংসনীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "প্রথা সম্মতি" পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া একজন দক্ষ লেখক কালী ও কাগজের এত অপব্যয় করিতে পারেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বিলাত অবস্থানকালে লেখক এক সুন্দরী ব্রিটিশ যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া গলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"যা দিব্য দেখিতে!" সুন্দরীর স্বামী 'জন পুঙ্গব' লেখকের "সম্মুখে আসিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কি মহাশয়!' লেখক 'গম্ভীর স্থির স্বরে' কহিলেন, 'কেন মহাশয়!' "ইংরাজ কহিল, 'আপনি যে বলিলেন,—"দিব্য দেখিতে" তাহার মানে কি?" লেখক 'তাহার উপর তাম্রবর্ণ মুখের প্রতি শান্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া' কহিলেন, 'তাহার মানে আপনার কুকুরটি দিব্য দেখিতে!' লেখক 'অমনি উৎস-উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট একটি হাস্যকাকলি শুনিতে' পাইলেন; "আর সেই অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে একটা বিপুল হাস্যধ্বনি সজল গম্ভীর মেঘগুলির মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।" ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী অক্ষরসমষ্টি গলাধঃকৃত করিয়া পরিশেষে এই অপূর্ব্ব ঘটনায় উপনীত হইলে সহজেই মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়; ১ম,—এই সুন্দরীসন্দর্শন নাটকের শেষঅঙ্কে লেখকের ভাগ্যে 'উৎস উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট হাস্যকাকলি জুটিয়াছিল; কিন্তু এতখানি পণ্ডশ্রম করিয়া পাঠকের কি লাভ? ২য়,—জন-পুঙ্গব-প্রত্যুৎপন্নমতি সাহসী লেখকের উত্তর শুনিয়া, নিজের কুকুরকে, না বিদেশী নিগারকে,—কাহাকে হাস্যরসের সমধিক উদ্দীপক ও 'পিষ্টির' পাত্র মনে করিয়াছিল? পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার আর এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।" বঙ্গীয় পাঠকের পরম ভাগ্য! দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা এমন বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তাঁহারাও বিষয়নির্ব্বাচনে এতটা অসাবধান ও বিচারবিমুখ। বরযাত্রীসমাগমে যাহা অতি সুন্দর 'টেব্‌ল্‌-টক্' বলিয়া সাদরে গৃহীত হইত, তাহা যে সাহিত্যের সভা নিরর্থক ব্যর্থ হইতে পারে, আত্মপ্রত্যয়ে অচলা ভক্তি না থাকিলে, লেখক তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। "বাঙ্গুরে বুদ্ধি" প্রবন্ধে লেখক বানরজাতির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কতিপয় দেশীয় গল্পের সংগ্রহ করিয়াছেন। "সাইবীরিয়া" নামক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে, লেখক, Meigrian সাহেব প্রণীত From Paris to Pekin over the Siberian

Snows বাবুর ভ্রমণকাহিনীর পরিচয় দিয়াছেন। "দেবীস্তবিত স্বয়ম্ভূ" প্রবন্ধটি লেখক, মিঃ বুচ ও রোজমণ্ট নামক 'একটি অসাধারণ' ব্যক্তির পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইয়া, ভূমিকায় 'নাতিবৃহৎ' বাঙ্গালীর ভ্রমণে অনিচ্ছার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক যে 'অসাধারণ' ভ্রমণকারীর অদ্ভুত অবদানে লেখক এত মুগ্ধ হইয়াছেন, সেও বিলাতী সৈনিকের কল্যাণে জানা গিয়াছে, সেই রোজমণ্টের কাহিনী আদৌ সত্য নহে, লোকটি ভাল, ইত্যাদি। সুতরাং লেখক যে তাহার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, অগত্যা তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

নব্যভারত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষের 'সুখময়নে মগ' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কোনাভা বা সিমুল আলুর চাষ" একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "পূজা দেখা" কবিতাটির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ বাবুর ন্যায় সুকবির হস্তে কবিতার এইরূপ অপব্যবহার ও যাতনা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। "কুকির কবিতা" কৌতূহলজনক। লেখক বলেন,—"বর্ব্বর ও নিরক্ষর কুকিদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।" ত্রিপুরাপতির যত্নে কুকি জাতিকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। আশার কথা,—এই যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; "আজ কাল ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক কুকি প্রজাই বাঙ্গালা লেখাপড়া কথঞ্চিৎরূপে শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজের বর্ষীয়সী উপলক্ষে কুকি রাজা-বাসী খাপ্পুই স্বরচিত 'দুঃখমান' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। "ইহার পূর্ব্বে কুকি জাতির মধ্যে কেহ কখনও কবিতা লিখিয়াছে, লুখি, পুস্তক, অথবা লোকমুখে এমন কথা শুনা যায় নাই।"—কালীপ্রসন্ন বাবু কুকিরাজেই রচিত সেই কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এবারি "আদ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" নব্যভারত-সম্পাদকের দীনতা ও সৌজন্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। "মাসিকপত্রিকাসমূহের সম্পাদকগণের অনেকেই" নব্যভারত-সম্পাদককে মাসিকপত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদ্ভরের কি দুর্ভাগ্য! নব্যভারতের সম্পাদক বলিয়া দিতেছেন, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, "মাসিকসাহিত্য সমালোচনায় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত কুৎসাই প্রশ্রয় পাইতেছে।" তাঁহার উক্তি প্রতিবাদেরও অযোগ্য। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, যে সমালোচনা করে, সে লেখকের "বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে।" পুনশ্চ, নব্যভারতের এই নব্য সাধু বলিতেছেন,—"আমরা আপন আপন বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিব না।" সাধু সাধু! সেই জন্যই কি ছুরিকাখানি শানাইয়া সাহিত্য ভারতী পুথিয়া প্রভৃতি"র সম্পাদকগণের বক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের কল্যাণে নব্যভারত-সম্পাদকের যে সকল বন্ধুর 'বক্ষ' বাঁচিয়া গিয়াছে, তাঁহারা কি প্রকৃতঃ কৃতজ্ঞতার অনুরোধেও, তাঁহাদের এই বন্ধু-সম্পাদকের জন্য মধুসূদনারায়ণের ব্যবস্থা করিবেন না?

ন্তার তিনি বেদের বহু দেববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবত[illegible]র তত্ত্বনির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন্ মত সমীচীন, তাহা জা[illegible]ন না। অন্ততঃ, জৈমিনি-প্রমুখ যে মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দুজাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছি[illegible]ন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের ব্যবস্থাপনে যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমগ্র হিন্দু সমাজ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অ[illegible]শ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা [illegible] ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত আপত্তি চলিতে পারে, বোধ হয় না। প্রথম বয়সে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক, জীবনের শেষভাগে তিনি যন্ত্রযোগে পূজার্চনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসনা ও স্তুতিমাত্র বা ধ্যানমাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম্মপালনে তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ব্রাহ্মণনিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবহারে অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের সহকারে ব্যবহারভেদের আবশ্যকতা তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শতবৎসর পূর্ব্বে আচার-ব্যবহারের যে সকল পাত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার সকলগুলির উপযোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথই যে হিন্দুর অসন্দিগ্ধ প্রকৃত পথ, এই মূল সিদ্ধান্তের সহিত ঐরূপ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বস্তুতঃ কোন অসামঞ্জস্য নাই।

বেদপন্থী হিন্দুসমাজের বিপ্লবের জন্য ভগবান্ শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে, বোধ করি, এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতসমাজে যে নব্যহিন্দু-নামধারী নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বত্র সরল পথে চলিতেছেন কি না, বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূদেব বাবু এক স্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজী

শিক্ষার বিষ সহজে শরীর হইতে নামে
প্রচারিত উপদেশ শুনিয়া অনেক সময়
হজম করিতে পারেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের
প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টানি মত বলিয়া সংশয় জন্মে।
সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত
আত্যন্তিক অনুরাগটা সহসা উচ্ছ্বসিত
বিনা বিচারে উপার্জ্জিত খ্রীষ্টানিভাব ব
ভাবিয়া দেখিবার বোধ হয় সময় আ
তার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হিন্দুসমাজের বর্ত্ত
অবস্থায় আবশ্যক কি না, তাহাও বি চ
প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত
করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমো
প্রবল অস্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণতা গ
মূলক বৈরাগ্য হইতে এবং সেই বৈরা
হইতে হিন্দুসমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জ
উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াই
প্রাণ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যত
মত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে সাহস
ভৌমিক প্রেম শ । বড়ই চিত্তোন্মাদ
ভৌমিক প্রীতি রের যে ভয়ঙ্কর
হর্ষের উৎপাদন ক । অন্ততঃ পর
দিন কূর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মসম্প্র
সেই বোধ করি ভাল হয়। যাহা
মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় হইতে সীমা
করিয়া অভিনব পঞ্চমপুরুষার্থের প্র
প্রতি ও কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়
ব্রাহ্মণরক্ষিত পরিচিত মার্গ হইতে বি
কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা চিন্তায় বি

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদরায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে বোধ হয় অপরিচিত ছিলেন। "সাহিত্য" পত্রে বৈদিক কালে গোহত্যাবিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধ হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাস ঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সচরাচর বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কি রকম একটা অনির্ব্বচনীয় ভীতির সঞ্চার করে; বোধ করি, সেই ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই, এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনব মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং যখনই পড়িয়াছি, তখনই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকার করিতে দোষ দেখি না যে, "সাহিত্য" পত্রের মলাটের উপর উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা উৎকট হর্ষ উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার রচনামধ্যে দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। কখনই সে আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত অচিরে এই আনন্দের জনয়িতা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন, এবং যে আগ্রহ, যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম "সাহিত্যের" মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা এত শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখন মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয়ের

সৌভাগ্য ঘটে নাই; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকারবহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোন ক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি সখা "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকামাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূলঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রায়নগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম স্থান। ১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালে ২রা শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ছিচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর পল্লী রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহার স্মৃতি সেদিনও বঙ্গীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্র একটি বিতণ্ডার আন্দোলন উৎপন্ন করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ। রামকানাইএর পিতৃপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবারমধ্যে স্বকল্পিতযন্ত্রসহকারে অভিনব শক্তি-উপাসনার প্রচলন

করিয়া যান; তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং উমেশচন্দ্র সেই শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন।

উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী। উমেশচন্দ্রে বঞ্চিত হইয়া উভয়েই এখনও জীবিত, বা জীবন্মৃত!

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরাজী স্কুলে ১৮৬৮ সালে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আইসেন; এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কালেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ৭৪ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম্. এ., ৭৫ সালে বি. এল্ উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার পান। পঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

১৮৭৭ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে গবর্মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর, দশ বৎসর পরে হাঁচুটাবি সার্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানী লাভ করেন। পরে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বগুড়ায় অবস্থানকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থানপরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। "নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব" ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সংসারের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সংসারেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনা বড় অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল! এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বেশভূষার পারিপাট্য ও

অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহাদের জড়শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থি-কঙ্কালের অস্তিত্বসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একবারে অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিতেন না; কিন্তু বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখনও অনুভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখনও কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এদেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদ্ভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক অতিশয় পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতার বেশভূষার কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণসমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ আকর্ষণের বা অনুরাগপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্যের বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত; বঙ্গের জলাভূমি যে ম্যালেরিয়া উৎপাদন করেন, তাহা বাষ্পীয় পদার্থ; বঙ্গের অন্তঃপুরচারিণীগণ যে সকল বৎসের জন্মদান করেন, তাহারা কঙ্কালবিহীন; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ"; বঙ্গদেশে কাঠিন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে কঠিন যুক্তি-কায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ও রশ্মিপ্রতিফলনক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল ও তীক্ষ্ণতা ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত, নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্ম্মুখে আসিত ও তদ্গতত্যাগ করিয়া আগিয়া উঠিত। বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, এবং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস-উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের শিক্ষাবিভাগ এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে, দেশে ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শোনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। পরন্তু নব্যসম্প্রদায়ের এ-বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুগুলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় প্রাচীনকালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের পাশ্চাত্য-শিক্ষাও তাহা জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল প্রহসনমাত্র হয়; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতিস্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক; আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চিনে না, সে যেন ভণ্ড ও ধূর্ত্ত স্বদেশানুরাগের আস্ফালন করিয়া ধিক্কৃত না হয়।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারি জন সহৃদয় পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে ও আপনাকে চিনিতে চেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিতসমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা, উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। একএকবার মনে হয়, তিনি যদি রাজকার্য্য জীবিকার উপায়স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অধিক কাজ করিতে পারিতেন; কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীনবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই, যাঁহাদের শক্তির বা অর্থসামর্থ্যের বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন উমেশচন্দ্রের মত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইয়াছেন?

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোনও লাভ নাই; তাঁহারা যখন; আর যাহারা প্রাচীন কালের জন্য কেবল হা হুতাশ করেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাবই প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায় যিনি অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীতস্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনি ধন্য ও সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। তিনি কালস্রোতে নীরমান যে দুই একটি চিহ্নমাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ লোকলোচনাতীত বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী জনসমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, এমন কোন কথা নাই। সামান্য প্রমাণ আশ্রয়ে, অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে যে ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দার্শনিকোচিত সংশয়পরতাই কেবল তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমষ্টির প্রতি সাধারণের অনাস্থার কারণ নহে। এই অনাস্থার মূলে আমাদের স্বদেশের ইতিবৃত্তের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়াই সংশয় হয়।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অত্যন্ত চিত্তহারী। একটা অনির্ব্বার্য্য স্নেহের আবেগে আমি সেই রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট কাপুরুষের মত কেবল বৈদেশিক পন্থার অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। স্বাধীনভাবে আপনার উদ্ভাবিত নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক একটি প্রবন্ধ বৈদিককালের আর্য্যসমাজের এক একটি পট মানস-চক্ষুর নিকট উজ্জ্বল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্ব্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব, তাহার স্পষ্টতা, তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার পরিস্ফুটতা দেখিয়া, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তুলিকা যে তাহার স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি

হওয়ায় ও আভ্যন্তরিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু তাহার মূল্যনির্দ্ধারণ অন্যরূপে করিতে হইবে। যে অস্পষ্ট স্মৃতি তাহা জাগাইয়া দিত, যে আকাঙ্ক্ষার, যে অতৃপ্তির, যে আশার উদ্দীপনা করিত, তদ্দ্বারা তাহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এবং এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশার উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস জড় অনাসক্ত সুপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশারই এখন প্রয়োজন। কর্ম্ম-সম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই, সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্ম্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধতমসে আচ্ছন্ন জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে বাধাবিঘ্ন না মানিয়া ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এই জন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকট এত ভাল লাগিত। বাঙ্গালায় আরও কতিপয় ব্যক্তি ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই কেবল বৈদেশিকের পদাঙ্ক অনুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে ও অনুকারেই নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বৈদেশিক প্রণালীক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্ম্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান্। কিন্তু উমেশচন্দ্রের যে স্বাধীন চিন্তপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, যে

আকাঙ্ক্ষার ও পিপাসার উদ্ভেদনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি, বোধ হয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয় ত ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রের সেই পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিল না।—মাতর্বঙ্গভূমি! এই নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ কি তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না?

যে লোকাতীত মহাত্মার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র একালে বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ উপাদান তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোন বন্ধুকে তিনি পত্র দ্বারা ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানেরও সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদানসংগ্রহ অনেকেই সাধ্য; এদেশে সেই সাধ্যসাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত করিয়া তাহার যথাস্থানে বিন্যাস সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্যনির্দ্ধারণ, তাহার অর্থ-আবিষ্কার, পুরাতন জিনিসকে নূতন চোখে দেখা সকলের সাধ্য নহে। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি যথেষ্ট মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্য্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পাইল। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিরোধী থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্যমতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই বিভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরাজী দর্শনে যাহাকে noumenon বলে, ও যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যমতে সেইরূপ noumenon, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে প্রকৃতি ও

১১

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর-পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন; এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাঁহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে স্থানান্তর হইতে এত প্রজা সমাগত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ভূমি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইয়াছে, এবং সকলে জমিদারের হিতৈষিত্ব ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিয় এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মীতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্র-পত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। তিনি আত্মসংযমবলে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে পূজা

হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।" ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথিনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালক বালিকা, তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি 'মা' বা 'দিদি' সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—"তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস।" অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানা রূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত করিয়া তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস, পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল, তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীল গর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথিনাথের অট্টালিকা খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবান্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। নিম্নে কর্ণফুলীর

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাকেত। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের মন্দিরের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত ও সমতলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। আনাথিনাথ বাড়ী ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলার আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি

চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসীর" একজন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব ;—

"মহামুনি চট্টলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল ভূমিতে নানা স্থানে বৌদ্ধভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া ক্লান্তর প্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে।

* * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান! কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই। এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদু প্রবাহে প্রবাহিত। নানাবিধ পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন। বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি ; এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা ফুরায়, দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল দোকানেই মহা ভিড় ; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্ত্তি। ইহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাটরূপ বুদ্ধ নিমীলিতনেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দক্ষিণপার্শ্বে পাঁচ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুণ্ডন—দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অ
ভক্তিপরায়ণ। তিনি এই মেলায় সা
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভা
আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহাম
ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে
মেলা বসিয়াছে। যত দূর দেখা যাইতে
মেলা-স্থান পরিপূরিত; তাহাদের গীতে,
মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, বউ ক
গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিন
জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মং
মন কৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয় প্র
সকলেরই এক বেশ। মগ পুরুষের
পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, হাতে রূপার
তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুম
তাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম
একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে
হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়
যে, এক বুক্ষ পুষ্প রোপণ করিয়া কা
সারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্য
দের দেহসন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষে
খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাসিকা
নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য
কেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদ
বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে
অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লই
অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে
করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে
আলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহি
স্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখি

চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ-উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসবক্ষেত্রের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলে কোমল মকমলসন্নিভ শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। না! ওই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ, সকলেই আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ-নির্ব্বাণের উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচার, তিরোধান; ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধান কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বাবা!

আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।"

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়! এখনকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না; বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম; শিখে, না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতিযোগিতা। যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। বুদ্ধদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ৭॥ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দুবৈরাগী। তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্র দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে, যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে "ক্রুশে" নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না। শ্রীভগবান এক,—তাঁহার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য লাভ করিবার সাধনার পথ স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই

পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভি
ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হই
পিতার কাছে ষড়্‌রসের কথা কি শুনিয়াছ

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য,

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসা
মাতার মত প্রেম করে। হিন্দুর দেব দেবী
পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমি
কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস।
এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব।
করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বা
করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজগোপী
দেখিত, জগৎপতিকে সেইভাবে প্রেম কর
কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অ
প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম কর
পেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণ
তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে
রাই শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁহার লীলার অভিনয় ব
'সোঽহং' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। এইরূপ,
পারে রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এ
গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞা
র্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের
বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি
স্থায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী প
মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল।
চিত্রিত করিয়াছেন;—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল
সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল
গুলি একবার কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আ
নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের একবিন্দুও

দোথয়া বোদ্ধ মগদের আনন্দলহরা আরও উছালয়া উঠল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেববালা! না গন্ধর্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশ-ভূষাই বা কোথায়? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে।"

"যুবভীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালিকা গুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর এক-বার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির প্রাঙ্গন বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে, রাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আড়ুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও, প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলার এমনই মহান্ ভাব!

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন?' হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

তৃতীয় প্রস্তাব।

অশোকরাজত্বের তৃতীয়াংশ তাঁহার অভিষেকের পঞ্চদশ বৎসর হইতে ষড়বিংশতি বৎসর-পর্য্যন্ত। ইহাই বৌদ্ধ ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশে যে বীজ কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এই যুগে তাহা হইতে ঘনচ্ছায় বিশাল বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তাহার ছায়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও প্রান্তরাজ্যসমূহ শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ বড়ই বিরল। কেবল সম্রাট কনষ্টান্টাইন কর্ত্তৃক ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা ব্যাপারই ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু কনষ্টান্টাইনের সময়ে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি এরূপ সমদর্শিতাও ছিল না, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের এরূপ সুব্যবস্থাও ছিল না।

অশোকরাজত্বের এই তৃতীয়াংশের বিবরণ নিম্নলিখিত লিপিমালা হইতে প্রাপ্তব্য।—

(ক) গুহালিপি—

খলতিকস্থ (আধুনিক বারাবরস্থ) সুপিয়া (আধুনিক করণচৌপাড়) গুহা, গয়ার ১৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। (১)

(খ) গিরিলিপি—

(১) সাসেরাম, সাহাবাদ জিলায়;

(২) রূপনাথ, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের ৩৫ মাইল উত্তরে;

(৩) বৈরাট, জয়পুর হইতে ৩১ মাইল উত্তরে;

(৪) ভাব্রা, ঐ;

(৫—৭) সিদ্ধাপুর, মহীশূরস্থ চিতলদুর্গের ইলাকায়।

(গ) স্তম্ভলিপি—

---

(১) বারাবরে অশোকের সময়ের আর দুইখানি গুহালিপি আছে। সে দুইখানি নিগ্রোহ (আধুনিক সুদাম) ও (আধুনিক) বিশ্বঝোপ গুহায় খোদিত। উভয় লিপিই অশোকের অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) উৎকীর্ণ। এই লিপিদ্বয়ে আজীবিক-নামক ব্রতিগণকে দানের উল্লেখ আছে।—Indian Antiquary. vol. xx. (1891) pp. 361-5, 16 p—70.

(১) নিগ্লীব, নেপাল তরাই, গোরক্ষপুর জিলার উত্তরে; উস্ক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(২) পড়েরিআ, নেপাল তরাই, নিগ্লীব হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(৩) এলাহাবাদস্থ কৌশাম্বী;

(৪) কাকনাভ, (আধুনিক সাঞ্চী), ভূপালরাজ্যে।

উল্লিখিত লিপিমালা আয়তনে ক্ষুদ্র ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত। সিদ্ধাপুরস্থ তিনটি লিপি মহীশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ খ্রিষ্টার লুইস্ রাইস্ কর্ত্তৃক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত। নিগ্লীবস্থ স্তম্ভলিপি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের কোন রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়; ডাক্তার কুরার স্থানাদি নির্ণয় করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী পড়েরিআর লিপি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কৌশাম্বীলিপির সহিত সাঞ্চীলিপির বহুলপরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই দুই লিপিই অসম্পূর্ণ ও তারিখ-বিরহিত।

বারাবরস্থ সুপিয়া গুহালিপি হইতে প্রকাশ যে, অশোক অভিষেকের একোনবিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ বিংশতিতম বৎসরে) সেই গুহা দান করেন; সে গুহা তিনি কাহাকে দান করেন, তাহা পাঠ করা যায় নাই; তবে তৎপর্ব্বতস্থ তাঁহার দুইটি ও তাঁহার পৌত্র দশরথের দুইটি লিপি হইতে দেখা যায় যে, গুহাগুলি আজীবিক যতিগণের সম্পত্তি। এই আজীবিকগণ কে, তৎসম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। তবে তাহারা যে বৌদ্ধ নহে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে, তাহারা এক নগ্ন-সাধুসম্প্রদায়-ভুক্ত; সে সম্প্রদায় শাক্যমুনি ও তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে ইহাদিগের নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তাঁহার টীকায় উৎপল তাহাদিগকে "নারায়ণাশ্রিতানাম্" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) অতএব গুহালিপি হইতে দেখা যায় যে, রাজত্বের বিংশতিতম বৎসরেও অশোক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বিমুখ ছিলেন না।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে উৎপীড়িত না করিলেও, ক্রমে তাহাদের প্রতি অশোকের সহানুভূতির হ্রাস হয়, এবং ক্রমশঃ তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়েন। সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও সিদ্ধাপুর, এই কয় স্থানের লিপিমালা হইতে

(২) Kern, l. c. Prof. Buhler, Ind. Ant. xx. p. 362.

তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সিদ্ধাপুরস্থ প্রথম লিপিতে অশোক লিখাইয়াছেন,—

"দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শিন্) ইহা বলিয়াছেন—সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক কাল আমি উপাসক হইলাম, কিন্তু (তৎকালমধ্যে) কোন চেষ্টা করি নাই। ছয় বৎসর কেন, ততোধিককাল আমি সংঘতে উপগত হইয়াছি; তৎকাল-মধ্যে (ধর্ম্ম)-বৃদ্ধিসাধনকল্পে চেষ্টা করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে যে সকল মনুষ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে ছিল, তাহারা দেবগণ সহ অসত্য স্বরূপ, প্রকাশ হইল।" (৩)

সাসেরাম প্রভৃতির লিপিমর্ম্মও এইরূপ। (৪) অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে কাজেই আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে এই প্রয়োজনীয় লিপির সময়নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে প্রকাশ যে, অভি-ষেকের অষ্টম বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) অশোক কলিঙ্গ বিজয় করেন। তথায় নানা প্রাণীর বিনাশ ও জীবক্লেশ দেখিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়। সম্ভবতঃ সেই অনুশোচনায় অশোকের মন প্রথম ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দশম বৎসরে তাঁহার "উপাসক" হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ লিপিদ্বয়ে প্রকাশ যে, ধর্ম্মলিপিমালা ও অন্যান্য ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা প্রধানতঃ তাঁহার অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) আজ্ঞাপিত হয়। এই বিষয় ষষ্ঠ স্তম্ভলিপিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। দশমবর্ষ হইতে "সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক" কাল হিসাব করিলে আমরা ত্রয়োদশ বৎসরে উপনীত হই। সেই সময় হইতে যে অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুলপ্রচারাদিকল্পে বহুবিধ চেষ্টা করেন, তাহাও দেখা যাইতেছে, এবং পরেও দেখা যাইবে। অতএব অন্যান্য লিপিমালা উপরি-উক্ত সিদ্ধাপুরাদির লিপিগুলির সমর্থন করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অশোকের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি নানা বৌদ্ধ তীর্থে গমন করেন ও সেই সকল তীর্থে নূতন স্তূপাবলীর নির্ম্মাণের ও পুরাতন স্তূপগুলির সংস্কারের

(৩) Epigraphia Indica vol. iii. pp 133—9.

(৪) Ind. Ant. xx. p. 165; xx ii pp. 299 ff.

বন্দোবস্ত করেন। ইহার আভাষ নিগ্লীব ও পড়েরিঅ স্তম্ভলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) নিগ্লীবে লিখিত আছে যে, অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে গত বুদ্ধ-কোণাকমনের পূর্ব্বস্থিত স্তূপ তিনি বর্দ্ধিত করেন। পড়েরিঅতে উল্লেখ দেখা যায়, অভিষেকের বিংশতি বৎসর পরে বুদ্ধশাক্যমুনির জন্ম-স্থান লম্বিনিগ্রামে প্রিয়দর্শিন্ আসিয়া পূজা করেন ও সেই গ্রামখানি নিষ্কর করিয়া দেন। প্রবাদ এই যে, তিনি স্বরাজ্যের মধ্যে চতুরশীতি সহস্র স্তূপাবলী স্থাপিত করিয়াছিলেন। (৬)

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বৌদ্ধস্তম্ভ মণ্ডপ ও গৃহের নির্ম্মাণ করেন। পড়েরিঅতে শিলাস্তম্ভের কথা লিখাইয়াছেন। অশোক লাট স্তম্ভ এখনও অনেক স্থানে দেখা যায়; যেমন গয়া জিলায়,—নিজ গয়া সহরে ও ইসলামপুর থানার দক্ষিণে, দুইটি এখনও বর্ত্তমান। বৌদ্ধ অবদানের মতে, বোধগয়ায় মহাবোধিদ্রুম ও বজ্রাসনের জন্য রেলিংযুক্ত, থামওয়ালা, খোলা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দেন ও তদ্রূপ তাহার চারি পার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। রেলিং প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। (৭) আচার্য্য ও ভিক্ষুগণের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকক্ষসমন্বিত গৃহসমূহের নির্ম্মাণ করেন। (৮)

দ্বিতীয়তঃ, অশোক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ভাব্রা গিরিলিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং সেই গিরিলিপি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজা প্রিয়দর্শিন্ মাগধসংঘকে অভিবাদন করিয়া (তাঁহাদের) আয়ু ও সুখের বৃদ্ধি কামনা করেন। পূজনীয়গণ, আপনারা জানেন, আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের কত মান্য ও শুভকামনা করি। পূজনীয়গণ, ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক যাহা ভাষিত, সে সব সুভাষিত; এবং যত দূর আমি আদেশ করিতে পারি, তাহার ঘোষণা করা আমি উত্তম মনে করি, যে তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী

(৫) নিগ্লীব—Ep. Ind. v. pp. 5-6.
পড়েরিঅ—Ep. Ind. vol. I. p. 4.

(৬) Beal's Si-Yu-Ki vol. II. pp. 88-90; Fahien Ch. xx-iii and xxvii.

(৭) Dr R. L. Mitra's Bodh-Gaya pp. 71, 72, 146; General Cunningham's Mahabodhi pp. 4-16; Si-Yu-Ki vol. II. 117-8.

(৮) Si-Yu-Ki II. p. 93; cf. Fa-hien ch. xxvii.

হইবে। পূজনীয়গণ, ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি এই;—বিনয়সমুৎকর্ষ, আর্য্যবসানি, অনাগতভয়ানি, মুনিগাথা, মৌনেয়সূত্র, উপতিষ্য-প্রশ্ন, এবং লাঘুলোবাদ, যাহা মৃষাবাদ হইতে আরম্ভ হইয়া ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ভাষিত। পূজনীয়গণ, আমি ইচ্ছা করি, বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্ম্মপরিযাত্রা-গুলি শ্রবণ ও উপাধ্যান করেন; উপাসক এবং উপাসিকারাও এইরূপ করে। এতদুদ্দেশে, পূজনীয়গণ, ইহা লিখাইলাম যে, লোকে আমার ইচ্ছা জানুক।" (৯)

এই ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি কি, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। বোধ হয়, বিনয়সমুৎকর্ষ,—বিনয়পিটকের সারাংশ "পাতিমোকখ"; অনাগত ভয়,—সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায়শাখার "আরণ্যকানাগতভয়" সূত্র; উপতিষ্য-প্রশ্ন,—বিনয়পিটকের মহাবগ্গস্থ "শারিপুত্র" আখ্যান; মুনিগাথা,—সূত্র-পিটকের সুত্তনিপাতশাখার "মুনিগাথা" নামক দ্বাদশ সূত্র; এবং লাঘুলোবাদ—সূত্রপিটকের মজ্ঝিমনিকায়শাখার ৬১ সূত্র, "অম্বলট্ঠিক-রাহুলোবাদ"। আর্য্যবাস এবং মাগেয়সূত্র এখনও চিহ্নিত হয় নাই।

উল্লিখিত তালিকার তদনীন্তন সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রেরই উল্লেখ আছে, এমন বোধ হয় না। আমি অনুমান করি, ভগবান বুদ্ধদেবের ভাষিত যে যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শ্রবণ ও অনুচিন্তা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য, অশোক সেই সকল গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহ ব্যতীত ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ভাষিত বা তাঁহার শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য অনেক সূত্রও তখন বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ, স্বদেশে ও বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক বহুবিধ ব্যবস্থা করেন। ইহার আভাস আমরা গিরিলিপিতে (দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) পাই-য়াছি ও বড় স্তম্ভলিপিমালায় প্রাপ্ত হইব। দ্বিতীয়, সপ্তম ও ত্রয়োদশ গিরি-লিপিতে লিখিত আছে যে, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। স্বরাজ্যেও রাজকর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যের ধর্ম্মশিক্ষার উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য, "প্রতিবেদিক" ও "ধর্ম্মমহামাত্য" নামক কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন। সাসে-রাম প্রভৃতি উল্লিখিত চারিখানি গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"বিবুধ দ্বারা ইহা

(৯) M. Senart, Ind. Ant. xx. pp. 165-8.

(ধর্ম্মপ্রচার) বিস্তৃত করা হইয়াছে। দুই শত ছাপ্পান্ন ইতি ২৫৬ (১০)
বুলার সাহেব "বিবুথের" বুদ্ধ অথবা ব্যষ্ট (অতিবাহিত) এই অর্থ করিয়া,
লিপির সময় বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল হইতে ২৫৬ সাল ঠিক করেন। (১১) কিন্তু
উক্তস্বরূপে পাঠটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেনার্ট সাহেবের
কৃত 'প্রচারক' অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রচারকপ্রেরণের কথা
অশোক নানা লিপিতে বলিয়াছেন।

অশোকের কার্য্যাবলী তাঁহার নিজের রচনা হইতে প্রদর্শিত হইল। বৌদ্ধ
কিম্বদন্তীতেও অশোকের কার্য্যকলাপের কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়; তবে
তথায় এই সকল কার্য্যসমূহের অধিকাংশ তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির নামে উল্লিখিত।
তাহা কত দূর সত্য, বলা যায় না। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সমি-
তির উল্লেখ বিরল ও অস্পষ্ট। কেবল দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধেরাই তৃতীয় বৌদ্ধসমি-
তির কার্য্যাবলীর সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় দীপবংশে ও
মহাবংশে এতদ্বিষয়ক মূলাধার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

উভয় পালিপুস্তকে প্রকাশ যে, কালক্রমে বৌদ্ধ আচার-ব্যবহারে নানা
ভ্রম ও বিবিধ মতানৈক্যের সঞ্চার হয়, ও তাহার ফলে সংঘের মধ্যে গোল-
যোগ উপস্থিত হয়। ভ্রমসংশোধন ও বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য,
অশোক, সাম্রাজ্যের নানা বিভাগ হইতে বিদ্বান্ ও পূজনীয় ভিক্ষুগণকে পাট-
লিপুত্রে আহ্বান করেন। এক সহস্র স্থবির সভায় সমবেত হন, ও মোগ্গলি-
পুত্র তিষ্যকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। ইহারই নাম তৃতীয় বৌদ্ধসংহতি।
অশোকাভিষেকের অষ্টাদশ বৎসর পরে এই তৃতীয় সংহতির অধিষ্ঠান হয়।
সংহতি নয় মাস কাল শাস্ত্রাদি ও বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করেন। এই
বহুকালব্যাপিনী আলোচনার ফল দুইটি বৃহৎ বিষয়ের ব্যবস্থা। প্রথম, বৌদ্ধ-
ত্রিপিটকের সংগঠন; দ্বিতীয়,—বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারিত প্রচার।

ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ও প্রাচীনতম শাস্ত্র। ইহা তিন ভাগে
বিভক্ত—

১। বিনয়পিটক,—সংঘস্থ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের নিত্যাচারপদ্ধতি।

২। সূত্রপিটক,—উপাসকগণের জন্য শাস্ত্রীয় পাঠ।

৩। অভিধর্ম্ম,—বৌদ্ধদর্শন।

(১০) Senart, Ind. Ant. xx. 169-1.
(১১) Ep. Ind. vol. iii, p. 142.

বর্ত্তমানকালে ত্রিপিটক অতি বৃহৎশাস্ত্র। পালি বিনয়পিটক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত;—পারাজিক (প্রব্রজিক), পাসিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত), মহাবগ্গ, কুলবগ্গ, পরিবারপাঠ। সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পঞ্চদশখণ্ডে বিভক্ত। অভিধর্ম্ম ও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়, সাত খণ্ডে বিভক্ত। (১২)

ত্রিপিটক-সংগঠন ব্যতীত, সংহতি হইতে দেশ বিদেশে রীতিমত ধর্ম্ম-প্রচারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে ও মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রকাশ যে, নিম্নলিখিত দেশে নিম্নলিখিত প্রচারকগণ প্রেরিত হন;—

দেশ	প্রচারকগণের নাম
কাশ্মীর ও গান্ধার (কাবুল নদীর দক্ষিণ উপত্যকা);	মজ্ঝন্তিকা
মহীশ (মহীশূর)	মহাদেব
বনবাসি (উত্তর কানাড়িয়ি বৈজয়ন্তি)	রক্ষিত
অপরন্তক (? সিন্ধু বা উত্তর আফগানিস্থান)	ধর্ম্মরক্ষিত
মহারাষ্ট্র (মহারাষ্ট্র)	মহাধর্ম্মরক্ষিত
যোনলোক (সিরিয়া ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্য)	মহারক্ষিত
হিমবন্ত (হিমালয়ের-পাদপ্রদেশ)	মজ্ঝিম
সুবর্ণভূমি (ব্রহ্ম বা মালয়)	সোন এবং উত্তর
লঙ্কা	মহিন্দ ইত্যাদি (১৩)

ক্রমশঃ।

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

২

গতবারে আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতসমালোচনার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া প্রত্নতত্ত্বাদির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সহসা কোনও কথা বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বুঝি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দুই চারি কথা বলিয়াছি মাত্র। সুতরাং সে জন্য

(১২) Rhys David's Buddhism, pp. 18-21.
(১৩) Do. p. 227.

কেহ বোধ হয় আমাদিগকে দোষভাগী করিবেন না। এবার আমরা যুধিষ্ঠির রাজ ও গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে চাহি; সেগুলি যে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা অকাট্য প্রমাণ, আমরা তাহা বলিতেছি না; প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত বা প্রমাণ আমরা অভ্রান্ত বা অকাট্য বলিয়া মনে করি না, কাজেই কি বলিয়া আমাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলি সাধারণকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে অনুরোধ করিব? তবে সেগুলি আপাততঃ আমাদের নিকট কতকটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা সেই সিদ্ধান্ত ও প্রমাণগুলিকে গ্রহণ করিয়া একবার সাধারণকে তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বলিতেছি। যদি কেহ গুরুতর প্রমাণবলে তাহার খণ্ডন করিয়া অন্য সিদ্ধান্ত স্থাপিত করেন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; আমরা প্রকৃত সত্য-সংস্থাপনেরই ইচ্ছা করিয়া থাকি। কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া, দুই-চারিটি বিক্ষিপ্ত প্রমাণের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করাকে আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্ত মনে করি না। অনুসন্ধান ও ভূয়সী গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মূল্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপাততঃ আমরা যে দুই একটি সিদ্ধান্ত কতিপয় প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, সাধারণে তাহার একটু বিচার করিলে আমরা যারপরনাই সুখী হইব।

যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সেই সময় হইতে উক্ত অব্দ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রমাণ রাজতরঙ্গিণী হইতে দিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন প্রাচীন ইতিহাস থাকে ত তাহা রাজতরঙ্গিণী ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অস্বীকার করেন না। সেই রাজতরঙ্গিণীর কথাটী একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। একমাত্র সেই গ্রীকবিজয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। গ্রীকবিজয়ও আমরা অস্বীকার করি না, পরে সে কথা বলিব। রাজতরঙ্গিণী বলিতেছে,

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্রাধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ১ম তরঙ্গ, ৫১।"

অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দ্বাপরের শেষে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, রাজতরঙ্গিণী-

কার কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহাদের মতকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন; তিনি বলেন,—

"ভারতং ঘাপয়ান্তেঽভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥"

এই কথা তিনি কেবল কল্পনাবলে বলিতে চাহেন না; তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকাল কলির অতীতাব্দে যোগ করিলে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়,—

"লব্ধাধিপত্যসংখ্যাং বর্ষাণি সংখ্যায় ভূভুজাং।
ভুক্তান্ কালাৎ কলেঃ শেষো নাস্ত্যেষাং তদ্বিবর্জ্জিতাৎ॥"

রাজতরঙ্গিণীকারের কথা এখানে একটু খুলিয়া বলা ভাল। তিনি গোনর্দ্দ নরপতি হইতে কাশ্মীরের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। গোনর্দ্দ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকালের তালিকা তাঁহার জানা আছে, এবং তিনিও তাহা প্রদান করিয়াছেন। সেই গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। সুতরাং গোনর্দ্দের সময়নির্দ্ধারণের অনুসারে, কলির কয়েক শত বৎসর গত না হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে না। তাই তিনি বলিতেছেন যে, কলির যে অব্দ হইতে কাশ্মীরের রাজগণের বিবরণারম্ভ, তাহাতে তাঁহাদের রাজত্বকাল যোগ করিলে তবে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, গোনর্দ্দ পর্য্যন্ত রাজত্বকালের সংখ্যা কলির প্রথম হইতে হয় না, তাহার কয়েক শত বৎসর পর হইতে হয়, ইহাই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য।—সেই জন্য তিনি বলিতেছেন যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কহ্লন পণ্ডিত রাজত্বের তালিকা দ্বারা যে সময়ের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, তাঁহার প্রমাণটা কি একেবারে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিব, অথবা তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিব? কোন্‌টি কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

রাজতরঙ্গিণীকার কেবল কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের মঘানক্ষত্রে অবস্থানের কথাটাও বলিয়াছেন,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥ ৩॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বসময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন। ২৫২৬ বৎসর তাঁহার রাজ্যের শককাল। ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দের পর হইতে যুধিষ্ঠির-

শক অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য্য। রাজতরঙ্গিণীকার পুরাণাদিতে উল্লিখিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথাটাও গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজের উপস্থাপিত কাশ্মীররাজগণের শাসনতালিকা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণের চেষ্টাও করিয়াছেন। ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিতের মতটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিতের মত আমরা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরাচার্য্যের উক্তির দ্বারা সমর্থন করিতেছি। সম্ভবতঃ, কহ্লন, বরাহমিহিরের গ্রন্থ হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও যুধিষ্ঠিরের শককালের কথাটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতার সপ্তর্ষিচারনামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥ ৩॥"

রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকের শেষে 'রাজ্যস্য' কথাটি আছে, এখানে তাহার স্থলে 'রাজ্ঞশ্চ' কথাটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, যুধিষ্ঠির রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষা বৃহৎসংহিতার পাঠই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ সাহেব বৃহৎসংহিতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই গ্রন্থ হইতে আমরা উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম। তিনি পরিশিষ্টে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পর I. O. Libraryর হস্তলিখিত একখানি বৃহৎসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই,—

"বর্ষসহস্রত্রিতয়ং শতমেকং সপ্ততির্ন্যূনা চ।
শককালযুতমিশ্রং কলের্গতং ধর্ম্মপুত্রস্য॥"

ইহার অর্থ এই যে, কলি ও ধর্ম্মপুত্রের শককালের মিশ্রণ ৩১৭৯ বৎসর। আমরা বৃহৎসংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে পাইয়াছি যে, যুধিষ্ঠিরের শককাল ২৫২৬ বৎসর। তাহা হইলে, ৩১৭৯ হইতে ২৫২৬ বাদ দিলে, ৬৫৩ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং, ৬৫৩ কল্যব্দ হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে, কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয়। আর্য্যভট্ট ও পরাশরের মতও প্রায় তাহাই। তবে সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে আর্য্যভট্টের মতে কলির ৬৬৩ বৎসরে ও পরাশরের মতে ৬৬৬ বৎসরে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘার প্রথমে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কল্প, মন্বন্তর ইত্যাদির পরিমাণ হইতে সপ্তর্ষির গতিগণনা করিয়া সূক্ষ্মরূপে ঐরূপ বিচারে উপনীত

রাজতরঙ্গিণীকার যে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া অভিহিত করা ভ্রমের কার্য্য বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সাধারণতঃ সময়গণনায় বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না; তবে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্ণয় করিতে হইলে ও তৎসময় হইতে কোনও গণনার প্রয়োজন হইলে, গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। ফলতঃ কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের পৃথক্ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়, ইহা জানা আবশ্যক।

বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত, এবং তাঁহাদের মতে কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। তাহা হইলে কলির ৩১৭৯ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। এখানে কলির ৪৯৯৯ বৎসর। ৩১৭৯ হইতে ৪৯৯৯ পর্য্যন্ত ১৮২০ বৎসর ব্যবধান। এই ১৮২০ বৎসর শকাব্দের পরিমাণ। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকাকারগণের ও অন্যান্য অনেকের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাঁহারা কল্যব্দকে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও সম্বৎকে বিক্রমাদিত্যের অব্দ বলিয়া থাকেন। বরাহমিহিরের টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ। যুধিষ্ঠিরের অব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ প্রচলিত হইলে, তাঁহার মতে, শকাব্দই সেই অব্দ হয়। কারণ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হইলে, এবং তাহা ২৫২৬ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে, তাহার পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। কাজেই শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের অব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী বিক্রমাদিত্যের সময়। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। সময়ান্তরে তাহার সমালোচনার ইচ্ছা রহিল। আমাদের মতে খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয়। এক্ষণে গ্রীকবিজয়সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়। এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস পালীবোথ্রা নগরীস্থ সান্দ্রাকোটাস রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উক্ত পালীবোথ্রা গঙ্গা ও ইরেনোবসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই প্রমা-

ণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যে, গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু বা শোণের সঙ্গমস্থল পাটলীপুত্রনগর চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বংশীয়, এবং তাঁহার সময়েই আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সার উইলিয়ম জোন্স প্রথমতঃ এই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি সম্ভবতঃ পুরাণ ও মুদ্রারাক্ষসাদি পাঠ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রের কথা অবগত হন। এবং আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কথাও তাঁহার জানা ছিল। সেই জন্য তিনি মিগাস্থিনিসের উল্লিখিত সান্দ্রাকোটাস, পালীবোথ্রা সহিত চন্দ্রগুপ্ত ও পাটলীপুত্র প্রভৃতি মিলাইবার চেষ্টা করেন।* মিগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে সান্দ্রাকোটাস, পালীবোথ্রা, হিরেনেবস্ প্রভৃতি কয়েকটি কথা ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের বিবরণের আর কিছুই জানা যায় না, এবং তিনিই যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহাও বুঝা যায় না। সান্দ্রাকোটাস্ যদি চন্দ্রগুপ্তই হন, তাহা হইলে তিনি যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, ইহার প্রমাণ কি? সার উইলিয়ম জোন্স কেবল মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আরও চন্দ্রগুপ্ত যে ভারতের সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সার উইলিয়ম জোন্সের সময় তাহার আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অসাধারণ

* নিম্নে সার উইলিয়ম জোন্সের উক্তির কিয়দংশ প্রদান করা যাইতেছে,—

"I can not help mentioning a discovery, which accident threw in my way.....To fix the situation of that *Palibothra* which was visited and described by Megasthenes, had always appeared a very difficult problem,...We could not confidently decide that it was *Palaliputra*, though names and most circumstances nearly correspond, because that renowned capital extended from the confluence of the *Sone* and the *Ganges* to the city of *Patna*, while *Palibothra* stood at the junction of the *Ganges* and *Erannoboas*.....But this only difficulty was removed, when I found in a classical sanskrit near 2000 years old, that *Hiranyabahu* which the Greeks changed into *Erannoboas*, was in fact another name for the *Sone* itself.....This discovery led to another of greater moment, for *Chandra Gupta*, who from a military adventurer, became like *sandracottus*, the sovereign of upper Hindustan, actually fixed the site of his empire at *Palaliputra*, where he received ambassadors from foreign princes, and was no other than that very *Sandracottus* who concluded a treaty with *Seleucus Nicator*."—Sir William Jones in Asiatic Researches, IV. 10-11. সার উইলিয়ম জোন্সের লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহাকে এই আবিষ্কার করিতে কত দূর কষ্ট-কল্পনা করিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায় ও মুদ্রাদির আবিষ্কারে আরও দুই এক জন চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। এবং তাঁহারাও যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যদি সান্দ্রাকোটাসকে চন্দ্রগুপ্ত ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, যখন মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন কথাই মিগাস্থিনিস হইতে পাওয়া যায় না, তখন তিনি অন্য চন্দ্রগুপ্তই বা না হইবেন কেন? বরঞ্চ তাঁহার বিবরণ হইতে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহই উপস্থিত হয়। মিগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দরবার সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু সেই দরবারে চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী যে এক জন ছিলেন, যাঁহার প্রসাদবলে চন্দ্রগুপ্ত মগধেশ্বর বা ভারতেশ্বর হইয়াছিলেন, সে চাণক্যের কোন প্রসঙ্গই দেখিতে পাই না কেন? মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা লিখিত হইলে যেখানে চাণক্যের কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায় না, সেখানে সে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় কি না, ইহাতে সন্দেহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং মিগাস্থিনিস মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের দরবারে যান নাই, তিনি অন্য কোনও চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গিয়া থাকিবেন। আমরা যদি গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দরবারে তাঁহার উপস্থিতির কথা বলি, তাহা হইলে আপত্তি কি? অবশ্য সে বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক।

মিগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি পর্ণা ও সোণের সঙ্গম-স্থল পাটলীপুত্র নগরের রাজা চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন। এবং তাঁহার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২০ বৎসরের কিছু অল্প বা অধিক। তাহা হইলে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে,—

(১) গুপ্ত বংশের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল।

(২) গুপ্ত বংশের চন্দ্রগুপ্তও সম্রাট ছিলেন।

(৩) গুপ্ত বংশের রাজত্ব খৃঃ পূঃ ৩২০ বৎসরের কিছু কম বা বেশী।

আমরা উক্ত বিষয়গুলি যথাসাধ্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) গুপ্তবংশের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; পরে তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলীপুত্র বা পাটনায় গুপ্তবংশীয়দেরও রাজধানী ছিল। স্মিথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসা-

ইটার পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—
I should be inclined to fix upon
head quarters of the eastern dom
এই সম্বন্ধে তিনি টিপ্পনীতেও অন্য
করিয়াছেন, তাহাও প্রদত্ত হইল। "V
Patna as the Gupta Capital, but
a mistaken notion that Padmat
Pataliputra. (Wilson's Vishnu
note 70). I find that the late
speaks of the Gupta dynesty, t
Magadha or Bihar, the city of
Patna" (Hist. and state. Men
Part I. P. 38). Ayodhya was
cities of the Guptas." ইহার পর
পাটলীপুত্রকে গুপ্তবংশের রাজধানী বি
I am still of opinion that Pata
be considered the Gupta capi
সমীচীন বলিয়া অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্
দেখাইয়াছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে
হইতেছে। এক্ষণে আমাদের প্রমাণ
যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,
রাজত্ব করিবেন। "অনুগঙ্গং প্রয়াগং মাগ
২৪ অ., ১৮ শ্লোক) বায়ুপুরাণেও লিখিত
"অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকে
এতান জনপদান্ সর্ব্বান
দেখা যাইতেছে যে, গুপ্তবংশীয়দে
বোধ। বা পাটলীপুত্র।
(২) এক্ষণে দেখা যাউক, মৌর্য
চন্দ্রগুপ্তও ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন কি
বিষয় অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে
সান্দ্রাকোটাস বলিয়াই আমরা অনু
গুপ্তবংশের রাজগণের যে তালিকা

জানা যায় (১) মহারাজা শ্রীগুপ্ত (২) মহারাজা শ্রীঘটোৎকচ, (৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত। ইহার পর হইতে সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিতে দেখিয়া অবশ্যই ইহা বোধ হয় যে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুপ্তরাজগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ও সম্রাটপদবাচ্য ছিলেন। এবং বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জ প্রদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের সহিত যে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষণ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সহিতও তাহা ঘটিতে পারিত। অতএব মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তও যে ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

(৩) এক্ষণে গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় খৃঃ পূঃ ৩২০ বা তাহার কিছু কম বেশী হয় কি না, ইহাই আমাদিগকে প্রমাণিত করিতে হইবে। গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্মিথ সাহেবের মতে ১৬০। ১৭০ খৃঃ অব্দ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বের আরম্ভ হয়। ওল্ডেনবর্গ প্রভৃতি ৩১৮। ১৯ খ্রীঃ অব্দ উক্ত বংশের রাজত্বকালের আরম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৪০০ খৃঃ অব্দ গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের কাল। মিষ্টার টমাস শকাব্দকে গুপ্তবংশের কাল বলিয়া অভিহিত করেন। লাসেন সাহেব বলেন, সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা গুপ্তবংশের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ হইতে পারে, লাসেন সাহেবের মতে, ইহাও স্থির করা যায়। অতএব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের সময় নির্ণীত হয়। আনুমানিক সময়নির্দ্ধারণে কিরূপ পার্থক্য হয়, সাধারণে ইহার বিচার করিবেন। এক্ষণে আমরা যদি ঐরূপ আনুমানিক সময়নির্দ্দেশের চেষ্টা করি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত একবারে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের মতে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, অর্থাৎ, তাঁহার সময় খৃঃ পূঃ ৩২১ বৎসর। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া লইলে আমাদের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক

হয় বটে, কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ই গ্রীকবিজয় হইয়াছিল, বলিতে চাহি। কারণ, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করায় গুপ্ত-বংশের মধ্যে তিনিই যে পরাক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহার পর হইতে সকলেই উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাসও পরাক্রমশালী ছিলেন, এই জন্য আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাস বলিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাহা বলিলে আমাদের প্রমাণ আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩২৩ খৃঃ পূঃ ধরা যায়, তাহা হইলে, তালিকানুসারে তিনি তৃতীয় পুরুষ হওয়ায়, তাহার ৬০। ৭০ পূর্ব্ব হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ-কাল ধরা যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রবংশের পর গুপ্ত সম্রাটগণকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা প্রথমতঃ কোন্ সময়ে অন্ধ্রবংশের রাজত্বের শেষ হয়, তাহাই দেখাবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা পৌরাণিক মতেই তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক মতের রাজত্ব-পরিমাণ ধরিয়া লইয়াছেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তে পৌরাণিক মতেরই অনুসরণ করিতেছি। বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ, যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অন্ধ্রবংশের রাজত্বশেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা সেই জন্য তিন পুরাণের মতই প্রদান করিয়াছি।

বংশের নাম	বিষ্ণুপুরাণ	বায়ুপুরাণ	মৎস্যপুরাণ
পরিক্ষিতের সময়	৬৫৩ কল্যব্দ	৬৫৩	৬৫৩
পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান	১০১৫	১০৫০	১০৫০
নন্দবংশ	১০০	১০০	১০০
মৌর্য্যবংশ	১৩৭	১৩৭	১৩৭
শুঙ্গবংশ	১১২	১১২	১১২
কণ্ববংশ	৪৫	৪৫	৪৫
অন্ধ্রবংশ	৪৫৬	৪৫৬	৪৬০
	২৫১৮	২৫৫৩	২৫৫৭

উপরে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে কত কল্যব্দে অন্ধ্রবংশের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। ৩১০০ কল্যব্দ খৃষ্টের জন্মকাল। তাহার

৩২১ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকবিজয় হইলে, ২৭৭৯ কল্যব্দ গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময় বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে, বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্রবংশের ২৬১ বৎসর পরে, বায়ুপুরাণের মতে ২২৬ বৎসর পরে ও মৎস্যপুরাণের মতে ২২২ বৎসর পরে, চন্দ্রগুপ্তের সময় স্থির হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উক্ত বংশের পঞ্চম। তাহা হইলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্ততঃ ৬০।৭০ পূর্ব্ব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, গুপ্তবংশের সময় ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীকবিজয় ধরা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে, অন্ধ্রবংশের পর হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভকাল ২০০ বৎসরের কম হইতে আর ১৫০ বৎসর ব্যবধান হইয়া উঠে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরিলে ব্যবধান অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে। যদি আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, বলি,—তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ আপত্তি করিতে পারেন না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সান্দ্রাকোটাস ধরিলে, অন্ধ্রবংশের ও গুপ্তবংশের মধ্যে যে একটু ব্যবধান থাকে, তাহা ২।৪ দিন পরে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কারণ, বর্ত্তমানে গুপ্তবংশের তালিকা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব হইলে সে ব্যবধানটুকু অনায়াসেই পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় যখন গ্রীকবিজয়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্যবধানটুকু একটু অধিক হইতেছে, এবং তাহাও পূর্ণ করিতে ২।৩ জনেরও অধিক অনাবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাটের আবশ্যক হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু অন্ধ্রবংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের একটু ব্যবধান রাখিতে চাহি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশকে আনিয়া ফেলেন, আমরা তাহা ইচ্ছা করি না। পুরাণাদিতে অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশের উল্লেখ নাই। অন্ধ্রবংশের পর নানা স্থানে নানা বংশের কথা লিখিত আছে। যদি অন্ধ্রবংশের পর পর সেই সমস্ত বংশের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে গুপ্তবংশীয়েরা প্রায় আমাদের সমসাময়িক হইয়া উঠেন। সুতরাং কেহ যেন পুরাণাদিতে উল্লিখিত অন্ধ্রবংশের পর যে যে বংশের উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজত্বকাল পর পর ধরিয়া গুপ্তবংশের সময় নির্দ্দেশ না করেন। পুরাণাদির উক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, অন্ধ্রবংশের পরে ভারতে এমন কোন সম্রাট ছিলেন না, যাঁহাদের রাজ্য বহুদূরবিস্তৃত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতক বৎসর

ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বংশ রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে গুপ্তবংশ সর্ব্বতম। উক্ত গুপ্তবংশ ক্রমে রাজ্যবিস্তার করিয়া ভারতের সম্রাট হন। তাঁহারা কণ্ব অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরে নহেন। পুরাণাদিতে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সেই জন্য আমরা অন্ধ্র বংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ পর্য্যন্ত কিছু ব্যবধান রাখিতে চাহি। এবং গুপ্তরাজগণের মধ্যে প্রথমেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট দেখিতে পাই বলিয়া, তাঁহাকে পরাক্রমশালী মনে করিয়া, তাঁহারই সময় গ্রীকবিজয় নির্দ্দেশ করিতে চাহি। সাধারণে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক-বিজয় হওয়া সম্ভব।

যে যে প্রমাণের ভার আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য তাহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা বিচার করিয়া যথা-কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মূলমন্ত্র গ্রীকবিজয় যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় অব্দনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কি বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে? এক্ষণে দিন দিন অশোকাদির যে সকল শিলালিপির আবিষ্কার হইতেছে, তাহার দ্বারা যে সময় নির্ণয় হইতেছে, তাহাও গ্রীকবিজয়ের সাহায্যে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে অথবা অন্যান্য রাজার তাম্রশাসনাদিতে যে সমস্ত লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি সেই সেই রাজার রাজত্বাব্দের অমুক অমুক সংবৎসরে খোদিত বলিয়া দেখা যাইতেছে। তাহার সহিত খৃষ্টাব্দ মিলাইতে গেলে, সেই গ্রীকবিজয় চাই। এক্ষণে আমরা যুক্তি ও প্রমাণের বলে সেই গ্রীকবিজয়কে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে অপসারিত করিয়া গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আনিয়া উপস্থিত করিলাম।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণতঃ যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঐতিবৃত্তিক বিষয়ের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাদের সেই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সাধারণকে বিচার করিতে বলিতেছি। অন্ততঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রমাণের উপর একতরফা ডিক্রী না দিয়া যদি দোতরফা শুনিয়া তাঁহারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতিতত্ত্ব।

আসামের অতি-ঐতিহাসিক জাতি।

আসাম ৭। ৭

রহস্যান্ধকার [illegible]সাদিগের সন্নিহিত প্রদেশ, তথাপি প্রতীচ্য-সভ্যতার আলোকে এখনও তাহার [illegible] নাই। প্রকৃত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। এখনও আসাম সম্বন্ধে আমাদিগের যথেষ্ট জ্ঞান [illegible] রম্য চীচা বণিকদিগের অধম্য উৎসাহে—'চা'র কৃষির কল্যাণে, আসামের বনভূমি এক [illegible] কাননে পরিণত হইয়াছে। আসামে এখনও অতিপ্রাচীন দেবমন্দির ও বিস্তৃত সরোবরসমূহ পরাক্রমশালী প্রাচীন নৃপতিদিগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। মগদিগের উৎপাতই আসামের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এ. এস্. গুহ মহাশয় কোনও ইংরেজীপত্রে আসামের প্রাচীনজাতি সকলের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। ব্রহ্মপুত্র নদের পূতবারিবিধৌত আসাম প্রদেশ প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। তুষারমণ্ডিত

উপক্রমণিকা। অভ্রভেদী গিরিচূড়া হইতে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর পর্য্যন্ত সকলই সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। কোথাও পর্ব্বতগাত্রপ্রবাহিত জলপ্রপাতের মৃদু কলনাদ; আবার তাহারই পার্শ্বে বহুমূল্য-দ্রুমরাশি-সমাকুল অরণ্যানীর স্নিগ্ধ ছায়ায় ভল্লুক ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর গম্ভীর গর্জ্জন। এই প্রাকৃতিকবৈষম্যময় প্রদেশ অতি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে নানা জাতির আবাসভূমি। এই জাতিসমূহের ভাষা ও শাসনপ্রণালী বিভিন্নপ্রকার। আসামের গ্রীষ্মপ্রধান জনাকীর্ণ প্রান্তরে সাধারণতঃ কৃষিজীবীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু, এবং অপেক্ষাকৃত সুসভ্য। অহিফেনসেবনে যদিও ইহাদের জাতীয় জীবন উত্তরোত্তর নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বাণিজ্যব্যবসায়ী ইংরেজের কৃপায় এখন আর তাহাদিগের আলস্যে দিন কাটাইবার তথায় উপায় থাকিতেছে না। অন্য দিকে দক্ষিণাংশের বাযাবর পর্ব্বত্য জাতিগুলি যুদ্ধপ্রিয়; ইহারা স্ব স্ব দলপতির আজ্ঞাধীন। উত্তরে ও পূর্ব্বে কতকগুলি নিতান্ত অসভ্য পর্ব্বত্য শিকারী জাতির বাস। ইহারা সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ ও রক্তপাত লইয়া ব্যস্ত।

লেখকের মতে, "আসাম" আধুনিক নাম। আর্য্যদিগের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বে এ প্রদেশকে কি নামে অভিহিত করা হইত; তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তথাপি তৎ-সাময়িক অধিবাসী জাতিগণের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে।

অনার্য্য জাতি। এতদ্দেশীয় উচ্চবর্ণের অধিবাসিগণই বাস্তবিক আর্য্যপ্রভাবে প্রভাবিত; নিম্ন বর্ণের অধিবাসিগণ হিন্দু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে বটে, কিন্তু পানাহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রাচীন বর্ব্বর নিয়ম হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে

নাই। লেখক বলেন, শূকরমাংস ও আসব-ব্যবহার, এবং স্বামী অথবা স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ইহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক ধর্ম্মাধিকরণে "পত্নী-অপহরণের" মকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং আইন ও উকীলগণের কৃপায়, ইহার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও মফস্বলে হিন্দুধর্ম্মের আলোকরশ্মি আজিও প্রবেশ করে নাই। সে সকল স্থলে প্রাচীন রীতি-নীতি শেষ বহুকাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিদ্যমান। এই মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উনবিংশ শতাব্দী প্রলোভিত দিনে দাসত্বপ্রথার নামান্তরিত কুলী-ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহু লোকের আবাসস্থল করিয়া সাগরে লইয়া আইসে; এবং তাহারা এতদ্দেশেই আপনাদের নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়।

এই অনার্য্য জাতিগণ অতি ঐতিহাসিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবাসিগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। সময়ে সময়ে পর্ব্বত্য জাতিগণও ইহাদিগের নিধন সাধন করিয়া রক্তপিপাসার শান্তি করিয়াছে। লেখকের মতে, এই অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অধিবাসিগণের ইতিহাস প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে ভাষাবিৎ এবং মানবজাতির ইতিহাসবেত্তৃগণ একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

লেখক বলেন, সর্ব্বপ্রথমে নেগ্রিটো জাতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ; আকৃতি খর্ব্ব ও কৃশ, ঘন কেশ কুঞ্চিত; নাসিকার অগ্রভাগ অত্যধিকমাংসল চক্ষু বিস্ফারিত এবং মুখ শ্মশ্রুহীন। ইহারা বাযাবর জাতি। ইহাদের সাম্প্রতিক বাসস্থান নেগ্রিটো জাতি। মধুমক্ষিকার চক্রের ন্যায় বৃহৎকোষ্ঠবিশিষ্ট। ইহারা বহু ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীর, এবং বহু ভগ্নী মিলিয়া এক স্বামীর পাণিগ্রহণ করিত। সন্তানগণ মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। লেখক বলেন, এ প্রথা অদ্যাবধি ভুটিয়া জাতির মধ্যে বিদ্যমান, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে গারো ও খাসিয়া জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। টকলা এবং মিরি জাতির মধ্যে যাহারা পৃথক স্ত্রী ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহারা বহু ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক স্ত্রীর মূল্য সংগ্রহ করে। এই নেগ্রিটো জাতির ভাষা বহুবর্ণবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর।

এই নেগ্রিটো জাতি দক্ষিণ চীন হইতে আগত অন্য এক জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। ভাষাবিদেরা ইহাদের "মন-আনাম" নামকরণ করিয়াছেন। আকৃতি খর্ব্ব হইলেও নেগ্রিটো জাতির ন্যায় ইহারা কৃশ নহে। ইহাদের চুল অত্যন্ত পাতলা; চক্ষু ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধনিমীলিত, নাসিকা উন্নত নহে, মুখ চাপটা রকমের। ইহারা "মন-আনাম" জাতি। অত্যন্ত বৃহৎ গৃহের নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। এই গৃহ কখন কখন ১০০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট উচ্চ হইত, এবং বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। অবিবাহিতদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইত। লেখক বলেন, এরূপ গৃহ নাগা, আবর ও খামটি জাতির মধ্যে আজিও বিদ্যমান। লালং ও গারো জাতির মধ্যেও এরূপ গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি অপ্রচলিত নহে। এই সকল গৃহের সংলগ্ন বৃহৎ বারান্দায় বসিয়া কেহ বা গল্প করে, কেহ বা অন্যান্য কার্য্য করে। আবর জাতির সমুদয় অবিবাহিত যুবক কতকগুলি

বিবাহিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন করিত। ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকলকে রক্ষা করিত। এই "মন-আনাম" জাতি কৃষিব্যবসায়ী ছিল। ইহারা পর্ব্বতগাত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃহৎ বৃক্ষাদির ছেদন করিয়া, ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিত। তার পর সেই জমিতে চাষ করিত। এইরূপ প্রথাকে "ঝুনিং" বলিত। লেখক বলেন, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পর্ব্বতের তৃণবৃক্ষাদিহীন দেহ বহু-শতাব্দীব্যাপী "ঝুনিং" প্রথার ফল। গারো, বোদো ও খাসিয়া জাতির মধ্যে ইহাদের প্রভাব আজও দৃষ্ট হয়।

এই "মনআনাম" জাতি তিব্বত হইতে আগত আর এক জাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। ইহারা হিমালয়ের উত্তর দিয়া প্রথমে পূর্ব্ব দিকে গমন করে, এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসামে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাসিয়া পর্ব্বত ভিন্ন "মনআনাম" জাতির তিব্বতীয় অনার্য্যগণ। অধিকৃত সমুদয় প্রদেশই ইহাদের করতলস্থ হয়। ১৮৭৪ সালে সমগা-ডফিং নামক স্থানের নাগা অধিবাসিগণ কর্নেল জন্‌ষ্টোনকে বলিয়াছিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উত্তরপূর্ব্ব হইতে আগত, এবং তাহারা সাত পুরুষ তথায় বাস করিতেছে। তাহারা গ্রামের স্থাননির্ব্বাচনের সময় সেই স্থানে অনেক হস্তিদন্ত ও হস্তির কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তিব্বতীয় জাতির আকৃতি-অতিশয় বৃহৎ, এবং কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর। ইহাদিগের ভাষা অসুস্কার্য্য-ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ভাষার অনটন হইলে ইহারা আকার-ইঙ্গিতে কার্য্য সমাধা করিত।

আসামী ভাষা।

অতঃপর ঐতিহাসিকযুগে আর্য্যদিগের আসাম-অধিকার সম্বন্ধে লেখক ভবিষ্যতে কিছু লিখিবার আশা দিয়াছেন। লেখক বলেন, আধুনিক আসাম-নিবাসিগণ এই পরম্পরাগত নানাবিধ জাতির মিলনসম্ভূত। নাগা, লুসাই, বোদো প্রভৃতি জাতির ভাষায় তিব্বতীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাগা ও বোদো জাতির মধ্যে সর্ব্বনাম শব্দগুলি তিব্বতীয়, এবং "মনআনাম"-প্রভাবাপন্ন। লুসাইগণ আপনাদের পূর্ব্বাশ্রিত ভাষা ত্যাগ করে নাই। এই সকল জাতির ভাষা ক্রমে মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাষার মূলে চাইনিস্ ও তিব্বতীয় শব্দ দেখা যায়।

আমোদ প্রমোদ।

প্রাচীন অধিবাসীদিগের আমোদ প্রমোদও তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের ন্যায় বর্ব্বরতা-মিশ্রিত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে "মস্তক শিকারের" প্রথা প্রচলিত ছিল। নাগা ও কুকীদের মধ্যে ইহা আজও দৃষ্ট হয়। যত দিন মানুষের মস্তক ছেদন করিতে না পারিত, ততদিন কেহ সম্মানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত না, এবং এই স্ত্রীজনোচিত কাপুরুষতার নিমিত্ত সে সুন্দরীগণের কৃপায় সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নরঘাতকগণ গৌরবচিহ্নস্বরূপ একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। নরহত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন নাগাকে কৌড়ি-খচিত তরবারি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। এই নরহত্যাজনিত সম্মানলাভের আশায় ইহারা গুপ্তভাবে পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিকের প্রাণবধ করিত, এবং কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকেও বধ করিত। হত্যা করিয়া বংশখণ্ড-

প্রণিত নরমুণ্ড হস্তে যখন ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিত, তখন সুন্দরীগণ তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিত। করালগুলি দলপতি অথবা হর্ত্তার গৃহে রক্ষিত হইত। ইংরেজ-রাজ এই নৃশংস প্রথার বিনাশসাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উল্কি পরিয়া দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে ইহারা বিশেষ যত্নবান। সিংকো-জাতীয় পুরুষগণ সামান্য রকম চিত্র করে। রমণীগণ পদদ্বয় ও বক্ষঃস্থল চিত্রিত করে। "আও নাগা" জাতির পুরুষগণ বক্ষঃস্থলে মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিয়া নরহত্যার সংখ্যা নির্ণয় করে।

স্বজাতিপ্রেম ইহাদের এক বিশেষত্ব। আবর জাতির বিবাহিত যুবকগণ বিবাহান্তে পৃথক বাসগৃহের নির্ম্মাণ করে। এই গৃহনির্ম্মাণে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ তাহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করে। অনেক সময় ইহারা পৌঢ়িতদিগের জন্য সস্যের উৎপাদন করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা এই স্বজাতিপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাহারও আজ্ঞাপ্রাপ্তনে সম্পূর্ণ অসম্মত। ইহারা কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। লেখক বলেন যে, এই সাধারণতান্ত্রিক ভাবের অভ্যুদয় কৌতূহলাবহ।

অতি প্রাচীনকালে যখন অসভ্যজাতিগণ সম্প্রদায়বদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, তখন গৃহস্বামীই তাহার সন্তানসন্ততির একমাত্র প্রভু বলিয়া গণ্য হয়। ক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া যখন স্থানে স্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়, তখন প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরগণ এই দলপতিকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। শাসনপ্রণালীও বিশৃঙ্খল হয়। পর্ব্বতীয় গিরি জাতি তাহাদের সাধারণতন্ত্রের রক্ষণের জন্য দলপতির উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত; এ বিষয়ে কেহ দলপতিকে কোনও প্রকার সাহায্য করিত না। স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। দলপতির বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না।

নাগা জাতির সাধারণতন্ত্র।

নাগা জাতির মধ্যে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন ও উহার রক্ষণার্থ বাহুবলই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। দলপতিগণ কোন "রাজস্ব" আদায় করিত না; তাহার আদেশ সকলের মনোমত না হইলে পালিত হইত না। এই জ্যেষ্ঠপদে বংশানুক্রমে পিতার পরে পুত্র নির্ব্বাচিত হইত না। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত। ইহারা অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ। সার জেম্‌স্ ফ্রেন্টন বলেন যে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত দুই পক্ষে সমসংখ্যক নরহত্যা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির আশা একেবারেই নাই। মজুমা ও সেকেমা বিবাদ করিতেছে। মজুমা সেকেমার পক্ষীয় পাঁচ জনকে হত্যা করিয়াছে; সেকেমা মজুমার পক্ষের চার জনকে হত্যা করিয়াছে। সেকেমা বলিবে, "আর এক জনকে হত্যা করিয়া তার পর সন্ধি করিব।" হয় ত একদিন সেকেমা সুবিধা পাইয়া এক জনের পরিবর্ত্তে মজুমার পক্ষীয় দুই জনকে হত্যা করিয়া বসিল। অমনি মজুমা যে পর্য্যন্ত না সেকেমার আর এক জনকে হত্যা করিবে, সে পর্য্যন্ত সন্ধি হইবে না। কাজেই যুদ্ধ পরিসমাপ্তি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কালক্রমে এই সাধারণতন্ত্র উন্নতি লাভ করিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার

নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহ পরস্পরের মধ্যে মধ্যস্থাপন করিল। শাসনপ্রণালী দ্বিরীকৃত নিয়মের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল।

আবর জাতির সাধারণতন্ত্র।

আবর জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাদের শাসনপ্রণালী হইতেই উল্লিখিত সত্যের প্রতিপাদন হয়। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব নিয়মপালনে যত্নবান ছিল, এবং বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সকল সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত। এই সমস্ত সভায় প্রাচীনগণ সভাপতি হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর অধিবাসিগণ বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিয়া আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি করিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি করিয়া "মোরাং" অর্থাৎ সহর থাকিত।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মোড়লেরা রাজনৈতিক আন্দোলনের নিমিত্ত প্রত্যহ একবার করিয়া সমবেত হয়, এবং সাধারণের ব্যয়ে প্রচুরপরিমাণে মদ্যপান করে। সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচারিত হয়। মোড়লেরা কোন উপহার লইতে পারে না। প্রকাশ্য স্থানে যে সমস্ত উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা তাহাদের সাধারণতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। জরিমানা ও রাজেয়প্রাপ্ত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত। লেখক বলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মোড়লসভায় প্রাণদণ্ড অথবা কোনরূপ শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহা হইতে ক্রমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শাসনপ্রণালীতে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কোন কোন স্থলে এক বা অধিক অল্পসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া নিজহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করে।

খাসিয়াদিগের মধ্যে গ্রামের ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণই শাসনভার গ্রহণ করিত। কোন কোন খাসিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশগত দলপতি নির্দ্দিষ্ট ছিল; ইহারা গ্রামের মোড়লদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও সাধারণের মত অগ্রাহ্য হইত না। ইচ্ছা করিলে ইহারা দলপতিকে পদচ্যুত করিতে ও মোড়লদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিত। সাধারণের ব্যয়ে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইত। দলপতিগণের কারারুদ্ধ করিবার এবং শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা ছিল। আবর জাতির বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ইহারাও পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত। ইংরেজগণ খাসিয়া আক্রমণ করিলে ইহারা তিমৎ সিংহের অধিনায়কত্বে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

খাসিয়া রাজতন্ত্র।

জীবনচরিত।

অধ্যাপক বুলার।

প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগিগণের নিকট হোরাশ হোহন উইলসন বুলারের নাম সুপরিচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে সুইজারলাণ্ডে কনষ্টান্ট হ্রদে নৌকা ডুবিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে বোধ হয় তাহা বিদিত আছেন। বিগত এপ্রেল মাসের "এথিনিয়ম" পত্রে মিঃ সিসিল বেণ্ডাল তাঁহার সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হানোভার প্রদেশে বারষ্টেল নাম
পিতা লুথার-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং স্বীয় গ্রামে
শিক্ষালাভ ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পঞ্চদশ
ভারতে আগমন। গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবে
শক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, তদীয় অধ্যাপকের অ
সমাপ্ত করিয়া তিনি তিন বৎসর পারিস, লণ্ডন ও ত
সকল পাঠ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বুলা
কোনও কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি অধ
সাহিত্য" নামক পুস্তকের নির্ঘণ্ট (index) নির্ণয়ে
পরে উক্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় ১৮৬২ অব্দে বোম্বাই শি
তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের স
গুজরাট প্রদেশের স্কুলসমূহের ইনস্‌পেক্‌টর নিযুক্ত
করেন, তখন গুজরাট প্রদেশে সাত শত বিদ্যালয় ও
এ দেশের কার্য্য হইতে তাঁহার অবসরগ্রহণের সম
১৮৬৩ ও ছাত্রসংখ্যা ১০১৯৭ হইয়াছিল।

অধ্যাপক বুলার ও কেলহরণ প্রভৃতি কৃতবিদ্য গ
লোকেরা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেশের লোকি অপেক্ষ
তথাপি ভারতীয় শাসনকর্
সংস্কৃতানুরাগ। ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের
নিজ চেষ্টায় এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে।

শিক্ষাবিভাগীয় কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন প্রদেশে
সংগ্রহ করেন, এবং দেশীয় পাঠাগারগুলির পুস্তকরা
অব্দে কাশ্মীরভ্রমণসময়ে তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের
তথা আবিষ্কৃত হয়। অবশেষে ১৮৮০ অব্দে এ দেশ
করিয়া তিনি ভিয়েনা নগরীতে সংস্কৃতপাণ্ডিত্য
পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক বুলারের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে হি
সহ মনুর অনুবাদ, আপস্তম্ব ও অন্যান্য বিধিকারগণে
মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তকের সংকলনে বোম্বাই আসিয়া
রিচার্ড ওয়েষ্ট তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলে
আভিধানিক ঐক্যের মূল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ও
অনেক সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ সকল প্রকাশি
জর্ন্যাল" ও "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি" পত্রের প্রবন্ধ

ষ্টডিজ্" নামক পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত। এতৎসম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণের সহজবোধ্য হইবে বলিয়া ইহা ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে।" "এন্সাই-ক্লোপিডিয়া অব্ ইণ্ডো-এরিয়ান রিসার্চ্চ" নামক পুস্তকে তাঁহার আজীবন অনুসন্ধানের ফল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছিল। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ও সহযোগী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিকতত্ত্বনিরূপণে নিযুক্ত ছিলেন। সেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইত। কিন্তু হায়! সে মহতী ধীশক্তি এই অনন্যসাধারণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, নিয়তিবশে তাহা অনন্তকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে!

হারাধনের বট।

যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে পরস্রোতা মধুমতীর তীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তাহার চিক্কণশ্যামপত্রবহুল বহু শাখা বিস্তার করিয়া আপনার মহিমাগর্ব্বে গর্ব্বোদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে যেখানে কুলকামিনীগণের স্নানের ঘাট ছিল, তাহার উপরেই এই বটবৃক্ষ অবস্থিত;—এই বৃক্ষতল দিয়াই ঘাটের পথ ছিল। এখন সে ঘাট পরিত্যক্ত;—এখন আর কুলকামিনীকুল সে ঘাটে জলে কলস ভাসাইয়া মধুমতীর নির্ম্মল নীরে আগ্রীব-নিমজ্জিতা হইয়া নানা কথায়, কৌতুকহাস্যে সে ঘাট শব্দমুখর করিয়া তুলেন না; এখন আর বর্ষীয়সীগণ সেই ঘাটের কূলে সৈকতোপরি উপবেশন করিয়া তদ্গতচিত্তে পূজাহ্নিকে রত থাকেন না। এখন সে পরিত্যক্ত ঘাটের পথে তৃণ জন্মিয়াছে;—এখন আর কেহ কক্ষে কলস লইয়া সে পথে গমন করে না; এখন সে পথে কোনও স্নানার্থিনীর অলক্তকরাগরঞ্জিত কোমল চরণের মধুর নূপুরনিক্কণ শ্রুত হয় না; এখন আর সে পথে কাহারও কঙ্কণ কলসে মৃদুমৃদুস্পর্শজনিত মৃদুমধুর ধ্বনি উত্থিত করে না; এখন আর নিদাঘকালে স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কেহ সে বটবৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া যায় না। সে ঘাট এখন শূন্য;—সে পথ এখন পরিত্যক্ত;—সে বটবৃক্ষ এখন একাকী দণ্ডায়মান।

১

পূর্ব্বে গ্রামে হারাধন নামক এক জন গোপযুবক বাস করিত। অল্প বয়সেই হারাধনের মাতাপিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। হারাধন কতকটা পাগল, কতকটা আজন্ম নির্ব্বুদ্ধি, অর্থাৎ "ইডিয়ট"। আত্মীয় স্বজনগণ কেহই এই অসহায় অদ্ভুত জীবটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে নাই; তবে গ্রামের লোকের দয়ায় হারাধন দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পাইত। গ্রামের লোক হারাধনকে দয়া করিত,—ভালও বাসিত। হারাধন তাহাদের অনেক কাজে লাগিত। হারাধনের এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, কেহ তাহাকে কিছু করিতে বলিলে, সে প্রাণপণে সে কাজ করিতে চেষ্টা করিত। কাহারও পীড়া হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামান্তর হইতে ডাক্তার বা কবিরাজ ডাকিতে হইলে, দূরগ্রামে কাহারও কোনও পীড়িত আত্মীয়ের বা কুটুম্বের সংবাদ আনিতে হইলে, হারাধনকে একবার বলিলেই হইল; হারাধন তখনই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিত।

হারাধন এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে বড়ই ভালবাসিত; গ্রীষ্মকালে সে এই তরুমূলেই নিশাযাপন করিত। মধুমতীর কল্‌কলধ্বনি, বটবৃক্ষের ঘন-পত্ররাজির মৃদুমর্ম্মর, আর চারি দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব—এই সকল পাগলের মনে কি সুখ দান করিত, তাহা সেই বলিতে পারে।

সে এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া, গ্রামের লোক—কেহ খড়, কেহ বাঁশ, কেহ বস্ত্র, কেহ বা শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক সাহায্য করিয়া এই বটবৃক্ষের নিকটেই হারাধনের জন্য একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। সেই কুটীরাভ্যন্তরে থাকিয়া হারাধন মধুমতীর বীচিভঙ্গ দেখিতে পাইত, বটপত্রের মৃদুমর্ম্মর শুনিতে পাইত। তাহার কুটীরখানি যেমন ক্ষুদ্র, কুটীরের দ্রব্যাদিও তেমনই সামান্য। কুটীরাভ্যন্তরে গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত কয়খানি বস্ত্রমাত্র থাকিত। হারাধন কুটীরের এক কোণে একটি উনান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। যে দিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না, সে দিন সে আপনি রন্ধন করিত। চাউল প্রভৃতির জন্য তাহার কোন ভাবনা ছিল না—চাহিলেই মিলিত।

২

বর্ষার অপরাহ্ণ। আজ শেষরাত্রি হইতে আর বৃষ্টির বিরাম নাই; এখনও টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘন ধূসর মেঘমালায় মণ্ডিত—

সে নিরবচ্ছিন্ন মেঘাবরণে কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই,—কোথাও এতটুকু নীল দৃষ্ট হয় না। আজ প্রভাত হইতে রৌদ্র দেখা যায় নাই,—এখন সন্ধ্যা না হইতেই চারি দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। নদীর পর পারে তালতরুরাজি স্বচ্ছান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে।

আজ গ্রামের রমণীরা সকাল সকাল ঘাট সারিয়া গিয়াছেন। ঘাটে আর লোক নাই; কেবল এইমাত্র এক কিশোরী কলস কক্ষে জল লইতে আসিয়াছেন। কিশোরীর দীপ্ত গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহে যৌবন তাহার শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; সে দেহে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে—যেন বর্ষাবারিরাশিপ্লাবিতা তরঙ্গিণী কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কুঞ্চিতকেশভারে কবরী শিথিল হইয়া গ্রীবাদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কিশোরীর সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন নাই,—তিনি এখনও অবিবাহিতা। তাঁহার পিতা বড় কুলীন; সে প্রদেশে তাঁহার সমান ঘর দুর্ল্লভ; তাই আজও যুবতীর বিবাহ হয় নাই। যুবতীর এক ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃষসাও এখনও অবিবাহিতা। কৌলীন্যের কল্যাণে সে অঞ্চলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হারাধন আজ আর আপনার কুটীর ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। পূর্ব্ব দিন সে কোথা হইতে কয় মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; আজ দ্বিপ্রহরে আপনি রন্ধন করিয়াছে। এখন একটু অন্ধকার হইতেই সে কুটীরমধ্যে একটি মৃৎপ্রদীপ আলিয়া আপনার ছিন্ন মাদুরখানি বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল,—চালের নিম্নভাগে একটা টিক্‌টিকি একটা ক্ষুদ্র পোকা ধরিতে চেষ্টা করিতেছে।

সহসা বাহিরে ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। হারাধন চমকিয়া উঠিল। এরূপ শব্দ তাহার নিকট পরিচিত; সে বুঝিল,—বর্ষাবারিপাতপ্রমত্তা মধুমতী কোথাও আপনার তটভূমি ভাঙ্গিয়া লইল।

কোথায় তট ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেখিবার জন্য; হারাধন কুটীরের বাহিরে আসিল; দেখিল, ঘাটের বামপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকার চাপ খসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে জলরাশি আবিল হইয়াছে;—জলের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঘাটের পার্শ্বেই জলে একটা পিত্তল-কলস ভাসিতেছে; ঘাটে জনপ্রাণী নাই। কলস তুলিবার জন্য জলে নামিয়া হারাধন পদে নরদেহের স্পর্শ অনুভব করিল। হারাধন জলতল

হইতে একটি রমণীদেহ তুলিল। ঘা
চাপ খসিয়াছিল, তাহারই একাংশ
হইয়াছিল;—সেই আঘাতে তিনি প
গর্ত্তে অল্প জলে প্রভূত ধোয়াট মাটি জ
রমণীর দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছি
আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন
হইয়া আসিতেছিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ লইয়া হারা
তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিতে লাগিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ কুটীরে আ
মাদুরের উপর সংস্থাপিত করিল।
করে নাই;—কুটীর মধ্যে মৃদুতাপ অ
স্পর্শে শীঘ্রই রমণীর চৈতন্যোদয় হই
লেন,—তিনি হারাধনের কুটীরে শয়ান
দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে।
সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া
থাক, আমি বাহিরে বসিতেছি।"
বাহিরে বসিয়া ভিজিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ পরে রমণী একটু সু
বেদনা প্রকাশ পায় নাই। তিনি
নিকটে আসিলে রমণী বলিলেন, "হ
চল।"

রমণী গৃহাভিমুখে চলিলেন; হার
দিক এমন ঘনান্ধকারে ব্যাপ্ত যে, পল্লী
তাঁর পক্ষে সে রাত্রে গৃহে যাওয়া সম্ভ
বলিলেন, "কি অন্ধকার! সাপের ঘাড়ে
যুবতী গৃহে উপনীত হইলে তাঁহ
এই যে সারদা, এতক্ষণে আসিলি! এ
আছে? আমি ভাবিয়া সারা হইতেছি
সারদা সিক্তবস্ত্রেই সেইখানে বসি

বলিল। তখন গৃহিণী বাটীর সকলকে শুনাইবার মত উচ্চস্বরে বলিলেন, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই, মা, আজ ভো'কে পাইয়াছি।"—শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে একটু ক্রন্দনের ঝঙ্কার আসিল।

সহসা এই কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা কি, তাহা জানিবার জন্য, বাটীর সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন গৃহিণী সারদার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা (এবং দুই-চারিটা অতিরিক্ত কথাও) বলিলেন, এবং সর্ব্বশেষে, গল্পসমাপনে "আমার কথাটি ফুরাল" ইত্যাদির মত, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই সারদাকে পাইলাম" বলিতে ভুলিলেন না। গৃহিণীর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া পৌত্রী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া সে বলিল, "তবে যে, ঠাকুমা, তুমি বল—মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি। মানুষকে দিলেও গেলি?"

"তুই বড় জ্যাঠা হইয়াছিস" বলিয়া গৃহিণী তাহাকে এক তাড়া দিলেন, এবং কর্ত্তাকে বলিলেন, "হারাধনকে কাল এখানে খাইতে বল।"

সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাধনের সন্ধানে বহির্বাটীর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু হারাধনকে আর সেখানে পাওয়া গেল না; সে ততক্ষণ কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গিয়াছে।

৩

পর দিবস প্রত্যূষে পাড়ার আর আর গৃহিণীদিগের সহিত এই দুর্ঘটনার কথা বলিতে বলিতে ঘাটে যাইবার সময় সারদাসুন্দরীর মাতা ঘাটের পথ হইতে হারাধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হারাধন, আজ আমাদের বাড়ী খাইয়া আসিস্।" কুটীরের বাহিরে আসিয়া হারাধন উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা, মাঠাকরুণ।"

সারদার মাতার কথা শুনিয়া বামার মাতা বলিলেন, "ভরা সন্ধ্যায় কি মেয়েকে একলা ঘাটে যাইতে দিতে আছে! ও নিশ্চয় 'উপর-দৃষ্টি'। ভালয় ভালয় রক্ষা হইয়াছে, এখন একটা স্বস্ত্যয়ন করাইও।"

নদীতীরে একখণ্ড মৃত্তিকা বসার মত একটা তুচ্ছ নৈসর্গিক ব্যাপার লইয়া গ্রামের গৃহিণীগণ যতপ্রকার মতামত প্রকাশ করিলেন, সে সকল বর্ণিবার স্থান আমাদিগের নাই; তবে এ কথাটা স্থির রহিল যে, "উপর-দৃষ্টি" নহিলে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই।

সেই দিন মধ্যাহ্নে হারাধন সারদার পিতৃগৃহে আহার করিতে গেল।

গৃহিণী আপনি দাঁড়াইয়া তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। সেই দিন হইতে হারাধন প্রায়ই সারদাসুন্দরীর পিতৃগৃহে যাইত। দুই তিন দিন টারপিন মালিস করিয়া নারদার দেহের ব্যথা দূর হইল। হারাধন তথায় গেলে, হয় সারদা স্বয়ং, নয় ত তাহার জননী, তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

এমনই ভাবে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল।

পাগল হারাধন কিছু ভাবিত কি না,—সে কিছু ভাবিতে পারিত কি না, তাহা সেই বলিতে পারে। হয় ত বা তাহার হৃদয়ের কোনও নিভৃত প্রান্তে কোথাও মরুমধ্যে ওয়েসিসের মত এমন একটু অংশ ছিল, যাহা অপর সকলের হৃদয়ের মত সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ, অনুভব করিতে পারিত। অনুশীলনের অভাবে আলোকবিহীন স্থানে উদ্ভিদের মত তাহার হৃদয়ের সে অংশ বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। ঘনান্ধকারমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশে যেমন চারি দিক সচকিত হইয়া উঠে, তেমনই কোন তীব্র সুখ বা দুঃখ, ঘৃণা বা ভালবাসা, আনন্দ বা বিষাদ অনুভব করিলে, তাহার রুদ্ধ মানসীশক্তি সচকিত হইয়া উঠিতে পারিত। একখানি প্রস্তরের অন্তরায় অপসারিত করিলে যেমন নির্ঝরের বারিরাশি বিনির্গত হয়, তেমনই হয় ত একটা কারণে তাহার হৃদয়ের সেই অংশ সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিতে পারিত। সে কথা কে বলিতে পারে!

হারাধন কি ভাবিয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। তবে একদিন সকালে সে সারদার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। তখন সারদার দুই ভ্রাতা ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ নিবিষ্টচিত্তে একটা ডাবা হুঁকায় ধূমপানে রত ছিলেন; কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের এক পুত্রের জন্য একখানা ঘুড়ী প্রস্তুত করিতেছিলেন। হারাধনকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "কি রে, হারাধন!" হারাধন বলিল, "একটা কথা বলিব!" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোর আবার কথা কি?" হারাধন বলিল, "ঠাকুরুণের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন না কেন?"

তাহার কথা শুনিয়া সারদার জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "দূর পাগল! ও কথা বলিতে নাই।" শুনিয়া হারাধন ফিরিয়া চলিল। তখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "দাদা, ওটা ত পাগল। উহার কাণ্ডজ্ঞান নাই;—উহাকে আর বাটীতে আসিতে দিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি হারাধনকে ডাকিলেন।

হারাধন ফিরিয়া আসিল;—তিনি তাহাকে বলিলেন; "তুই আর আমাদের বাড়ী আসিস্ না।" হারাধন পূর্ণোন্মুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার বক্তার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপনার কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গেল।

তখন পরিপার্শ্বে পাড়ার কলহনিরতা দুই জন রমণীর উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। ইহারা দুই জন গ্রামের প্রসিদ্ধ ঝগড়াটে; এরূপ কলহ ইহাদিগের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের লোকে বলিত যে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কোন দিন কলহ করিবার লোক না পাইলে বেণীবনে বিমুক্ত কেশ বাধাইয়া "কালামুখি আমার চুল ধরিলি কেন?" বলিয়া ঝোপের সহিত বেশ কলহ করেন; তাহার পর জলগ্রহণ করেন। কলহকালে আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণের পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী-বাণী কিরূপে আত্মবিচ্যুতিকরে পরিণত হয়, তাহা যাঁহারা না শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই। হারাধন যখন পথ দিয়া যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল, কলহকারিণীদ্বয়ের মধ্যে এক জন অপরকে সম্বোধিয়া বলিতেছেন, "লোকসমাজে ও-পোড়ামুখ দেখাইতে তোর লজ্জা করে না? কেন? এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরিতে পারিস্!"

শুনিয়া হারাধন আপনা-আপনি বলিল, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি!" সে আপনার কুটীরে গেল; সে দিন আর বাহির হইল না।

সেই দিন হইতে হারাধন মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনি গম্ভীরভাবে বলিত, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি।"

৪

কিছু দিন পরে বহু চেষ্টায় সারদার বিবাহের পাত্র মিলিল। অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক দরদাম, অনেক চড়াদর হাঁকা ও সস্তাদর ডাকা প্রভৃতির পর পাওনা স্থির হইলে, পঞ্চাশৎবর্ষীয় পাত্র আর একবার টোপর মাথায় দিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল, সারদা, তাহার এক ষষ্ঠবর্ষীয়া পিতৃব্যপুত্রী ও তাহার ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃষসা একত্র সেই একই "বরে" প্রদত্তা হইবেন। বরের পক্ষে ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তিনি দ্বাদশবার ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং সেই দ্বাদশবারে তাঁহার ভাগ্যে উনবিংশটি রমণীরত্ন লাভ হইয়াছিল।

চুক্তিদরের কিছু অগ্রিম পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটক, নাপিত ও পাঁচ ছয় জন

লোক লইয়া বর বাটী হইতে বাহির হইলেন। কন্যার গ্রামের প্রান্তে সরোবরকূলে আসিয়া বরযাত্রীরা মেটে পথের এক হাঁটু ধূলি বিধৌত করিয়া ফেলিল, বৌচকা হইতে জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিল, উত্তরীয় লইয়া তৈলমর্দ্দনপিচ্ছল গাত্রদেশে বিলম্বিত করিল,—সাজগোজ শেষ করিয়া সকলে বরের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করিল।

হারাধন তখন কোথায় যাইতেছিল। গ্রামে একখানা পাল্কী ও এতগুলি অপরিচিত লোক দেখিয়া সে এক জন বাহককে জিজ্ঞাসা করিল, "পাল্কীতে কে?" বাহক তখন বিবাহবাড়ীর বক্সিসের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল,—হারাধনের কথা কাণে তুলিল না। পথে এক দল বালক খেলা করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "হারাধন, ব্রাহ্মণবাড়ী বিবাহ। সেই, তুমি যাহাকে জল হইতে তুলিয়াছিলে, আজ তাহারই বিবাহ।"

হারাধন চলিয়া গেল।

এক দল ছেলে চেঁচাইতে চেঁচাইতে, ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে পল্লীপথে ধূলি উড়াইয়া বরের পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবাহবাড়ী পর্য্যন্ত চলিল। ভল্লুক যেমন মশকের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া উঠে, অথচ তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারে না, বরযাত্রিগণও সেইরূপ বিষম বিরক্ত হইয়াও বালকদলকে তাড়াইবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৫

সন্ধ্যার পর "লগ্ন" উপস্থিত হইলে, বর যাইয়া আলিপানা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইলেন। কনে তিনটি পূর্ব্বেই সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সম্প্রদানের কিছু পূর্ব্বে মর্য্যাদার একটা কথা উঠিয়া তর্ক উপস্থিত হইল। মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশিখাধারী পুরোহিত হইতে টোপরপরা বরটি পর্য্যন্ত সকলেই সে তর্কে যোগদান করিলেন। তর্ক উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। জরাজীর্ণা পিসিমার আরও বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতেছিল; তিনি বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আর বসিয়া থাকিতে পারি না। বাপু, একটা ফুল ফেলিয়া দাও।" চারি দিক হইতে সকলে "কি কর! কি কর!" করিয়া উঠিল। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণের জন্য পিসিমার আর সে বরের সহিত বিবাহ হইল না—বোধ হয়, জীবনের অবশিষ্ট কয় দিনের মধ্যে তাঁহার কৌমার্য্যদশা শেষ হইবার সম্ভাবনাও শেষ হইয়া গেল। কোন রূপে অশ্রুসংবরণ করিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তর্ক মিটিলে বিবাহ হইল। সমবয়স্কা ও অসমবয়স্কাদিগের নিকট সারদা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে সে দৃঢ় বুঝিয়াছিল যে, ভূমিসম্পত্তির মত স্বামিসম্পত্তিতেও দখলীস্বত্বই ধ্রুবস্বত্ব; কাজেই দখল ছাড়া কিছু নহে; তদ্ভিন্ন নিজের রূপের গর্ব্বও যে তাহার ছিল না এমন নহে; (কাহারই বা না থাকে?) সে ভাবিয়াছিল যে, যৌতনের আকর্ষণে স্বামীটিকে দিন কয়েক কাছে রাখিতে পারিলেই, সে আপনার রূপ-বহ্নিতে তাঁহার পক্ষ দুইখানি ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারিবে। তাই শনিবার রাত্রেই সে স্বামীর সহিত তাঁহার গৃহে যাইতে চাহিল। স্বামী প্রথমে ঘৃণাভাব প্রভৃতি আপত্তি করিতে লাগিলেন। সারদা বলিল, "তোমার চরণসেবা করিতে পাইলে, সকল কষ্টই আমার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হইবে।" এই বলিয়া সারদা দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিল। তাহার সেই প্রভাত-শিশির-সিক্ত রবিবিম্বৎ অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া স্বামীর সঙ্কল্প টলিল। সারদা মনে মনে হাসিল, ভাবিল,—"তুমি পুরুষ, তোমার সাধ্য কি যে চাতুরীতে রমণীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে! চিরকালই নামে তোমরা প্রভু, আমরা দাসী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রভু, তোমরা দাস! চিরদিনই শ্যামার চরণতলে শিব, মহেশের মস্তকে মন্দাকিনী।"

তাহার পর সারদাসুন্দরী একবিংশতি সরিকের একজন হইয়া বিংশতিটি সপত্নী-সঙ্কুল স্বামিসম্পদে আপনার অংশ বুঝিয়া লইতে ও দখল রাখিতে স্বামিগৃহে গেল;—মনে আশা ছিল, ক্রমে একাই সবটা দখল করিয়া লইতে পারিবে।

সারদার সপত্নীরা সকলে স্বামিগৃহে থাকিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহারা আর স্বামিসদনে আসিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল, কেবল তাঁহারাই স্বামিগৃহে বুকড়ী চাউলের অন্ন আহার করিয়া ও পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এখন একজন সাধারণ শত্রু উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী সন্ধিসংস্থাপন করিয়া, ঝগড়া আপোষে মিল করিয়া ফেলিলেন ও সমবেতশক্তিতে সারদাকে আক্রমণ করিলেন।

সারদা চালাক মেয়ে, সে প্রথমেই সপত্নীদিগকে চটাইল না। সে প্রথমে তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিল, তাহার পর স্বামীর উপর আপনার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া লইয়া সপত্নীদিগকে দুই পায় ছেঁচিতে লাগিল। ক্রমে সেই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, স্বামী তাহার হস্তে খেলিবার পুতুল হইয়া দাঁড়াইলেন।

এমনই ভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর সারদার স্বামী এক ধনীকে কন্যাদায়মুক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। এবার আর সারদা স্বামীকে বাগে রাখিতে পারিল না; অর্থলোভে তাহার স্বামীটি অসমসাহসে বিষম জোরে টান দিয়া দড়া ছিঁড়িলেন। সারদা বুদ্ধিমতী;—সে বুঝিল যে, আর বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নহে; অধিক কচ্‌লাইলে লেবু তিক্ত হইয়া উঠিবে; বিশেষ এ বিবাহে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ ধনীর দুহিতা আর দরিদ্র স্বামীর ঘর করিতে আসিবে না, মধ্য হইতে কিছু অর্থলাভ হইবে।

সারদার অনুমানই সত্য হইল। পাঁচ ছয় দিন পরেই স্বামী ফিরিয়া আসিলেন;—সঙ্গে কিছু অর্থও আনিলেন। তাঁহার নবপরিণীতা বধূ পিত্রালয়েই রহিলেন। গৃহে সারদাসুন্দরীর প্রভাব যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

৩

কিন্তু সারদার সুখ অধিকদিন সহিল না। শেষ পক্ষের শ্বশুরালয়ে পানাপুকুরের পচা জল পান করিয়া স্বামী জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত, মধ্যে মধ্যে যাইত,—জ্বর না থাকিলে, আনাহার সাধারণ মতই চলিত। ক্রমে নিত্যই একটু জ্বর দেখা দিতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় নাড়ী টিপিয়া "পুটপাকের বিষমজ্বরারি লৌহ" ব্যবস্থা করিলেন। জ্বর বন্ধ হইল না; শীতের প্রারম্ভেই রোগীর পা ফুলা ফুলা বোধ হইতে লাগিল। সারদার অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা সত্ত্বেও শীত যাইতে না যাইতেই তাহার কপাল ভাঙ্গিল।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামিগৃহে সারদার সকল প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল। এখন সপত্নীদিগের জ্বালায় তাহার পক্ষে সে গৃহে বাস করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিধবার পুণ্য শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া অলঙ্কারহীন প্রকোষ্ঠে, বিধবা সারদা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। কন্যাকে দেখিয়া মাতা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; মাও কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়েও কাঁদিতে লাগিল।

কয় দিন পরে একদিন জননীর সঙ্গে স্নানার্থ ঘাটে যাইবার সময় সেই বটবৃক্ষের নিকটে হারাধনের কুটীর দেখিয়া সারদা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, হারাধন কি আজও বাঁচিয়া আছে?" মা বলিলেন "আছে বৈ কি!" সারদার অনুরোধে তাহার জননী হারাধনকে সে দিন তাঁহাদিগের গৃহে যাইয়া আহার করিতে বলিলেন। শুনিয়া হারাধন কিছুক্ষণ নদীর দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সম্মতি প্রকাশ করিল।

হারাধন আসিলে সারদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হারাধন, আমায় চিনিতে পার?" হারাধন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না।" সারদা-সুন্দরীর বিষাদবিমলিন আনন, কোটরগত নয়ন, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। সারদা বলিল, "আমি সারদা। সেই যে আমি নদীতে ডুবিয়া গেলে তুমি আমাকে তুলিয়াছিলে!" হারাধন কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মাথা নীচু করিয়া অতিকষ্টে, অতিকাতর, অতিক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "চাঁদাকি নও না। তুমি সে নও ঠাকরুণ, তুমি সে নও।" নিশ্চয়ই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে মূর্ত্তির কথা ভাবিয়াছে, সে মূর্ত্তি আর এ মূর্ত্তি এক কি?

হারাধন রাস্তার দিকে চলিল। সারদা ডাকিল, "হারাধন, ভাত খাইয়া যাও।" হারাধন ফিরিল না;—সে যাইতে যাইতে শুনিল, সারদার পিতা বলিলেন, "ও পাগল। উহার কি বুদ্ধি আছে যে, কিছু রাখিতে পারিবে?" শুনিয়া সারদা বলিল, "আহা, উহার কি দুঃখের জীবন!" আপনি দুঃখে দগ্ধ হইয়া সারদা অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করিতে শিখিয়াছিল।

হারাধন আপন মনে বলিতে বলিতে গেল, "আমার জীবন কি এতই দুঃখের! তবে এ জীবন রাখি কেন?" সে যাইয়া আপন কুটীরে প্রবেশ করিল। সারদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাকিতে আসিলেও হারাধন আর কুটীর হইতে বাহির হইল না।

* * * * *

পরদিবস প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানার্থিনীরা ঘাটের পথে বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়াই, কক্ষের কলস ফেলিয়া ভয়চকিত ভগ্নস্বরে ত্রস্তপদে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া গ্রামের লোক সেখানে গেল। জীবনের ক্ষুদ্র সুখে দুঃখে হারাধন যে বটবৃক্ষকে এত ভালবাসিত, সেই বটবৃক্ষই তাহার মরণের অবলম্বন হইয়াছে;—বটশাখায় রজ্জু ঝুলাইয়া সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সেই অবধি গ্রামের লোকে সেই বটবৃক্ষটিকে 'হারাধনের বট' বলিয়া থাকে। হারাধনের 'অপমৃত্যুর' পর হইতে একটা অজ্ঞাত ভীতির আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পর প্রাণান্তেও সে বটবৃক্ষের নিকটে যাইতে স্বীকৃত হয় না। কেহ সে বিষয় লইয়া তাহাদিগকে কোনরূপ উপহাস করিলে তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি ওখানে আশঙ্কার কোন কারণ না থাকে, তবে ও বটবৃক্ষে পাখীরাও বাসা বাঁধে না কেন?" বাস্তবিক 'হারাধনের বটে' কেন জানি না, কোন পাখীই বাসা বাঁধে না।

ভারতবর্ষে।

মার্কটোয়েন ছদ্মনামধারী, সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান পরিহাসরসিক, মিষ্টার স্যামুয়েল ক্লিমেন্স, বৃদ্ধবয়সে প্রকাশ[illegible]র ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণপরিশোধকল্পে দেশে দেশে বক্তৃতা [illegible] অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে পৃথিবীপরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া সাহিত্যসেবকের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার [illegible] ইহাই প্রথম নহে। সার ওয়াল্টার স্কট ও বৃদ্ধবয়সে প্রকাশকের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নেও বিশ্রামলাভ করিতে পারেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে ঋণশোধচেষ্টায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

মার্কটোয়েন [illegible] Tramps Abroad নামক গ্রন্থে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের আভাস প্রদান করিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষাংশে মার্কটোয়েন বোম্বাই সহরে আসিয়া উপনীত হয়েন। বোম্বাইয়ে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিল—বর্ণ বৈচিত্র্য ও দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার। বোম্বাই দেখিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

বোম্বাই সহর সুমোহন—মনোহর—বিস্ময়োৎপাদক, দেখিলে স্বতঃই আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। প্রকাণ্ড সহর, সহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ—দেশীয়দিগের তুলনায় য়ুরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি সামান্য। এখন শীতকাল, তবু আকাশে আমাদিগের দেশের জুন মাসের আকাশের মত শোভা; বৃক্ষরাজি ও সেই সময়োপযোগী পত্রপল্লবশোভাসমন্বিত। সম্মুখে ঘনচ্ছায় তরুতলে সমুজ্জ্বল বস্ত্রে বিচিত্রবেশধারী দেশীয় চরনারীগণ উপবিষ্ট। যানাদিতেও সেই শোভা। এই সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ হয় না। বাজারে দেশীয়গণের জনতা, পরিধেয়বস্ত্রের ও সৌধমালার বর্ণ বৈচিত্র্য অনির্ব্বচনীয়। সে শোভা প্রাচীন ভারতের প্রণালীতে গঠিত বাজারেরই উপযোগী। আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বায়ুসেবনের সময় উপস্থিত হয়, তখন আর এক প্রকার দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। * * * এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমজীবিগণ দলে দলে গৃহাভিমুখে গমন করিতে থাকে। পুরুষের পরিধানে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র, কেবল তাহাই কোমরে বেষ্টিত। তাহাদের গঠন অতি সুন্দর, বর্ণ পাটল, চর্ম্ম সাটিনের ন্যায় চিক্কণ ও উজ্জ্বল। রমণীরা তন্বী, তাহাদের দেহযষ্টি সুগঠিত—সরল; একখানি সমুজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত। তাহাদের হস্তে, পদে ও নাসিকায় সামান্য কিছু অলঙ্কার। তাহাদিগের গতি সরল, চলন গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক,—সেই এক দৃশ্য।

দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার দেখিয়া আমেরিকার ক্রীতদাসগণের প্রতি কুব্যবহারের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।—

ভারতবর্ষীয়গণ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রকৃতি ও কোমলভাবাপন্ন। তাহাদিগের ব্যবহারেই তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আমাদিগের বরেণ বারান্দায় একটি সুবৃহৎ কাচের দ্বার ছিল। সেই দ্বারে একটা কি করা আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্য একজন শ্রমজীবী আহূত হইল। দেখিয়া বোধ হইল, সে ভাল করিয়াই কাজ করিতেছিল, কিন্তু হয় ত সে ভাল করিতেছিল না, কারণ (হোটেলের) সেই বিশালকায় জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীটি কোন দোষ না দেখাইয়া, তাহার গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল,—পরে তাহার দোষ দেখাইয়া দিল। আমাদের সকলের সম্মুখে এরূপ আচরণ বিশেষ লজ্জাকর বলিয়া মনে হইল। সেই দেশীয় লোকটি এই ব্যবহার ধীরভাবে সহ্য করিল। আমি পঞ্চাশ বৎসর এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া নিজের বাল্যজীবনের কথা আমার মনে পড়িল। আর মনে পড়িল যে—তখন এইরূপ করিয়াই ক্রীতদাসদিগের নিকট মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইত। তদবধি সেই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া তখন তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইত এবং সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি যে অন্য কোনরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু তথাপি তখন এইরূপ ব্যবহারে সেই হতভাগ্যগণের প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হইত, আর সেই শান্তিদাতার জন্য আমি লজ্জা বোধ করিতাম।—

ভারতবর্ষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মার্কটোয়েন বলিয়াছেন,—

এই দেশ * * * মানবজাতির শৈশবাবস্থার ক্রীড়াভূমি, ভাষার উৎপত্তিস্থল, ইতিহাসের জন্মভূমি, whose yesterdays bear date with the mouldering antiquities of the rest of the nations. কেবল এই দেশেই ভিন্নদেশীয় নৃপতি বা কৃষক, পণ্ডিত বা মূর্খ, ধনী বা নির্ধন, সকলের পক্ষেই সমান আকর্ষক। একবার সাম্রাজ্যরূপে এই দেশ দেখার সহিত পৃথিবীর অন্য সকল স্থান দেখাও সমান নহে।

ভারতে ভৃত্যের মাসিক বেতন সাধারণতঃ সাত টাকা, কৃষাণের মাসিক বেতন সাধারণতঃ চারি টাকা মাত্র।—এই কথার উল্লেখ করিতে গিয়া মার্কটোয়েন বলিয়াছেন যে, কয়েক জন দেশীয় ভদ্রলোক মধ্যভারতের চিফ-কমিশনারের নিকট ভারতের দারিদ্র্যের কথা বলায়, তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে কৃষাণের বেতন মাসে আট আনা মাত্র ছিল।—লেখক এই উপলক্ষে তৎকালীন ও বর্ত্তমান সময়ের খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য ও করভারের তুলনা করিয়া দেখাইলে বিদেশীয় পাঠকগণ ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের বিষয় বুঝিতে পারিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষ নগরপ্রধান দেশ নহে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে নগর নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের এই বিশাল জনসমবায় প্রধানতঃ কৃষিজীবী। সমস্ত ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড

কুবিস্তৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন ভারতের দারিদ্র্য কি বিশাল।

তন্ত্রান্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ভারত অদ্বিতীয়—ইহার তুলনা সম্ভবে না। বিশাল ব্যাপার কেবল ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। যখন অন্য কোন দেশে কোন বিষয়ে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, তখন অপর কোনও দেশে যে সেই বিষয়ে সেইরূপ বিশেষত্ব দৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহের আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ভারতসম্বন্ধে ব্যাপার স্বতন্ত্র। * * *

মহামারী ভারতেই উৎপন্ন। ভারতবর্ষই ইহার রাজ্য,—লীলাভূমি।

সতীদাহও ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। বৎসরে আট শত বিধবা স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বামীর মৃতদেহের সহিত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এ দৃশ্য দেখিয়াছে, এমন লোক আজও জীবিত আছে। ইংরাজ রাজ বাধা না দিলে এখনও বৎসরে আট শত বিধবা স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করে।

দুর্ভিক্ষই ভারতবর্ষের প্রধান বিশেষত্ব। অন্যত্র দুর্ভিক্ষ সামান্য ব্যাপার—ভারতে তাহা বিরল ব্যাপার। অন্যত্র দুর্ভিক্ষে শত শত লোকের মৃত্যু হয়, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের স্মরণ লোপ হইলে প্রজাবিপ্লব হইয়া উঠিলে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে।

ভারতবর্ষে ত্রিশতি লক্ষ দেবতা—সকলেই উপাসিত। ধর্ম সম্বন্ধে অন্য সকল দেশ তেউড়িয়া, কেবল ভারতবর্ষই কোরপতি।

ভারতে সকলই বিশাল। দারিদ্র্যবিষয়েও অন্য কোনও দেশ ভারতের সহিত তুলনীয় নহে। এক সময়ে তাহার ধনও তেমনই অসাধারণ অমিত ছিল। তাহার বহু অর্থ-জ্ঞাপক শব্দগুলি এক একে কোটীর সমাপ্ত। আমরা বলি এক শত হাজার, ভারতে বলে—লক্ষ; আমরা বলি—দশ মিলিয়ন, ভারতে বলে—কোর।

কি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারেই ভারতবাসীগণ সুকঠিন শৈলাভ্যন্তরে মহামন্দিরমালা ক্ষোদিত করিয়াছে, আবার তাহাতে কত মূর্ত্তি, কত স্তম্ভ, নির্ম্মিত করিয়াছে, আর সেই সকল চিরস্থায়ী প্রাচীর কত চিত্তাকর্ষক চিত্রে সুশোভিত করিয়াছে। তাহারা যে সকল দুর্গের নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে সকলের তুলনায় অন্যান্য জাতির প্রধান প্রধান দুর্গও অতি ক্ষুদ্র। মূল্যবান গঠনপারিপাট্যে, শিল্পচাতুরীতে ও সৌন্দর্য্যে তাহাদের প্রাসাদমালার তুলনা নাই। তাহাদের নির্ম্মিত একটি সমাধিস্তম্ভ দেখিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে লোক আইসে।

ভারতবর্ষে আশীটি বিভিন্ন জাতি—আশীটি বিভিন্ন ভাষা।

জাতিভেদও ভারতবর্ষের বিশেষত্ব,—আর ভারতবর্ষের বিশেষত্ব—ঠগী সম্প্রদায়।

আদিতে ভারতবর্ষই সর্ব্ব দেশের অপেক্ষা অধিক উন্নতিশীল ছিল। এখানে সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়, এখানেই পার্থিব ধনের প্রথম সঞ্চয়, এখানেই গভীর দার্শনিকগণের ও কূশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণের প্রথম আবির্ভাব। এই দেশের প্রাধান্য সমুদ্ধ রাখাই উচিত ছিল। দ্বারভাঙ্গে বিদেশীয়ের অধীন না থাকিয়া আজ ভারতেরই সর্ব্বদেশের অধিপতি ও নিয়ন্তা হইবার কথা।

কিন্তু এই জাতিভেদের দেশ—এই ভাবাভেদের দেশে, তাহা সম্ভবপর নহে। দেশের এরূপ অবস্থায় দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না।

বরদায় য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত নূতন প্রাসাদ দেখিয়া গ্রন্থকার বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—বহুমূল্যত্ব ব্যতীত ইহার আর কোনও গুণ নাই। ইহার পর পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন;—ঠগীনিবারণের এই এক বিষময় ফল; ঠগী থাকিলে, বোধ হয়, এই প্রাসাদনির্ম্মাতা নিস্তার পাইত না!

গ্রন্থকার যখন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন, তখন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মাঘ-মেলা। সেই বিশাল জনসমুদ্র দেখিয়া গ্রন্থকার বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থযাত্রীতে পথ পূর্ণ। কারণ এখন এখানে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বলগ্ন হইতেছে; ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে যাত্রিদল সমাগত হইতেছে। কত জন কত মাস ধরিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ধূলি, রৌদ্র, সকল সহ্য করিয়া, ক্লান্তিক্লিষ্ট হইয়া কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখন সুখী ও সন্তুষ্ট, পথকষ্টের কথা আর তাহাদের মনে নাই;—কারণ, পুরস্কার সন্নিহিত; কারণ, তাহাদের ধ্রুববিশ্বাস যে, এখানে—এই পূতসলিলে স্নান করিলে তাহাদের—সকল কল্মষকালিমা বিধৌত হইয়া যাইবে, তাহারা পবিত্র হইবে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসে বৃদ্ধ ও যুবা, সুকোমল ও রোগী—লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দচিত্তে এই অসহনীয় কষ্ট-সহ্য করে, সে বিশ্বাস কি প্রবল! ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক, ভারতবাসীরা এই কার্য্য করে। আমরা যেতকায়গণ এ কষ্টের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু এই দেশীয়গণের সহিত আমাদের অবশিষ্টাংশের তুলনা করা যায় না। তথাপি আমরা স্বার্থত্যাগের কথা বলি। আশা করি, আমরা এইটুকু বড় যে, আমরা হিন্দুদিগের এই স্বার্থত্যাগের সম্মান করিতে পারি।

বর্ষে বর্ষে এখানে বিংশতি লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। আর কত লোক যে যাত্রা করিয়া জ্বরাভারে, পথকষ্টে, পীড়ায়, উপযুক্ত আহারাভাবে পথে প্রাণত্যাগ করে, কেহ তাহার তালিকা রাখে না। আবার কত জন যে গৃহে ফিরিয়া এই সকল কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাও কেহ জানে না। এই এক বিশাল কাণ্ড!

এলাহাবাদ হইয়া গ্রন্থকার বারাণসীতে গমন করেন। সেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের জ্বলন্ত প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

বারাণসী দেখিয়া কাহাকেও হতাশ হইতে হয় না। বারাণসী দেখিবার উপযোগী বটে। গঙ্গার একটা বড় বাঁকে, উচ্চভূমিতে কাশী সংস্থাপিত। সেই উচ্চভূমি গৃহে পরিপূর্ণ। সেই গৃহপূর্ণ সহরে সঙ্কীর্ণ পথগুলি যেন নিরবচ্ছিন্ন অট্টালিকা-মালার মধ্যে ফাটল বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে মন্দিরচূড়াগুলি দৃশ্য আরও সুন্দর করিয়া তুলে। সেই সঙ্কীর্ণ রাজপথে অবিরাম জনস্রোত দেখিলে পিপীলিকাশ্রেণীর কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে এক যম উৎপাত—গাভী। এই পবিত্র জীবকে কেহই তাড়না করে না, কাজেই তাহার জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বারাণসী ঐতিহাসিক যুগ অপেক্ষাও সুপ্রাচীন—উপকথা ও কিম্বদন্তী অপেক্ষাও পুরাতন।

হিন্দুর মতে এখানেই জগৎসৃষ্টির আরম্ভ; অনন্ত সমুদ্রে এখানেই বিষ্ণু একলিঙ্গম্ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহারই চতুর্দ্দিকে দশ মাইল বিস্তার। ইহাই পঞ্চক্রোশী কাশী। তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, চারি দিকে এই জগতের সৃষ্টি। কাজেই বারাণসী জগতের কেন্দ্র।

বারাণসীর ইতিহাস ও ধর্ম্মেতিহাস বড়ই গোলযোগময়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে প্রথম হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়। তাহার পর ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়,—সে প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর আবার হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। হিন্দুর চক্ষে বারাণসী অতি পবিত্র। বারাণসী যেমন পবিত্র, তেমনই অবস্থিতিকর। বারাণসী ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রধান স্থান, ইহার জনসংখ্যার অষ্টমাংশ পুরোহিত। কিন্তু পবিত্রতায় ইহা অধিক নহে,—কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষের উপর ইহাদিগের আধিপত্য। * * * বোম্বাই নগরে অবস্থানকালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে ৬৪০ জন 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মযাজক আছেন। এই সংখ্যা প্রথমে অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা করিলে মনে হয়, এ কথা ভ্রমমাত্র। হিসাবে ৫০০০০০ জন ভারতবাসীর জন্য একজন ধর্ম্মযাজক। যেন ৩০০০০০০০০ জন সৈন্যের পূর্ণ দৃঢ় দুর্গের বিরুদ্ধে ৬৪০ জন মাত্র সৈনিক। এক বারাণসীতে ৮০০০ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বিরুদ্ধে কার্য্য করাই এই ৬৪০ জন ধর্ম্মযাজকের পক্ষে সুকঠিন। ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমা ও বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের এই গুণ দেখা যায়। বারাণসীতে মিষ্টার পার্কারেরও এ গুণ আছে। তাই যেখানে অপরে আশার কোন কারণ দেখিতে পায় না, সেখানেই তিনি আশার আলোকরেখা দেখিয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতেই নমুনা দেখুন,—তিনি প্রথমে বলিতেছেন,—অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বারাণসীতে যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহার পর তিনি বলিতেছেন,—এই পুনরুত্থান মহাসত্য পূর্ব্বাভাষমাত্র, ইহা পক্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ শরীরিক 'আক্ষেপ' মাত্র।

আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভাবেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের আসন্নমৃত্যুসংবাদ পাইতেছি। বহুবার আমরা তাহার সৎকারার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই সে সৎকার স্থগিত করা হইয়াছে—হয় ত আকাশ পরিষ্কার ছিল না, নয় ত সেইরূপ আর কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবযাত্রীরা সৎকারভূমির দিকে অগ্রসর না হয়, ততক্ষণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। জগতে কোনও ধর্ম্মের মৃত্যু বড়ই অনিশ্চিত। * *

মিষ্টার পার্কার বলেন যে, কাশীর প্রতি ধার্ম্মিক হিন্দুর ভক্তির ও ভালবাসার উপযুক্ত আভাস দেওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি হিন্দুর এই ভক্তির সমুজ্জ্বল, প্রাণস্পর্শী, জ্বলন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখনই কোন হিন্দু সিপাহী দল বারাণসীর নিকট দিয়া যায়, তখন এই পবিত্র ক্ষেত্রের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা 'কাশীজিকি জয়' 'জয়!' রবে গগনমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলে। বার্দ্ধক্যে ও দৌর্ব্বল্যে প্রায় চলৎশক্তিরহিত, উত্তাপে ও ধূলিবাহুল্যে প্রায় অন্ধ, পথশ্রমে মৃতপ্রায় যাত্রী, অতিকষ্টে কোনরূপে উট রেলওয়ে-শকট হইতে অবতরণ করিয়া, বারাণসীর পবিত্র মৃত্তিকে পদার্পণ করিবামাত্র

শার্ব রাজ্যগুলি উচ্চে উৎক্ষিপ্ত করিয়া 'কাশীজি কি জয়!' রব করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যখনই কোন য়ুরোপীয় কথাপ্রসঙ্গে ভারতবাসীদিগের নিকট বলেন যে, তিনি বারাণসীতে ছিলেন, তখনই লোকে তাঁহার মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে; কারণ, বারাণসীবাসীরা ঈশ্বরানুগৃহীত।

ধর্ম্মবিশ্বাস যখন যুক্তি বা তর্কের বিষয় নহে, পরন্তু কেবল ভক্তির বিষয়, তখন মিষ্টার পর্কাইয়ের প্রদত্ত এই চিত্রে মনে হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু এখন অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত রহিল।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ড্রেণের ময়লায় ও নরদেহে জাহ্নবীসলিল অপরিষ্কৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

যখন আমরা আগ্রায় যাই, তখন এক অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। এই অপরিষ্কার গঙ্গাজল যে সর্ব্বোত্তম প্রবিষ্কারক তাহাই তখন আবিষ্কৃত হয়। বহুদিন হইতে দেখা যায় যে, যদিও মধ্যে মধ্যে বারাণসীতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হয়, তথাপি সে পীড়া কখনই অন্যত্র হইতে নীত হয় নাই। পূর্ব্বে কখনও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গভর্মেণ্টের অধীন বিজ্ঞানবিদ্ মিষ্টার হ্যাঙ্কিন গঙ্গাজল পরীক্ষার জন্য বারাণসীতে গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। স্নানের ঘাটের নিকটে ড্রেনের মুখ হইতে জল লইয়া তিনি দেখিলেন,—জল লক্ষ লক্ষ বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ। কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল যে, সেই সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি একটি ভাসমান শব কূলের নিকটে আনিয়া তদুপার্শ্ব হইতে জল সংগ্রহ করিলেন,—সে জল বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ। কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল—সে গুলিও মৃত। তিনি এই জলে বহু বিসূচিকামূল জীবাণু যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফল একই। ছয় ঘণ্টা পরে তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পর মিষ্টার হ্যাঙ্কিন কোন প্রকার জীবাণুশূন্য কূপোদক গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিসূচিকাবীজ দিতে লাগিলেন; এবার ছয় ঘণ্টার মধ্যে জল জীবাণুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।*

কত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ এই গঙ্গোদক পরিজ্ঞানে ইহাতে অগাধভক্তি সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, ইহা কোনও প্রকারেই অপবিত্র হইতে পারে না, পরন্তু ইহা সর্ব্বশুচিকর। এই বিশ্বাসেই তাহারা ভাসমান শব ও দৃশ্যতঃ মলপূর্ণ জলও দ্বিধাশূন্য হইয়া স্নানার্থ ও পানার্থ ব্যবহার করে। এই জন্য হিন্দুগণ এতদিন উপহসিত হইয়াছে; কিন্তু এখন পরিহাসের পাত্রপরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেই পুরাকালে তাহারা কেমন করিয়া এই জলের পবিত্র শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিল? তখন কি এ দেশে জীবাণুবিদ্ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল? তাহা জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে, আমাদের অসভ্যাবস্থা দূর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারা সুসভ্য ছিল। ৬।৬ ক্রমশঃ।

* এ বিষয়ে আমরা মিষ্টার হ্যাঙ্কিনকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার Cholera in Indian Cantonments ও The Prevention and Cause of Cholera পুস্তিকাদ্বয়ে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। "মণি-হারা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু রচনাগুণে গল্পটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। যে মাষ্টারের মুখে লেখক গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, সে চরিত্রটির সঙ্গে মূল গল্পসূত্রের সম্বন্ধমাত্র নাই; সে ব্যক্তি গল্পের কণ্ঠকমাত্র—বরং তাহাকে দুনিয়ার ঘরসিঁধে বিরূপ সমালোচক বলা যায়। সংসার-রঙ্গভূমির ভাবের দিকটা মাষ্টারের সম্পূর্ণ অগোচর, তাহার মতে সে ভাগটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; এবং নিতান্ত শ্রেয়ালি লোকের ও মেয়েদের একচেটিয়া। নিতান্ত সোজাসুজি ব্যাপার ও তাহার সহজ মীমাংসা ভিন্ন আর কিছু এই বিরাগতিক্ত নীরস লোকটির বিচারে সুন্দর ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। চরিত্রটি যদিও সচরাচর বিরল নহে, তথাপি তাহার এই চিত্রখানি মূতন বলিয়া মনে হয়। তাহার টীকা টিপ্পনী, মন্তব্য, অযাচিত উপদেশ, বিবিধ সমস্যার উদ্ভট মীমাংসা অদ্ভুত বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয় না। গল্পের এই অবান্তর চরিত্রটির রেখাচিত্রে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও যথাযথ অনুকরণনিপুণতার প্রভূত পরিচয় আছে। ভাবপ্রবণ ক্ষিতিভূষণ ও তাহার পাষাণপ্রতিমা পত্নী, দুই জনের চরিত্র পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এই দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পটি যেমন জমিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু মাষ্টারের তীব্র শ্লেষে, অদ্ভুত বিচারে সে অভাব বুঝিতে পারা যায় না। গল্পের ভাষা অনেক স্থলে লেখক টানিয়া বুনিয়াছেন,—শিরোবেষ্টনপুরঃসর নাসিকা-প্রদর্শন আজকাল গদ্যভাষার একটা 'আর্ট' বলিয়া অনেকের সংস্কার, কিন্তু তাহাতে গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব কি না, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সে বিচারের এ স্থল নহে।—কিন্তু লেখকের উপমা-কৌশল অতি সুন্দর, উপভোগের উপযুক্ত।—শুধু সৌন্দর্য্যের বিকাশ নহে, তদ্দ্বারা লেখক স্বীয় বক্তব্য সহজে ও অনায়াসে সুপ্রকাশিত ও সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও আলোচ্য। লেখক মুখবন্ধ করিতেছেন,—"কিছুদিন হইল বোম্বে-নগরীর নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় হইতে নাট্যশাস্ত্র নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শোনা যায় নাট্যশাস্ত্র ইয়োরোপীয় কাব্যানুরাগী কোবিদগণের যথেষ্ট প্রীতি ও সমধিক সমাদর আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে; এই শুভযোগে আমরাও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নাট্যবিদ্যার অতীত গুণগরিমা স্মরণ করিয়া কতকটা সান্ত্বনা এবং গৌরব অনুভব করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।" তথাস্তু। এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হইলে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসের এক ভ্রম উপকৃত হইবে। "বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুরচিত। লেখকের মতে; বিদ্যাসাগর "গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন।" লেখক দুঃখ করিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগরের ত্রিওরেল কেহ ছিল না।"

ভানুমতী।

সুন্দর বৈশাখ মাস, সুন্দর সুনীলাকাশ,
কি সুন্দর বহিছে মলয়,—
শান্ত সুশীতল!
কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা,
উপত্যকা তরুশোভাময়,—
সুন্দর শ্যামল!
সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে
নীলাকাশে শ্যামল ধরায়,—
কি হাসি সুন্দর!
যুবতী পার্ব্বতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,
সরলার হাসি নিরমল,—
প্রাণ স্নিগ্ধকর।
সে যূথিকা হাসি মাখি শোভিতেছে কর্ণস্থলী
পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে;
মালা মালতীর।
পার্ব্বতীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী
কি তরল সুধা নিরমল,—
কি শান্ত গভীর!

অনাথনাথ ও ভানুমতী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুল্লচন্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই নীলাভূমির শীর্ষস্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষঅন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণালোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে, গুল্মে ও তৃণে সমাবৃতা পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমি জ্যোৎস্নালোকে কি মনোহর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে! এই শ্যামল

ক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কর্ণফুলীর কি
শ্বেতভুজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সে
শেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর
ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃ
কুসুমরাশির সেই কৌমুদীপ্রোদ্ভাসিত
ছাদ ও টবের নানাজাতীয় ক্রোটন,
নিকুঞ্জ স্থানে-স্থানে নানা অবয়বের ছা
স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নি
মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মানব
বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা
বিধৌত শ্বেতকান্তি ধারণ করিলে ভ
পারে।

অনাথনাথ একখানি 'লাউঞ্জ চেয়া
আরক্তমকমলমণ্ডিত 'ফুটষ্টুলে' বসিয়া
মালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শো
ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হই
উভয়ের মুখ প্রশান্ত; অধরে প্রীতির
জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ
কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছু ক্ষণ স্থিরনয়নে এই শোভা দে
করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—"মা! অ
কন্যারূপে গ্রহণ করিব।"

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দি
করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা! বেদের মেয়েকে
পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়া
গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের ক
বলিতেছে, তুমি কোনও শাপভ্রষ্টা দেব

ব, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা বানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর কও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্ম হইতে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে; উহারা ক্র হইয়া সোনার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু জের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে শিক্ষার্থ বিলাত গিয়া- ন বলিয়া আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। নাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

তা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভি- ধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম। যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচণ্ডাল গান্ধার যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার;—বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার।

পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। ঘোরতর মদ্যমাংসাশী হিন্দু, এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্ম্মের কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এবং ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াপদ্ধতি সহ দশকর্ম্মপদ্ধতি। এই ভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত। সর্ব্বত্র উক্ত পদ্ধতি অনুসারে অল্পাধিকপরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্ম করিয়া সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ বুনিবে, এক জন মহা পণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করিয়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই একবার বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাহা হইলেও উহার যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের এই তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা-

শরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে। আর দেশে থাকিয়াই কোন্ হিন্দু ইংরাজ মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা ১০ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু বাবা! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনতমুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

সুখ যাহা বল কথার কথা,—
দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম, মুকুতার-লতা,
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
ওই আকাশের নীলিমার মত
দুঃখই জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,—
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা এককালে সুখ কি তাহা জানে না,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে

ত সেরূপ কোনও ভাব নাই। সে স্থির গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্না-প্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে, গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল। কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে তৃপ্ত হইয়াছে,—সুখী হইয়াছে, এ কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন। ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজীওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বস্থ একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জনস্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত

জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্ম-হারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি ষোড়শী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।" তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে। তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম,—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—"আমি বড় অভাগিনী। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না।" এক জন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞা-মতে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে শবৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত স্থির নির্নিমেষনয়নে জগন্নাথ-দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অতৃপ্ত-নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। সে অব-গুণ্ঠন টানিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অন্বেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনের জন্যে ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী এরূপভাবে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুত-কর্ম্মা ও দৈবশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শারীরিক বলে এত অসুরের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই 'সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে, ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে, অধীরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে,

তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধদেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্যদেব কি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই?—তবে সরলা ব্রজগোপীরা স্বয়ং যে শ্রীভগবানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যে পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে এক জন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিলে গ্রামবাসীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোরমাত্র; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ।

আর একদিন আমি কার্য্যস্থান হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসী শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে। তখন আমার মনে হইল যে, একটি মূর্খ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে? কালে যমুনাতীরাভিনীত এই সরল ও সহজ—যমুনার সলিলের মত নির্ম্মল, শীতল ও মধুর ধর্ম্মও আবিল ও পঙ্কিল হইয়া বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও গৌরীয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। হইবারই কথা। শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আহা! কি অরূপ মধুর লীলা! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দযশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ষড়রসভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম, এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জগতের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বড়—

কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও"—তাহা বুঝিতে পারি না। ব্রজের গোপ গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। এইরূপে যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্ম্ম-পথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃতপথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম, সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে পিতার মত, পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটি গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্ম্যশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়!
রাসে তোরা কে নাচিবি আয়!
ওরে চন্দ্র নাচে, তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি,
গ্রহেতে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী,
বৃদ্ধ হেসে, গোর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
(ওরে) পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
(ওরে) পত্নীপুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,
দুই নেত্র ছল ছল,
মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল;
নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়,
নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায়।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,
প্রেমে হাসে যমুনা,
প্রেমে হাসে বৃন্দাবন,—নাহি উপমা।
(ওরে) লীলমণিধারাপ্রেমে যমুনা উছলি যায়।

৬

আহা নাচেন ঈশ্বর,
বিরাজিত নিরন্তর,
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে, কৃষ্ণ রাসেশ্বর,
রাসচক্রে সর্ব্বভূত, প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,
প্রেমের গোপী আমরা,
কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা;
(আহা!) জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি তব রাসলীলায়
(নাথ!) নবীনের নাহি দুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়।

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নায় পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাহিতেছে, এবং তাহার কপোলযুগল বাহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। অনাথনাথ ভাবিলেন,—"আমি কি ভবে ভ্রান্ত?"

ক্রমশঃ।

কর্ম্ম। (বচনং)

একখানি কাচের চক্র, তাহাতে বিবিধ বর্ণের কাচ। মানুষের মনটি এমনি; একই পৃথিবী, একই লোক, বিভিন্ন সময়ে এই মনশ্চক্রে বিভিন্নরূপ বোধ হয়। এক মুহূর্ত্তে যাহাকে দেবতা ভাবি, পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে দানবী বোধ হয়। যাহার মুখখানি এক সময় চোখের সাম্নে ভাসিয়া প্রাণ শীতল করে, সময়ান্তরে তাহার মূর্চ্ছবি হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। বাসনা বা রাগ, বর্ণের ও বর্ণ-বিভিন্নতার কারণ। ইহারই নাম মোহ। এই জন্য শ্রীগৌতম বাসনার নির্ব্বাণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ কাল বাসনাবর্জ্জিত, সুতরাং মানুষ পুরুষ দেখা যায় না। বাসনাবিমুক্ত স্বচ্ছ কাচে ভিন্ন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। বালক পথের ধারে পুতুল লইয়া খেলিতেছে, রাগে কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে, কখন আপনাকে রাজরাজেশ্বর ভাবিতেছে, কখনও পথের কাঙ্গাল মনে করিয়া বুক কাটাইতেছে। সকলই মোহ, সকলই ছলনা। মোহবশতঃ মানুষ প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না, মানুষের মত দুর্ব্বল কৃপাপাত্র কুয়াসার ক্রীড়নক জগতে সবাই। শিশু এই গলাগলি ভাব করিতেছে, আবার ক্ষণেক পরে লড়াই করিয়া কাঁদিতেছে। মানুষমাত্রই শিশু, মোহের হাতের পুতুল। সুখ কোথায়? এক বাসনা পবিত্র নির্ব্বাতহৃদয়ে শ্রীপদের সমীপে। মানুষ কত দিনে শিশুত্ব ছাড়িবে, বীরত্ব পাইবে, সাধু হইবে? হায় মোহ! দুর্ব্বলকে বলবান, বৃদ্ধকে যুবা, দেবীকে দানবী, বানরকে দেবতা, এ অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল তোমারই। তোমাকেই শয়তান বলিয়া ঋষিগণ উচ্চারণ করিয়াছেন।

মানুষ দিব্য চক্ষু লাভ করে একবার, চিতায় চড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে। শুনিয়াছি, একবার মানুষের দিব্য জ্ঞান হয়। তখন মানুষ পেশী গতিশূন্য; সংসার দূরে, অতি দূরে, সৈকতপুলিনে বালুর মত সরসর করিয়া সরিয়া যাইতেছে। দূরে থাকিয়া ডাকিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে, সে শব্দ কর্ণে সৃষ্ট হইতেছে না। জগতের উজ্জ্বল মোহন কমনমুখ আঁধারের ছায়ায় ঢাকিয়াছে, চন্দ্র, তারা, জ্যোৎস্না তখন অন্ধ মত, তাই মানুষের দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। হায়! তখন দিব্যজ্ঞান অসময়ে! পণ্ডিত ও মূর্খ, সংসারী ও শ্রমণক, যত-

দিন প্রাণ, ততদিন স্বপ্নের ক্রীড়া-পুত্তলি ; কাচ ঘুরাইয়া অকারণে হাসে, অকারণে কাঁদে, অকারণে বৃথা লোকের সঙ্গে কোন্দল করে, কখনও তাহাকে বুকে পুরিয়া লয়, কখনও তাহাকে গলিত দুর্গন্ধ শবের মত ধিক্কার করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ করে ; আবার হয় ত ক্ষণবিলম্বে তাহারই চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দেহি পদপল্লব" বলিয়া কৃপাভিক্ষা করিবে। ধিক্ মানুষ!

মহত্ত্বের বিচিত্রতা এই কালচক্রে। নীচতা ও মহত্ত্ব মানুষের সকলই সমান। উভয়ই মোহবশাৎ। আমায় দেখিয়া তুমি হাসিতেছ, তোমায় দেখিয়া আমি হাসিতেছি। পাগল আমরা সকলে, এ হাসিও পাগলামি, কান্নাও পাগলামি। নীচতাও পাগলের পাগলামির উচ্ছ্বাস, মহত্ত্বও পাগলামির উচ্ছ্বাস। বায়ুতাড়নায় মাছি উড়িয়া কখনও পয়োনালীমধ্যে, কখনও পর্ব্বতশিখরে। পর্ব্বতশিখরে বসিয়া তাহার গৌরবে অধিকার যেমন, সামান্য গুহাগহ্বরে তাহার দীনতার কারণও তেমনই অকিঞ্চিৎকর।

প্রাণ থাকিতে আত্মা, বাসনা, মোহ। জন্মই বাসনার মূল। মোহ না হইলে প্রাণের প্রাণত থাকে না, মদ না খাইলে স্ফূর্ত্তি হয় না, মদ খাইলে দুর্ব্বল সবল হয়, মরা মানুষ নাচিতে থাকে। কি বীভৎস দৃশ্য! প্রাণ আছে, মোহ নাই, এমনটি কোথাও পাইবে না। মোহ যত টানিবে, প্রাণে তত উচ্ছ্বাস আসিবে। এ জন্য মোহ মানবের অবশ্যম্ভাবী। ধিক্ মানবজীবন! এই মানুষ কবি, বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য, নাতৃসেবী, বীর, কত কি নামে গৌরব করে। যে পদাঘাতেরও ঘৃণার পাত্র, সে মাথায় বসিয়া বীরপূজা দেবপূজা লাভ করিতে লালায়িত।

যে পর্ব্বতে চড়িয়া গৌরব মনে করিতেছে, সেই কৃপাপাত্র, ঘৃণিত। যে গহ্বরে পড়িয়া, সে ঘৃণিত নহে, দীন নহে। আকাশে ঘুড়ি উড়ে বাতাস, সূতা ও আকর্ষণের জোরে। ঘুড়ি যখন খুব উপরে উঠে, ছেলেরা করতালি দিয়া বলে—চমৎকার ঘুড়ি। সহসা ঘুড়ির মাথা ছিঁড়িল, কি কাণ ভারি হইল, ঘুরিতে ঘুরিতে মাটীতে পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেল। বালক রাগে তাহাকে পদাঘাত করিল। রাগ এমনই অকারণ। যে মুখখানি দেখিয়া কাল প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই,—যত দেখি, বোধ হয় আরও দেখি, বুক করিতে বুক জুড়াইতে গা কাঁপিয়াছে, আজ সেই মুখখানি দেখিয়া ঘৃণায় জ্বলিতেছি, তাহাকে দেখিতে ঘৃণা হয়, নিজের প্রতি ঘৃণা হয়, সমস্ত নারী-চরিত্রে ঘৃণা হয়। কাল যাহাকে লজ্জাশীলা ভাবিয়াছি, আজ তাহাকে লজ্জা-

হীনা ভাবিতেছি। কাল যাহাকে প্রেমময়ী কবিতারাণী মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহাকে বেনেনীর কাণা কড়া-পুণিতে দেখিতেছি। কালিকার সে চক্ষু কি আজ নাই? আছে, কালিকার সেই কাচখানি নাই। মনের নূতন কাচ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন রাগে আঁখি রঞ্জিত করিয়াছি। রাগে কাল সে দেবী ছিল, রাগে আজ সে দানবী হইয়াছে। বস্তুতঃ সে দেবীও নহে, দানবীও নহে।

ভালবাসার সাধ পূরিল না। যে হৃদয়খানি লইয়া বসন্তে কোকিলের ন্যায় প্রফুল্লতার এ জগতে আসিয়াছিলাম, আজ তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গুঁড়া-গুলি হাতে কুড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। বাজারে আসিয়া ঘুরিয়া মরিলাম। কেনা কিছু হইল না। হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সাথের সাথী চলিয়া গিয়াছে; শ্মশানে তালগাছের মত একাকী দাঁড়াইয়া হাহা করিয়া জীবনটা কাটাইতে হইবে। সুখী হইব ভাবিয়াছিলাম; দুঃখের কটোরা পূর্ণ হইল; আনন্দে জীবন দীর্ঘতর হইবে আশা করিয়াছিলাম; এ ধাক্কায় বুঝি বা কখন চূর্ণ হইবে। ভাবিয়াছিলাম নালতী,—তুলিয়া দেখি বেঁটুফুল।

সখি! কি মোর করম লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি।

প্রেমিকের এই হাহুতাশ চিরদিন। ফুলের বনে একটি প্রজাপতি বসিয়াছিল; ধরিতে গেলাম, কাঁটা-গাছে উড়িয়া বসিল। এই ধরি, এই-ধরি, করিয়া ধরিতে আর পারিলাম না, সে ধরা দিল না, কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দু' হাতে বুক চাপিয়া—নহিলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়—দু' হাতে বুক চাপিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। কেহ হাসিল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ ঘৃণা করিল, মুখ ফিরাইল, কেহ বা আহাহা করিয়া একটু ভুলাইতে আসিল, অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে, শূন্যপ্রাণে, শূন্যদেহে, সে যে পথে গিয়াছে, সেই পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা কোথা হইতে আসিয়া সে ধরা দিল, ধরিতেই সাধ মিটিল, ধরিয়া তাহার ডানা দু'খানি ছিঁড়িয়া তাহাকে কাদায় ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া হাসিলাম। এই আমার প্রেম। এই আমার ভালবাসা।

কান্না ভাল, না হাসি ভাল? যে হাসে সে দেবতা, না যে কাঁদে?

আমি কাঁদিতেই জন্মিয়াছি, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি; ভাব করিতে গিয়া ঝগড়া করি, বুঝিতে গিয়া বুঝাইয়া আসি; আমার হৃদয়ের এমনি

বিচিত্র গঠন। দোষ কি আমার? প্রেমে সুখ নাই, জগতে প্রেমই নাই, অথচ সেই সাহারার মরীচিকা, আকাশের রামধনু ধরিতে নরনারী বালবৃদ্ধ সবাই দৌড়িতেছে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত দৌড়িতেছে! আজ তুমি আমাকে বাতুল, বাউল, বাউড়, বলিয়া উপহাস করিতেছ, শুকতরু মুরলিল বলিয়া গান বাধিতেছ, মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে বলিয়া হাসিতেছ, কাল তোমাকেই আরক্তনয়নে ঊর্দ্ধশ্বাসে সকেনবদনে দৌড়িতে দেখিয়া আমি হাসিব। এক-খানি ঘুড়ি উড়িতে দেখিয়া তুমি দৌড়িতেছ, একটি চাঁদ উঠিতেছে দেখিয়া হাত দু'খানি বাড়াইতেছ, পাপিয়ার গানে মুগ্ধ হইয়া ধরিবার ফাঁদ পাতিতেছ, সে মুখখানি দেখিলে—আবেশে ঢল ঢল মুখখানি দেখিলে কে না পাগল হয়? ভাই! দোষ তোমারও নহে, দোষ আমারও নহে; সকলই আমাদের কর্ম্মফল। বাসনা-সুরা পান করিলে সকলেই মাতাল হয়; মাতালের প্রাণটি যেমন সরল, রসেভরা, তেমনি ঢল ঢল; সে কুরূপকে সুরূপ দেখে, মানবীকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লয়।

এ কর্ম্মফল, কপালের লেখা নহে। ঘুড়ির রজ্জু, বায়ু ও আকর্ষণ। সেই আরক্ত আবেশপূর্ণ নয়ন দুটি, সেই ননীছাঁকা গোলাপমাখা মুখখানি, সেই মাল-তীর লজ্জাশীলতা, সেই শিশিরস্নিগ্ধ মধুরতা, সেই প্রভাতের কমলকোরক, সেই চাঁদের জোছনা, সকলই এই কল্পনায়! এ কল্পনা তোমার সৃষ্ট নহে, তোমার আয়ত্ত নহে, এ তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রাক্তন কর্ম্মফল।

বহরমপুরের পাগলাগারদে দেখিয়াছিলাম, সব পাগল ঠিক করিয়াছে—সে, তাহাদের অধ্যক্ষ মহেন্দ্র বাবুই পাগল, আর তাহারা সকলে শেয়ানা। মানুষ এমনি পাগল, সে আপনার পাগলামি না বুঝিয়া ভগবানকেই পাগল সাজাই-য়াছে। তার ভগবান বাসনাদেব যদি মাতাল, সে মাতালের পূজা করে।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।

তার ভগবান নাচে, গায় ও বাজায়, সে কেবল ছায়াবাজির পুতুল। নিজে নাচে, ভগবান নাচান; বস্তুতঃ ভগবান বাসনাবিকারের অতীত; নাচেনও না, নাচানও না। নাচায় জীবের কর্ম্মফল—প্রাক্তন ও ঘটনারাশি—জন্মার্জ্জিত উত্তরাধিকৃত প্রবণতা ও ঘটনাচক্র—এই প্রবণতা ও এই ঘটনা, ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্মে মানুষ কর্ম্মী; এই ধর্ম্মে মানুষ ধর্ম্মী। এ ছাড়া মানুষের কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, মান অপমান নাই, ঘৃণা ভালবাসা নাই। এই

কর্ম্মের নাম মোহ। এই মোহ চক্ষে অঞ্জন মাখাইয়া একবার তোমাকে আমার হৃদয়ের পুতুল করিতে শিখাইল, আবার এই মোহই তোমাকে ঘৃণা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পথে প্রক্ষেপ করাইল। আমায় তুমি অসৎচরিত্র, মাতাল, চপল, বল—হয় ত কর্ম্মফলের ধাক্কায় আমি এমনি করি; তুমিও হয় ত এমনি করিয়াছ, করিতেছ, কি করিবে। দম্ভ করিও না, বৃদ্ধাকে দেখিয়া প্রাণপ্রিয় বলিয়াছিল, মা! তুমি ছিলে; যুবতীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি আছ; কুমারীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি হইবে না, রূপাভিখারী হইও না। স্রোতের তৃণকণা! তোমার সার্থকতা কি! আজ পর্ব্বতশিখরে, কাল গিরি-গহ্বরে, আজ আনন্দের স্বর্গে, কাল নিরাশার নরকে, আজ যে প্রেমদাস, কাল সে বৈরাগী।

নমস্যামো দেবান্ নন্থ হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

ওষধিপতি।

চন্দ্রের এক নাম ওষধিপতি। বিষ্ণুপুরাণে (২।১২) দেখা যায়, চন্দ্র অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদসমূহকে পরিবর্দ্ধিত করেন। অমাবস্যা তিথিতে তিনি প্রথমে জলে, পরে লতাসমূহে বাস করিয়া, পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন লতাতে গমন করেন, তখন যদি কেহ লতা ছেদন করে, কিংবা লতার গতিচ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাপাপের ভাগী হয়।

চন্দ্রের সহিত লতার কোন সম্বন্ধ আছে কি? চন্দ্র ওষধীশ,—এ বিশ্বাসের কোন মূল আছে কি?

বৈদিক পণ্ডিতগণ বলিবেন, ঋগ্বেদে সোমের প্রশংসা স্তুতি থাকিলেও, সেখানে চন্দ্রের নাম সোম হয় নাই। অথর্ব্ব ও শতপথব্রাহ্মণে সোমের অর্থ চন্দ্র

হইয়াছে। সোমলতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, চন্দ্রের ওষধীশ হইয়াছেন।

এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় সবিশেষ আদরের লতা ছিল; তাঁহারা সোম সোমলতার সহিত চন্দ্রের কেন সম্বন্ধ হইল পাওয়া যায়। চন্দ্রের নাম ওষধীশ হইবারও সূর্য্য দিবাকর, তেমনই চন্দ্র নিশাপতি না, তথাপি তিনি নিশাপতি, তারানাথ যায় না অহর্পতি আছেন, নিশাপতিও আ অন্ধকারের সহিত লতার কিছু সম্বন্ধ থাকি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, অন্ধকার তাহা আলোতে জাত অঙ্কুরের মত নহে। দে আঁধারে জাত অঙ্কুরের ডাঁটা শাদা, পাতা ডাঁটা পাতা উভয়ই সবুজবর্ণ হয়। আঁধা হয়া ও সরু হয়, আলোতে জাত তেমন হয় মধ্যবর্ত্তী কোষ ছোট হয়, পাতা ছোট হয়; এইরূপে দেখা যায়, অবিরাম আঁধারে বিপরীত ফল হয়। আঁধারে পাতা বাড়ে না গিয়াছে, যে সময়ে আলোতে আলুর গাছ এ আঁধারে ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। এমন কি বৃদ্ধি একেবারেই বন্ধ হয়। কিন্তু পাতার বে হয়, মৃদু আলোতে বড় হয়, প্রখর আলোতে এই রকম হয় না। থাম আলু অবিরাম অন্ধ যায়, আঁধার লতাবৃদ্ধির অনুকূল, আলো বৃ

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেওয়ালে দেওয়ালের বাহির দিকে বাঁকিয়া উঠে। দে না, অন্য দিকে বেশী লাগে। গাছের যে পা বেশী বাড়ে না; যে পাশে কম লাগে, সে বাঁকিয়া উঠে। যেন আলো পাইবার জন্য উ

আলো লাগিবামাত্রই লতাবৃদ্ধি কম হয়

বেশী হয় না। যে কোন ওষধি লইয়া দেখা গিয়াছে, বেলা ১১টা ১২টার সময় বৃদ্ধির শেষ হইয়াছে। মধ্যাহ্নের পরে বেশী তাপ পাইলেও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কম হইয়াছে। এই পরীক্ষাগুলি শীতকালে করা গিয়াছিল।

কিন্তু কোন গাছ স্বভাবতঃ অবিরাম আঁধারে কিম্বা অবিরাম আলোতে থাকে না। দিনের বেলা আলোতে থাকে, রাত্রেই কেবল আঁধারে থাকে। এ স্থলে দেখা যায়, দিবারাত্রিভেদে লতাবৃদ্ধির কম বেশী হয়।

রাত্রে বৃদ্ধির মান অধিক, দিবসে অল্প। দিবা কিংবা রাত্রি আরম্ভ হইবা-মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। অল্পে অল্পে বৃদ্ধির মান কমে, অল্পে অল্পে বাড়ে। এইরূপে দেখা যায়, মধ্যরাত্রে বৃদ্ধি পরম না হইয়া তাহার পরে হয়।

আলোতে বৃদ্ধি কম হইবার কারণ বুঝা সহজ নহে। সে কথা এখন থাক। সূর্য্য হইতে আমরা কেবল আলো পাই না, আলোর সঙ্গে তাপও পাই। রাত্রে আলোর হ্রাস হয়, তাপেরও হয়। দিবাভাগে আলোর বৃদ্ধি, তাপেরও বৃদ্ধি। উপরে কেবল আলো ও আঁধারের গুণে লতাবৃদ্ধির বিচার করা গিয়াছে। তাপ সম্বন্ধে দেখা যায়, লতাবৃদ্ধির পক্ষে যেমন প্রখর আলোও ভাল নয়, মৃদু আলোও নয়; তেমনই প্রখর গ্রীষ্মও ভাল নয়, শীতও ভাল নয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বেশী বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোর ক্রিয়া কতটুকু, তাপের বা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। দেখা যায়, আমাদের দেশে অত্যন্ত শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে দিবসে যত গ্রীষ্ম হয়, তাহা অধিকাংশ গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ঠিক নহে; রাত্রে, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বরং ঠিক হয়। আর এক কথা আছে। আমাদের মত উদ্ভিদের দেহ হইতেও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের সময় ঘর্ম্ম অধিক নির্গত হয়। অধিক ঘর্ম্মনিঃসরণ বৃদ্ধির অনুকূল নহে।

তবেই মোটের উপর সূর্য্যতেজঃ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়, রাত্রি লতাবৃদ্ধির সহায়। নবাঙ্কুরের বৃদ্ধি সহজে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। ওষধির সহজে লক্ষ্য হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সোমলতার ভক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ঐ লতার বৃদ্ধির অনুকূল কারণও নিশ্চিত জানিতেন। বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিষয়টা জানিতে হইবে, এমন নয়। আমাদের ও অন্যান্য দেশের কৃষি-জীবীরা উদ্ভিদবৃদ্ধির অনুকূল কারণ জ্ঞাত আছে। বিজ্ঞানে অনেক জ্ঞাত বিষয়ের সূক্ষ্মতাসম্পাদন করে মাত্র।

তবে নিশাপতি চন্দ্র প্রকৃত পক্ষেই ওষধীশ। রাত্রিকালে ওষধি বর্দ্ধিত

হয়, দিবাভাগে হয় না। চন্দ্রই অমৃতময় শীতল জ্বলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদ-গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন। চন্দ্রের কিরণ অমৃতময়; কেন না, তাঁহার আধিপত্যসময়ে লতা বর্দ্ধিত হয়, মরে না। তিনিই যেন শিশিরসঞ্চারের কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণবৃদ্ধি করিবার কারণ। রাত্রেই চন্দ্র লতাতে গমন করেন; অমাবস্যার রাত্রে আকাশে দেখা দেন না, নিশ্চয়ই লতাতে বাস করেন। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার অন্য তিথিতে সম্ভবে না। তখন লতা কিংবা লতার পত্র ছেদন করিলে পাপ হয়। কবিচক্ষে লতা রাত্রির উপরে সঞ্চিত শিশির অশ্রুকণায় পরিণত হইয়াছে। লতা বা পাতা ছেদন করিলে অশ্রুধারা স্পষ্টই দেখা যায়। হেমন্তে অনেক লতারই পত্রমূলে চক্ষু-দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে। ইহা শিশির নহে, বস্তুতঃ লতার রক্ত। অশ্রুও আমাদের দেহের রস। ছেদন করিলে অনেক গাছই আরক্ত-ধারায় কাঁদিতে থাকে। তাই ত দুর্দ্দান্তেরা খেজুর গাছকে কাঁদাইয়া রস-সংগ্রহ করে। প্রাচীনেরা হয় ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাত্রে বৃক্ষচ্ছেদন নিষেধ করিয়াছেন; হয় ত বা বৃদ্ধিসময়ে ক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

২। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার অভিনব প্রণালী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির সৌভাগ্যসঞ্চার কালে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন করিয়া সেই মৃতপ্রায় জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, একনাথ স্বামী ও রামদাস স্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের ন্যায় তাঁহারা জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ও অদ্বৈতভক্তিমূলক ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়গণের লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির উৎকর্ষসাধন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে বৎসর একনাথ স্বামী সমাধিগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই

বেশী হয় না। যে কোন ওষধি লইয়া দেখা গিয়াছে, বেলা ১১টা ১২টার সময় বৃদ্ধির শেষ হইয়াছে। মধ্যাহ্নের পরে বেশী তাপ পাইলেও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কম হইয়াছে। এই পরীক্ষাগুলি শীতকালে করা গিয়াছিল।

কিন্তু কোন গাছ স্বভাবতঃ অবিরাম আঁধারে কিম্বা অবিরাম আলোতে থাকে না। দিনের বেলা আলোতে থাকে, রাত্রেই কেবল আঁধারে থাকে। এ স্থলে দেখা যায়, দিবারাত্রিভেদে লতাবৃদ্ধির কম বেশী হয়।

রাত্রে বৃদ্ধির মান অধিক, দিবসে অল্প। দিবা কিংবা রাত্রি আরম্ভ হইবামাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। অল্পে অল্পে বৃদ্ধির মান কমে, অল্পে অল্পে বাড়ে। এইরূপে দেখা যায়, মধ্যরাত্রে বৃদ্ধি পরম না হইয়া তাহার পরে হয়।

আলোতে বৃদ্ধি কম হইবার কারণ বুঝা সহজ নহে। সে কথা এখন থাক। সূর্য্য হইতে আমরা কেবল আলো পাই না, আলোর সঙ্গে তাপও পাই। রাত্রে আলোর হ্রাস হয়, তাপেরও হয়। দিবাভাগে আলোর বৃদ্ধি, তাপেরও বৃদ্ধি। উপরে কেবল আলো ও আঁধারের গুণে লতাবৃদ্ধির বিচার করা গিয়াছে। তাপ সম্বন্ধে দেখা যায়, লতাবৃদ্ধির পক্ষে যেমন প্রখর আলোও ভাল নয়, মৃদু আলোও নয়; তেমনই প্রখর গ্রীষ্মও ভাল নয়, শীতও ভাল নয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বেশী বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোর ক্রিয়া কতটুকু, তাপের বা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। দেখা যায়, আমাদের দেশে অত্যন্ত শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে দিবসে যত গ্রীষ্ম হয়, তাহা অধিকাংশ গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ঠিক নহে; রাত্রে, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বরং ঠিক হয়। আর এক কথা আছে। আমাদের মত উদ্ভিদের দেহ হইতেও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের সময় ঘর্ম্ম অধিক নির্গত হয়। অধিক ঘর্ম্মনিঃসরণ বৃদ্ধির অনুকূল নহে।

তবেই মোটের উপর সূর্য্যতেজঃ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়, রাত্রি লতাবৃদ্ধির সহায়। মহীরুহের বৃদ্ধি সহজে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। ওষধির সহজে লক্ষ্য হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সোমলতার ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ঐ লতার বৃদ্ধির অনুকূল কারণও নিশ্চিত জানিতেন। বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিষয়টা জানিতে হইবে, এমন নয়। আমাদের ও অন্যান্য দেশের কৃষিজীবীরা উদ্ভিদবৃদ্ধির অনুকূল কারণ জ্ঞাত আছে। বিজ্ঞানে অনেক জ্ঞাত বিষয়ের সূক্ষ্মতা সম্পাদন করে মাত্র।

তবে নিশাপতি চন্দ্র প্রকৃত পক্ষেই ওষধীশ। রাত্রিকালে ওষধি বর্দ্ধিত

হয়, দিবাভাগে হয় না। চন্দ্রই অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদ-গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন। চন্দ্রের কিরণ অমৃতময়; কেন না, তাঁহার আধি-পত্যসময়ে লতা বর্দ্ধিত হয়, মরে না। তিনিই যেন শিশিরসঞ্চারের কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণবৃদ্ধি করিবার কারণ। রাত্রেই চন্দ্র লতাতে গমন করেন; অমাবস্যার রাত্রে আকাশে দেখা দেন না, নিশ্চয়ই লতাতে বাস করেন। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার অন্য তিথিতে সম্ভবে না। তখন লতা কিংবা লতার পত্র ছেদন করিলে পাপ হয়। করিচক্ষে লতা বা পাতা উগ্রে সঞ্চিত শিশির অশ্রুকণায় পরিণত হইয়াছে। লতা বা পাতা ছেদন করিলে অশ্রুধারা স্পষ্টই দেখা যায়। হেমন্তে অনেক লতারই পত্রস্কন্ধ চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহা শিশির নহে, বস্তুতঃ লতার রস। অশ্রুও আমাদের দেহের রস। ছেদন করিলে অনেক গাছই অবিরল ধারায় কাঁদিতে থাকে। তাই ত দুর্দান্তেরা খেজুর গাছকে কাঁদাইয়া রস-সংগ্রহ করে। প্রাচীনেরা হয় ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাত্রে বৃক্ষচ্ছেদন নিষেধ করিয়াছেন; হয় ত বা বৃদ্ধিসময়ে ক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

২। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার অভিনব প্রণালী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির সৌভাগ্যসঞ্চার কালে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন করিয়া সেই মৃতপ্রায় জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, একনাথ স্বামী ও রামদাস স্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের ন্যায় তাঁহারা জননাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ও অদ্বৈতভক্তিমূলক ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়গণের লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির উৎকর্ষসাধন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে বৎসর একনাথ স্বামী সমাধিগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই

দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার ও তাঁহাদিগের যজ্ঞপতাকাদি নষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের অশেষ লাঞ্ছনা ও উৎসবভঙ্গ করিতেন। মোসলমান জমিদারগণ মহারাষ্ট্রদেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে সময়ে সময়ে ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহের জন্যও উৎপীড়িত করিতেন। তেজস্বী মারাঠাগণ যে সকল অত্যাচারই নিঃশব্দে অবনত-মস্তকে সহ্য করিতেন, তাহা নহে। নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে হিন্দুপক্ষ হইতেও সময়ে সময়ে মসজেদ প্রভৃতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত।

সেই দুর্দ্দিনে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য বহুদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্মাদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। গোলকোণ্ডার অধিপতি কর্ত্তৃক পণ্ডরপুরের বিঠোবা দেবের মন্দির ভগ্ন হইয়া তথায় মসজেদ নির্ম্মাণের উপক্রম হইলে হিন্দুগণ দেবমূর্ত্তি লইয়া বিজয়নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন। একনাথ স্বামীর পিতামহ ভানুদাস কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি পুনরায় পণ্ডরপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়নগর রাজ্য মোসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকার আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র "হিন্দুস্থানকে" যবনস্থানে পরিণত করিতে না পারিলে ভারতে মোসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইবে না, কোনও কোনও যবনভূপতির এরূপ সংস্কারও জন্মিয়াছিল। সুতরাং শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে অনেক হিন্দুই স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। এতদ্ভিন্ন রাজপ্রসাদলাভের বাসনায় ও জেতৃজাতির অনুকরণ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেও অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এই সকল সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সাহসী কষ্টসহিষ্ণু আরবেরা যেরূপ প্রাচীন রোমকীয় ও রুষীয় সম্রাটের আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারাঠাগণও আদিলশাহী ও নিজামশাহী সুলতানগণের অধীনতায় কার্য্য করিয়া সমরবিদ্যায় নিপুণতা ও শাসনকার্য্যে জ্ঞানলাভ করিতেছিলেন। স্বাভাবিক কার্য্যদক্ষতা, নীতিজ্ঞতা ও ধৈর্য্যসাহসাদিগুণে তাঁহারা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অগ্রণী সচিব ও সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা ও বিগ্রহ-ব্যাপারে অগ্রণীত্ব লাভ করিতেছিলেন। মোসলমানদিগের বিলাসিতা ও কার্য্যবিমুখতার জন্যও কার্য্যকুশল দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি ক্রমশঃ রাজকীয় কার্য্যের ভার অধিকপরিমাণে অর্পিত হইতেছিল। মোসলমান দরবারে

দেশীয়গণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হ
কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল, সন্দেহ
শক্তি, ক্ষমা, শান্তি ও তিতিক্ষাদিগুণ দর্শনে
ঘাসক তাঁহাদিগের নির্য্যাতনের লাঘব কি
সময়ে তার পূর্ব্বের ন্যায় রাজাদেশে হিন্দু
হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের ন্যায়
নিষিদ্ধ ছিল না, প্রজাগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের
বিশেষ রাজবিধানও প্রবর্ত্তিত ছিল না। তু
দুই একজন সাধুপ্রকৃতি প্রাদেশিক প্রাচ
মোসলমান জমিদারবর্গের ও তাঁহাদিগের ধ
দ্বারে এবং মোসলমান সেনাপতিদিগের হি
তোর জনসাধারণ বিধর্ম্মী পানরুসম্প্রদায়ের
স্তরে রামদাস, তুকারাম, রঙ্গনাথ স্বামী,
কবি জয়রাম স্বামী, কেশব স্বামী ও আন
গণের সত্ত্বে মহারাষ্ট্রবাসীর মনে স্বধর্ম্মের
ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্রমশঃ আত্মস
স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মী দেশবান্ধবগণের সাম
দিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।
ঘটিলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুহৃদয়ের সহানুভূতি
উদ্দেশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ সহানু
মাননাকারীদিগের সংস্রব ও আনুগত্যস্বীক
জনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তু
সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুপুরুষের মুখেও তখন,—

হিন্দু তুমি তুরকীর
তবে সেব অকারণ
আপনার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রব

(১) ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে কুতবশাহের সেনাপতি ত
দেশ বিজয়কালে অতীব ক্রূরতার সহিত হিন্দুধর্ম্ম
ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। ধর্ম্মান্ধ দিল্লীশ্বরের
বহুবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিল।

ইত্যাদি অত্যন্ত শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ মোসলমানগণ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুদিগের অতিশয় বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়িণী অসমদর্শিতা এবং শাসননীতির সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতির সংমিশ্রণের দোষেই মহারাষ্ট্রবাজ্য তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। অওরঙ্গ-জেবের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শাসনদক্ষ সম্রাটও এই ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিতে গিয়াই অজ্ঞাতসারে বিশাল মোগলরাজ্যের ভিত্তিমূল উৎপাত করিয়াছিলেন।

এক দিকে মোসলমানদিগের অসমদর্শিনী নীতির দোষে মহারাষ্ট্রের জন-সাধারণ যেমন তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতেছিলেন, অপর দিকে তেমনই উচ্চপদ ও রাজসম্মানলাভের সহিত দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছিল। দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দ স্বধর্ম্মের বিড়ম্বনা দর্শনে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার-কামনা ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ শক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। হিন্দু সর্দ্দার ও জাইগীরদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছিলেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, মহারাষ্ট্র-মনোজের এই দুই বিভিন্নমুখী ভক্তিস্রোত সম্মিলিত করিতে না পারিলে মোসলমানদিগের দমন ও মহারাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই দুষ্কর কার্য্যসাধন করিতে যে সর্ব্বাভিভাবিনী প্রতিভা, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, অনীম অধ্যবসায়, অসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও অলৌকিক স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন, তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও চরিত্রে তাহার সম্ভাব ছিল না। মহাত্মা শিবাজীর পিতা মাহা-শাহাজী সামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার সমরকৌশল তৎকালে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র প্রবাদের ন্যায় প্রথিত ছিল। তিনি নীতিকৌশলে স্বসম-কালীন সমস্ত সর্দ্দারগণকে অতিক্রম করিয়া একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নবোদ্ভাবিত প্রণালীক্রমে তাহার শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা করিতে-ছিলেন। (২) কিন্তু সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতির হৃদয়ে একপ্রাণতার বীজবপনপূর্ব্বক ইতস্ততো-বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত ও একতান করিয়া "স্ব-রাজ্যের" অটল ভিত্তিস্থাপন দ্বারা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি লইয়া একজন অসাধারণ মহাপ্রাণ ব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা ছিল। মহারাষ্ট্রজাতির দুঃখাবসানের নিমিত্ত বিধাতা রাজা শাহাজীর পুত্রকে

(২) Wilks' Sketches of the South. pp. 72/73.

সেই সকল অসাধারণ ক্ষমতায় সমলঙ্কৃত করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রামদাস যখন ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার জন্য মহারাষ্ট্র সমাজের বিভিন্ন-প্রথাবলম্বী শক্তিসমূহের সমন্বয়-সাধন-ক্ষম একজন যোগ্যতম নেতার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন তরুণ শিবাজী গো-ব্রাহ্মণের প্রতি-পালন, স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও উচ্ছৃঙ্খল মোসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনের জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র ও পরিমিত শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় মোসলমানদিগের অধীন থাকিয়া সমরশিক্ষা করিয়াছিলেন, শিবাজী প্রথমে তাঁহাদিগের সহায়তা পান নাই। আলেক্‌জাণ্ডার বা সীজার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেরূপ স্বল্পায়াসে আপনাদিগের প্রতিভার অনুরূপ উপকরণাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিবাজীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়সহকারে নানা প্রতিকূল অবস্থার অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে কার্য্যসাধনোপযোগী সমস্ত উপকরণই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই গিরিকাননচারী অসভ্য মাওলী জাতিকে সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া একটি বিশ্বস্ত ও অসমসাহসিক সৈন্যদল গঠন ও গিরিদুর্গাদির নির্ম্মাণপূর্ব্বক যেরূপ বিদ্যুদ্বেগে ও বিনা রক্তপাতে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। তিনি নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের জন্য সেই অল্প বয়সেই যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ, সদাচার, পরাজিত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার, রমণীকুলের সম্মানরক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন, সাধু-সহবাসে আকাঙ্ক্ষা এবং দর্পহীন মধুর সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণও তাঁহার অসাধারণত্বের আভাস প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাশালী রামদাস ভিন্ন সামসময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহই তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শিবাজীর অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে তদানীন্তন অন্যান্য স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বপ্রাধান্য-বিস্তার-প্রয়াসী মারাঠা ভূম্যধিকারীদিগের অন্যতম বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উদ্যমশীল ও ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রামদাস যে সেই শিষ্যের চরিত্র-নিহিত অলৌকিক শক্তির অবিকশিত ছায়াময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তাঁহার

কার্য্যকলাপে সহাপ্রাণতার অস্ফুট লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা গুরুর প্রতিভারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

স্বদেশের দুর্দ্দশামোচন ও মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বধর্ম্মের উদ্ধার-সাধনে শিবাজীকে অধ্যবসায়সম্পন্ন দেখিয়া রামদাস কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইবেন, সংকল্প করিলেন। শিবাজীও বহুদিন হইতে রামদাস স্বামীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম শক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার "দর্শন-প্রসাদ" লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ লেখক চিটনীস বলেন,—

"সিদ্ধপুরুষগণের অনুগ্রহাশীর্ব্বাদে ধর্ম্মসংস্থাপনের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহাই এই সময়ে শিবাজীর 'নিদিধ্যাস' হইয়াছিল। এই কারণে তিনি সাধুপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহাদিগের মুখে ধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও পবিত্র পুরাণ কথার শ্রবণে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সাধুপুরুষগণের ধর্ম্মোৎসব ও অন্নদানাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিবাজী তাঁহাদিগকে ভূমিদান ও অর্থসাহায্যও করিতেন। সমর্থ রামদাস স্বামীর সৎকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন।(৩) কিন্তু রামদাস তাঁহার পরীক্ষার জন্য আশ্রম প্রভৃতি ত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম কাননে গুপ্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবাজী অন্বেষণের চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দর্শন পান নাই। পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হওয়ায় তিনি রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎলাভের জন্য অহর্নিশি উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

শিবাজীর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তিনি সহসা একদিন রামদাস স্বামীর লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন,—

হে মহারাজ! আপনি মেরু পর্ব্বতের তুল্য অচলসংকল্প, বীরতার আধার, বহু লোকের আশ্রয়স্থল ও শ্রীসম্পন্ন যোগী। যাঁহার দ্বারা অহরহঃ অসংখ্য ব্যক্তির উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহার মহত্ত্বের (মহানুভাবকতার) তুলনা কোথায়? হে নরপতি! আপনি হয়পতি, গজপতি, নরপতি ও ধরণীর অধীশ্বর; পুরন্দর ও শক্তি আপনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছেন। রাজন! আপনি যশোবান্, কীর্ত্তিমান্, পুণ্যবান্ ও ক্ষমতাবান্; এবং জ্ঞানবান্ ও গুণোজ্জ্বিত হইয়া আপনার সদাচারপরায়ণতা ও বিবেচকতা, দানশীলতা ও ধর্ম্মশীলতা, বিজ্ঞতা ও সর্ব্বত্র হৃদয়তা সুপ্রসিদ্ধ। আপনি ধীর, গম্ভীর ও শূরকার্য্যে তৎপর। হে নৃপবর! সাবধানতায় আপনি সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

(৩) গ্রহীগতি বলেন, শিবাজী একদিন মৃগয়ার্থ কোনও গভীর বনে প্রবেশ করিলে তথায় সহসা তিনি যোগমগ্ন রামদাস স্বামীকে দেখিতে পান। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া শিবাজী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামদাসকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ শ্বাপদ ক্রীড়া করিতেছিল দেখিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইহাতে রামদাস স্বামীর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর প্রবলা হইল।

"আমাদিগের তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিসমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিঘ্নপূর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমাদিগের ধর্ম্মের, দেবমূর্ত্তিসমূহের ও গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়স্থ হইয়া প্রেমবশে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আপনার নিকট অসংখ্য পণ্ডিত, পুরাণবেত্তা, কবিশ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার্কিক ও চতুর্ব্বর্ণসন্তানরূপ আছেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন, সম্প্রতি ভূমণ্ডলে এরূপ কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হইতেছেন না। কেবল আপনারই যত্নে 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' এখনও কিয়ৎপরিমাণে সজীব রহিয়াছে। আপনার সহায়তায় এখনও নানা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, আপনার আশ্রয়ে কত লোক সুখে কালযাপন করিতেছে, মহারাজ! আপনিই ধন্য, যে হেতু জগতে সর্ব্বত্র আপনার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। হে কলাণীয় রাজা প্রিয়! আপনি কত দুষ্টের বিনাশসাধন করিয়াছেন, কত লোকের ভয় দূর করিয়াছেন, কত লোককে আশ্রয়দান করিয়াছেন। আপনার দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু আপনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই! কি জানি, আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রারব্ধ ফলেই বা আপনার এরূপ মতিবিভ্রম ঘটিল। যাহা হউক, আপনারা সকলে বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক, আপনাদিগকে অধিক আর কি বলিব? ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কীর্ত্তি আপনাকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। বিবিধ রাজকার্য্যের বাহুল্যবশতঃ আপনার চিত্ত হয় ত এখন ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিকরূপে আপনাকে এই পত্র লিখিলাম—দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

এই পত্র পাঠ করিয়া শিবাজীর "নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত ও শরীর রোমাঞ্চিত" হইল। তাঁহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বর্দ্ধনের ইহা পত্রের আরম্ভভাগে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি যেরূপ হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্রধর্ম্মের দুর্গতির বর্ণনাপাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত ও উদ্বেজিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রয়াস যে কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে, এবং রামদাস স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা তাঁহার উদ্যম প্রশংসিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনের অনুরোধ" রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। রামদাস স্বামী তাঁহার কার্য্যাবলীর নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া শিবাজী তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চরণদর্শনের জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহা জানাইয়া তাঁহাকে একখানি বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে শিবাজী কোনও কথকের মুখে ক্রবোপাখ্যান-শ্রবণপ্রসঙ্গে অবগত হইয়াছিলেন যে, গুরূপদেশ ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

তদবধি কোনও মহাপুরুষের নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিবার বাসনা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। তিনি সাময়িক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষগণের মধ্যে অনেকেরই সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তিনি তখনও তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। সমর্থ রামদাস স্বামীর অধ্যাত্মশক্তির প্রশংসা ও দেশের সমস্ত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া শিবাজীর হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দর্শনলাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে স্বামীর প্রেরিত উৎসাহপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শিবাজীর শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। রাজপুত্র মহারাষ্ট্র-সাধুসমাজের নেতা "মহাসমর্থ" রামদাস স্বামীকে তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন, সংকল্প করিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া জননী জীজীবাঈয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কতিপয় অনুচর সহ স্বামীজীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্ব্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ হইল। তিনি সমর্থের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রোপদেশগ্রহণের ও তাঁহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামী বলিলেন, "তুমি প্রাসাদবিহারী রাজ-পুত্র, আমরা অরণ্যচর সন্ন্যাসী; ধর্ম্মসাধনও সহজসাধ্য নহে। অতএব তুমি এই বিসদৃশ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। অকারণ ভেক ধারণ করিয়া জগৎকে প্রতারিত করা কল কি?" (৪) এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাষ্পাকুল-লোচনে বলিলেন,— "রাজ্যধন সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহপ্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হউক।" (৫) শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে স্বামী তাঁহাকে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত "দাসবোধ" নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ দশকের (অধ্যায়ের) ষষ্ঠ সমাসে (পরিচ্ছেদে) অবিকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(৪) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয়, চিটনীস-রচিত শিবাজীর বখর ও প্রিয়দিগ্বিজয়।

(৫) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয় ও চিটনীস-কৃত বখর।

এই ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খৃঃ) বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত হয়। (৬)

(৬) মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলেন, ১৬৫৫ খৃঃ জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে ও ১৬৬১ খৃঃ শৃঙ্গারপুরের স্বাধীন জমিদার দলবই'কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যহরণ করায় শিবাজী স্বদেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই কারণে সাধারণের সহানুভূতিলাভের আশায় তিনি ১৬৬১ খৃঃ প্রতাপগড়ে ভবানীদেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও দেশের প্রসিদ্ধ সাধু রামদাস স্বামীর মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাহেব মহোদয়ের মতে শিবাজী "খোকা ভুলাইবার জন্য" ধার্ম্মিকতার ভান করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফের এই উক্তি নিতান্তই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। আমরা কোনও গ্রন্থেই এই উক্তির পোষক কোনও প্রমাণের উল্লেখ পাই নাই। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম ১৬১৭ শকের (১৬৯৫ খৃঃ) মাঘ শুক্লা সপ্তমী শুভক্ষণে প্রতাপগড়ের মন্দিরের পূজারীকে যে রাজমুদ্রাঙ্কিত অভয়পত্র (সনন্দ) দান করিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি বিগত ১৮৯৬ সালের ১৯শে মে তারিখের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ভবানীমন্দির ও ইহার অন্যান্য সহিত পরে প্রতাপগড়ের ভবানীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে শিবাজী শৃঙ্গারপুর অধিকার করেন। জাওলীর রাজ্য ইহার বহু পূর্ব্বে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে ভবানীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার সহিত উক্ত রাজ্যদ্বয়গ্রহণের যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভবানীভক্ত শিবাজী যে স্বদেশবাসীর সহানুভূতিলাভের জন্যই ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া প্রতাপগড়ে ভবানীর মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

রামদাস স্বামীর উপদেশ সম্বন্ধেও আমরা সাহেব মহোদয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা শিবাজীর দীক্ষা গ্রহণের যে অব্দ নির্ণয় করিয়াছি, সমস্ত বখর-লেখকই একবাক্যে তাহার সমর্থন করেন। গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় ১৭৬০ অব্দ কোথায় পাইলেন, বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তিনিও পাদটীকায় এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই। শিবাজীর জাওলী রাজ্য ও শৃঙ্গারপুর গ্রহণে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ যে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোনও আভাষ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই নাই। শৃঙ্গারপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, শিবাজী ন্যায়যুদ্ধে তাহা অধিকার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য মহারাষ্ট্রবাসীর অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না। জাওলী রাজ্য শৃঙ্গারপুর অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ ও দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল। উহার অধিকার করিতে শিবাজীকে কূটকৌশলের অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। গ্রাণ্ট মহোদয় বলেন, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক জাওলীপতির নিধনসাধন করায় শিবাজীর প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও শিবাজীর দীক্ষাগ্রহণের সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধকল্পনা সুসঙ্গত নহে। ১৬৫৫ খৃঃ জাওলী-বিজয়ে যে কলঙ্ক অর্জ্জিত হইয়া-

স্বামীর উপদেশে "আত্মজ্ঞান" লাভ করিয়া সংকল্পবিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিলে রামদাস তাঁহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে তিনি বলিলেন,—"রাজ্য-বৈভব ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আর এই 'দুর্নিবার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণসেবায় জীবনপাতপূর্ব্বক পরমার্থসাধন করিব।" ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয়ভঞ্জনের জন্য তাঁহাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে ধর্ম্মপালন করিয়া জনক, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপে মোক্ষপদবীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা "শিবদিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে এ স্থলে অবিকল অনূদিত হইল,—

"যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে; তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ চণ্ড পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে; সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে; নামসংকীর্ত্তন বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল হইয়াছেন; এই সঙ্কটকালে সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগম-হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে; দেবতাগণ (দেবমূর্ত্তিসমূহ) অত্যাচারভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। যবনগণ (দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি?) বিবিধ কটুভাষা ব্যবহার করে; নানা প্রকারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়; রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া (যবনদিগের বিরুদ্ধে) তোমার যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বরাংশসম্ভূত পুরুষ; তুমি ব্রহ্মাদিগের কিছু হিতসাধন কর। এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্ম্মস্থাপন করা তোমার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন কর; নিজের প্রাণ দান করিয়াও তাহাদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রকারে প্রজ্জরীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্ম্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ধর্ম্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা; সত্যপথে বিচরণ করিলে ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম লাভ হয়। আপনার মানরক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরকুল সংহার করেন, জগতে তাঁহার আনন্দবহুল-কীর্ত্তি প্রচারিত হয়। সকলের প্রতি আনন্দময় ভাব ধারণ করিবে; শৌর্য্যসহকারে উপার্জ্জন করিবে; উপার্জ্জনকারী জগতে সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। (শিবদিগ্বিজয়; ৩৮৯ পৃষ্ঠা)।

ছিল, তাহা প্রক্ষালন করিবার জন্য ১৬৯১ অব্দে শিবাজীর রামদাস স্বামীর নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি?

"তুমি ক্ষত্রিয়, অতএব ক্ষাত্রধর্ম্ম পুরুষদিগে
দেবব্রাহ্মণের সেবা, ধর্ম্মসংস্থাপন ও [illegible]
এই যে, ম্লেচ্ছদিগের এই বহু দিবসের অত্যাচা
বিনষ্ট করিয়া তুমি রাজ্যপালনের ভার গ্রহণ কর

এইরূপ উপদেশে শিবাজীর বৈরা
আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজধানীতে ব
বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সহ অরণ্যে গমন-পূর্ব্বক
পূজা করিলেন। নিঃস্পৃহ রামদাস বস্ত্র
ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া কাননাভ্যন্তরে
শিবাজীকে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বিদায়
স্বামীর উপদেশে শিবাজী এরূপ অ
পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ স্বামীর দর্শনার্থ
কিন্তু রামদাস কখন কোথায় বাস করিতে
তিনি শিবাজীকে এই অধ্যবসায় হইতে
তিনি তাঁহাকে স্বরচিত "দাসবোধ" (৮)
বলিলেন, "এই গ্রন্থ প্রত্যহ নিয়মিতরূ
করিলে আমার দর্শনের ফললাভ হইবে।"
সম্মত হইতে হইল।

স্বধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া রামদাস কিরূপ
তাঁহার উপদেশে পাঠক তাহার পরিচয় পা
করিবার জন্য তিনি যে অভিনব পন্থার
অভিলাষ উল্লিখিত উপদেশে পাওয়া যায়
ম্লেচ্ছদের উদ্রেক করিতে না পারিলে বিজাতি
রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না দেখিয়া
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স

(৭) ম্লেচ্ছ ও যবন শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ভুল
দিগের সম্বন্ধে উভয় শব্দেরই নির্ব্বিশেষে ব্যবহা
শব্দগুলি যথাযথ ও অবিকৃত রাখিয়াছি।

(৮) দাসবোধ তখনও সমস্ত রচিত হয় নাই
রামদাস শিবাজীকে পাঠ করিবার জন্য প্রদান ক
একটি উৎকৃষ্ট সর্ব্বসংগ্রহ পুস্তক।

...র কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মসম্বন্ধে যে দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কারণে, আমরা এ স্থলে তাহার একাংশের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"এইবার পরম দুর্লভ ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রবণ কর। যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত নহে—অন্য কোনও উপায়ে উদরপূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। যাহারা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহাদিগকে ইহলোকে লজ্জা ও অপমান এবং মরণান্তে নরক ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। সমরে শত্রুনাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে সদ্গতি লাভ হয়; এবং শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলে যাবজ্জীবন মহান্ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারা যায়। কামানের গোলা যেরূপ নির্ভয়ে সৈন্যদলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইলে শত্রুদিগের ভয় আর ভয় কি? ব্যাঘ্র যেরূপ সর্ব্বসমক্ষে মৃগযূথকে ধরাশায়ী করে, (ঐরূপে উত্থিত হইলে) শত্রুদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে পারা যায়। পুরুষের সাহস পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেই জয় লাভ হয়।

"দেশের সমস্ত দেবমূর্ত্তি উৎসাদিত হইয়াছে; আমাদিগের ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয়কে একত্র কর, আপনাদিগের 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের' বিস্তার কর। এই কার্য্যের সহায়কারী না হইলে পূর্ব্বপুরুষগণ উপহাস করিবেন। মরণের আহ্বান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; শত যত্ন করিলেও শরীর রক্ষা হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য, তাহা বিবেকের সাহায্যে অবধারণ কর। যাঁহারা উচ্চবংশসম্ভূত বলিয়া সাহঙ্কারে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সময়ে যথাসত্বর 'হাজির' (কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ) হউন। এ সময়ে আলস্য ও অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে ইহ পরলোকে কষ্ট পাইতে হইবে। বিশুদ্ধজন্মা পুরুষগণ যদি সম্মুখে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া ভাল বলিব? এই কথায় যদি আপনাদিগের ক্রোধোদয় হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইবে। দেবদ্রোহীদিগকে কুক্কুর জ্ঞানে মারিয়া তাড়াইয়া দাও। নিশ্চয় জানিও যে, দেবভক্তগণই জয়লাভ করিয়া থাকেন। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণ কর; একোদ্যমে সকলে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দেশ বিজয় কর; স্বাধীকৃত প্রদেশসমূহ হস্তচ্যুত হইতে দিও না। আপনাদের দেশ রক্ষা কর, এবং তাহার মধ্যে যাহারা পরকীয় (স্বদেশদ্রোহী?), তাহাদিগকে আনিয়া অগ্রে তাহাদিগের সংহার কর। বিবেক, বিচার, সাবধানতা ও দীর্ঘ প্রযত্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া তুলজাদেবীর (ভবানীর) বরপ্রসাদে রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

হিন্দুধর্ম্মের সেই নির্য্যাতনের যুগে এরূপ উপদেশ প্রকৃতই 'পরম দুর্লভ' ছিল। যখন,—

যবনাবতীত-পবনাযমোদ্ভিনো
ভব-মাগণাধি-ভবনাভিমর্দ্দিনঃ।
সবনাদিকর্ম্ম-লবনায় দীক্ষিতা
যবনাশ্চরন্তি ভুবনা বিভীষণাঃ॥—বিশ্বগুণাদর্শ; ২১৮

হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ করিবার জন্য যবনদিগের দুর্দ্ধর্ষ তুরগসেনা ভৈরববেশে দেশে দেশে দেবমন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া বেড়াইত, (১) তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য এইরূপ উপদেশের যে অতীব আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? রামদাস স্বামীর এই উপদেশামৃত পান করিয়া মহারাষ্ট্রগণ অমর শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে তাঁহারা কখনই এত অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হইতেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে লুণ্ঠনপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল দস্যুদল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি রামদাস স্বামীর এই উপদেশাবলীর মর্ম্মানুধাবন করেন, তাহা হইলে Sydney Owen মহোদয়ের সহিত এক বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে:—

Shivaji and his people even in their warfare were by no means mere bandits. A halo of heroism, patriotism and religious zeal invested their proceedings and induced them to regard the Son of Shahji as a predestined, devinely favoured, indeed as an inspired deliverer. *** Both Shivaji and his original followers might well hold and did hold that in waging war after their own fashion with the Mosalmans, they were doing both God and man good service."—India on the Eve of British Conquest pp. 129/30.

সামসময়িক কবি বাঙ্কটাধ্বরি যথার্থই বলিয়াছেন—

যাবাচঙ্কু তথা ভবাবতপতিঃ প্রত্যর্থি-পৃথ্বিভুজাম্
নহারাষ্ট্র-ভটচ্ছটা রণপটুর্নো পর্যটত্যেব চেৎ।

(১) উল্লিখিত শ্লোকের রচয়িতা বাঙ্কটাধ্বরি কাঞ্চীপুরের (বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরমের) অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত হয়। সামসময়িক কবির এই বর্ণনা অত্যুক্তিমূলক নহে। মোসলমানদিগের সহৃদয়তা ও রাজদরবারে দেশীয়দিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ যদিও কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়াছিল, তথাপি মোসলমান সেনাপতিদিগের দেশবিজয়কালে ধর্ম্মোৎপাদনের প্রথার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আমীর জুমলার কর্ণাটবিজয় ও অওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অভিযান এই কথার প্রমাণস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

অবতারাংশ-মিশ্রহকুতো দেবাংশেরকা ইমে
নিপ্রভাঃ হ-নরোরশী বিতনুযুর্নিদ্দেভূমিহরাণ। ১৯২
দেব-ছোশিহর-হিতকৃতে দারিতয়েহপাকে—
মহাং সহ্যা কমনুধি মহারাষ্ট্র বৃষসা চেষ্টা॥ ১৯৩
ব্যাধিব্যাহ প্রতিইষ্টিকৃতাং ব্যক্তমুপ্রৈষধানাং
কাশিযোগ-প্রথয়ি-হৃদয়ঃ কটিবং বষষ্টং। ১৯৪

হিন্দুদিগের ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক ইংরাজ ইতিহাস-লেখক মহারাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রনীতির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগের ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। তদানীন্তন মহারাষ্ট্র সাহিত্যে সেকালের মহারাষ্ট্রগণের ধর্ম্মোন্মত্ত হৃদয়ের যে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, তাহা অল্পসংখ্যক ইংরাজ-লেখকই তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং ইংরাজ-রচিত দুই একখানি ইতিহাস-গ্রন্থই যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, তাঁহাদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্যকলাপ যে দস্যুজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ইংরাজদিগের মধ্যে সিডনী ওয়েন মহোদয় ভিন্ন আর কোনও লেখক যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রীয় উন্নতির এই নিগূঢ় কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।

রামদাস স্বামীর উপদেশাবলীর মধ্যে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" শব্দের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ অভিনব শব্দটি এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির স্বরচিত—নামসাময়িক অন্য কোনও কবির বা সাধুপুরুষের গ্রন্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় না। স্বামীদিগের বোধ হয়, স্বধর্ম্মের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুরাগবর্দ্ধনের জন্যই তিনি ঐ শব্দটির গঠন করিয়াছিলেন। "হিন্দুধর্ম্ম" ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের সাধারণ সম্পত্তি; অতএব সকলেরই রক্ষণীয়। যাহা সাধারণের সম্পত্তি, তাহার অবস্থা অনেকে স্থলেই "ভাগের মাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির" ন্যায় ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, মহারাষ্ট্র দেশে নব ধর্ম্মভাবের (ভাগবত ধর্ম্মের) প্রবর্ত্তনাকালে নীতিজ্ঞ রামদাস উহাকে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" নামে পরিচিত করিলেন। সুতরাং উহার রক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্কন্ধেই পতিত হইল। "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মকে" আপনাদিগের বিশিষ্ট সম্পত্তি বলিয়া মনে হওয়ায়, তাঁহাদিগের অনুরাগ স্বতঃই তাহার দিকে ধাবিত হইয়া রামদাস স্বামীর উদ্দেশের সফলতাসাধন করিল।

ভারতবর্ষে।

২।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীর শিষ্য মিনা বাহাদুর রাণা নেপালের এক জন ভূতপূর্ব্ব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিষয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ইনি সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ। ইঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইনি সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কুটীর বাসে, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনযাপন করিতে নিয়ত করেন। এইরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের (খৃষ্ট) ধর্ম্মের মত। খৃষ্ট ধনবানদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দীনভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ধনিগণ এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মের বিশাল বলের ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তথাপি কত লোক যেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকে। তাহারা মিনা বাহাদুর রাণাকেও উপহাস করিবে এবং তাঁহাকে বুদ্ধিবৈর্য্যহীন বলিবে। তিনি শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকরণ জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কত খৃষ্টানও এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ইঁহাকে বুদ্ধিবৈর্য্যহীন বলিবে। লোকে যাহা বলে বলুক, আমি কিন্তু ইঁহাকে শ্রদ্ধা করি। এ শ্রদ্ধা যৌক্তিক শ্রদ্ধামাত্র নহে,—আন্তরিক। তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি—না রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে, কেহ তোমাকে সেরূপ শ্রদ্ধা করিতে বলেও না। কিন্তু চেষ্টা করিলে তুমি এই সকলের প্রতি তাঁহার প্রবল বিশ্বাসকে ভক্তি করিতে পার। আরও একটু চেষ্টা করিলে তুমি তাঁহাকেও ভক্তি করিতে পার। তবে সে কার্য্য বড়ই কঠিন, তাই আমরা প্রায়ই সে বিষয়ে চেষ্টা করি না। কোন লোকের বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের বিশ্বাস একরূপ না হইলেই আমরা তাঁহাকে বুদ্ধিবৈর্য্যহীন বলি। পূর্ব্বে ভিন্নবিশ্বাসীদিগকে আমরা অনলে দগ্ধ করিতাম, এখন আর তাহা করিতে পারি না, তাই তাহাদিগকে বুদ্ধিবৈর্য্যহীন বলিয়াই নিরস্ত হই।

সিউনিতে গ্রন্থকারের সহিত এক জন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন,—

ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার না হওয়ায় ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হয়। তাহারা শুনে যে, ভারতবাসীরা সহজবিশ্বাসশীল ও অলৌকিক ঘটনায় সুদৃঢ়বিশ্বাসবান। কাজেই তাহারা মনে করে যে, এই সহজবিশ্বাসশীল ভারতবাসীরা অতিসহজেই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে,

আর সেই সঙ্গে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিলে তাহাদের অবিশ্বাসের আর কোনও কারণই থাকিবে না। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তাহারা মনে করে যে, কেবল ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দোষেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার অন্যরূপ। আমাদিগের বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকলের মত কার্য্যের হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের সকল খুঁটিনাটি অলৌকিক ঘটনার উপর সংস্থাপিত ও অলৌকিক ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত। আমাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা না হইলে তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করান সহজ হইবে না। আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে গমন করি, তখন আমার (তদ্দেশীয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করা) কার্য্য অতি সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে ভ্রম অতি অল্পদিনেই অপনোদিত হইয়াছিল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই বালকতুল্য অলৌকিক-ঘটনাপ্রিয় জাতিকে অলৌকিক ঘটনার সহিত ধর্ম্মের কথা বলিলেই তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই বিশ্বাসে আমি সোৎসাহে তাহাদিগের নিকট Samsonএর কাহিনী বলিতে লাগিলাম। প্রথমে তাহারা বিশেষ মনোযোগসহকারে আমার কথা শুনিতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম, ক্রমেই তাহাদিগের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। শেষ বুঝিলাম, আমার এত কথায় তাহাদিগের কোন মনোভাব স্থায়ী হয় নাই।

এক জন বৃদ্ধ হিন্দু আমাকে বলিয়াছিলেন,—আমরা হিন্দুরা কেবল তাঁহার কার্য্য দেখাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি; অন্য কোনও প্রমাণে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও বোধ করি এইরূপ মনে করেন। যখন কোন মানব কোন মানবক্ষমতাতীত কার্য্য করে, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সে দেববলে বলী, তাহার শক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও এইরূপ কার্য্য দেখিয়া বুঝেন যে, সেই কর্ম্মকারী ঈশ্বরের ক্ষমতায় পূর্ণ। স্যামসনের কেশে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল; কারণ দেখা গেল, কেশের সহিত তাহার অসাধারণ ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। হিন্দুদিগেরও এই মত।

স্যামসনের এই দৈববল ছিল বলিয়াই তিনি এক গর্দ্দভের গণ্ডাস্থি দিয়া সহস্র সহস্র নরকে নিহত করিতে পারিয়াছিলেন,—সেই দৈববলেই নগরতোরণ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আপনারা ইহাতে ভীত ও স্তম্ভিতবিহ্বল হইয়া পড়েন, কারণ আপনারা দেখেন যে, সে অসাধারণ শক্তির মূলে দৈববল। কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই; কারণ, আমাদিগের দেবতারা যখন হনুমানকে অসীম শক্তি দিয়াছিলেন, তখন দৈববলে বলী হনুমানের কীর্ত্তির তুলনায় স্যামসনের কীর্ত্তি মলিন, নিষ্প্রভ। এই কারণেই হিন্দু শ্রোতৃগণ আপনার কথায় অবহিত হয় না।

'যখন পুরাকালে ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্রের লঙ্কায় গমনের জন্য সিন্ধুসলিলে সেতুনির্ম্মাণের আবশ্যক হইয়াছিল, তখন স্যামসনেরই মত দৈববলে বলী হনুমান দুই দিনে সার্দ্ধ সপ্ত শতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া হিমাচল-পর্ব্বতখণ্ড আনয়ন করে ও তদ্দ্বারা সেতুবন্ধন করে। নিশাকালে গোবর্দ্ধনবাসীরা তাহার বজ্রনাদোপমের গদধ্বনি শুনিতে পাইল; সে শব্দস্পর্শে বসুধা কম্পিত

হইয়া উঠিতে লাগিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া তাহারা দেখিল, চিরতুষারমুকুটমণ্ডিত গগন-স্পর্শী মহাপর্বতসমূহ অগ্নিময় হইতেছে, পর্বতাঙ্গে শত শত গভীর আলোক সেই নৈশগগনে জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই পর্বত হইতে দেবতোষবাহী একাংশ খনিত হইয়া সেখানে পতিত হইল। তাহার অধিকাংশ কালে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; এখনও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান। জ্ঞানসূর্য্যের মত ঐশ্বরিক শক্তির সঞ্চার ব্যতীত হনুমান এ কার্য্য করিতে পারিত না। হনুমানের শক্তির বিষয়ে কিংবদন্তী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাই;—সে তো দূর, আজ আমি দৃষ্ট হনুমানী, কিন্তু গিরিগোত্রীন এখনও বর্ত্তমান।'

গ্রন্থকার বারাণসী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ক্লাইভ ও হেষ্টিংস উভয়ের কাহারও কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই, অথচ কোন এক অক্টারলোনীর নামে এক সমুচ্চ 'মনুমেণ্ট' আছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং গমনকালে পথে একটা ব্যাপার দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন,—

এই দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি এক জনও স্ত্রীলোক কি বালককে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখি নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের একটি মধুর গীত আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, প্রীস্যাণ্ড-ওয়ারল্যাণ্ড ও আমেরিকা,—নানা দেশ হইতে লোকে তাহাদিগের দেশ ভ্রান্তিমুক্ত করিবার জন্য আমাদিগকে (খৃষ্টানদিগকে) আহ্বান করিতেছে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাদিগের আহ্বানে আমরা যখন এ দেশে আসিয়াছি, আসিয়াছি, আশা করি, তখন আমরা আমাদিগের সমুচ্চ প্রতীচ্য সভ্যতার কতক অংশ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের (এই বিধর্ম্মীদিগের) নম্যতার কতক অংশ লইয়া আমাদিগের সভ্যতা পরিমার্জ্জিত করিয়া লইব। আমরা যদি ইহাদিগের উন্নতি করিতে চাহি, তবে ইহাদিগের নিকট আমাদিগেরও একটু উন্নত হওয়া আবশ্যক। যখনি পূর্ব্বে আসি, কলিকাতায় ক্যাথিড্রালে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়াছিলাম;—রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সেখানে খৃষ্টিয়ান অধিবাসী বোধ করি, বারাণসীবাসীরাও তত অপরিচ্ছন্নধর্ম্মবিশ্বাসী নহে। আমার তৎকালের ডায়রীতে দেখিতে পাই,—

"From Greenland's icy mountains,
From India's coral strand,
Where Afric's sunny fountains
Roll down their golden sand,
From many an ancient river,
From many a palmy plain,
They call us to deliver
Their land from error's chain"

গত কল্য হর্ষর, সুগন্ধ গ্রাম্যপথ দিয়া বহু দূর ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সে পথের আরোহী দুই কারণে নষ্ট হইয়াছিল,—প্রথমতঃ, পাশ্চাত্যে যে ধর্ম্মালয়; দ্বিতীয়তঃ, সেখে অতিলজ্জা স্ত্রীলোকদিগের অভাব। পথিপার্শ্বে প্রচুর ধর্ম্মালয়ে ক্রুশোপরি যুদ্ধের পেরেকের ও কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—রক্তাক্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থান হইতে যাইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকগণ কি নিদারুণ বেদনামূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন? আর দেখিলাম, পাশ্চাত্যে ক্ষেত্রে সন্তর কি অশীতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধারাও ক্ষেত্রের ফসল আটি করিয়া বাঁধিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিতেছে।

ইহার পর আমি অষ্ট্রিয়ায় যাই। পরে আমি মিউনিচে গমন করি। মিউনিচে দেখিয়াছি, বৃদ্ধারা গুরুভার মণ্ডের পিপায় বোঝাই ঠেলাগাড়ী চড়াই ও উৎরাই সমুল পার্ব্বত্যপথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমার অষ্ট্রিয়ান লিমিত ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম,—ক্ষেত্রে কর্ষণকার্য্যের জন্য যাপলে একটি স্ত্রীলোক ও একটি মোল্লাতীয় জীব একত্র বদ্ধ দেখিতে পাই,—চালক দুই জন পুরুষ। সোবিয়েনবাদ সহরে প্রকাশ্য রাজপথে দেখিলাম, এক বৃদ্ধা ও একটি কুসুম কন্যা,—তাহারা একখানি 'ভেজ' গাড়ী টানিতেছে; পুরুষ চালক নিশ্চিন্তমনে ধূমপান করিতে করিতে যাইতেছে;—তাহার বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসরও হইবে না!

পাঁচ কি ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার রোন নদীতে দ্বাদশদিবসব্যাপী নৌভ্রমণে বাহির হই। তৎসময়ের ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম, * * * অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলাম। সে দিন সেখানে অবস্থান করাই স্থির করিলাম। অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতে লাগিল; শীত প্রবল; "ওভারকোট" পরিয়া শীত ভাঙ্গে না—তাহার উপর আবার "ব্যাগ" ধরান আবশ্যক। বৃষ্টির ফোঁটা এতই বড় যে, বোধ হয় যেন গুলি-গুলিগুলিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুই এক জন কৃষক ব্যতীত কোনও পুরুষ গৃহের বাহির হইতেছে না। এ সকল প্রদেশে স্ত্রীলোকের পক্ষে সকল সময়ই সমান।—স্ত্রীলোকের আর পশুদিগের দাসত্বের বিরাম নাই।

আমি যখন সেখানে উপনীত হইলাম, তখন তিন জন স্ত্রীলোক নদীতীরে কাদা কাটিতেছিল। যতক্ষণ দিনের আলোকে কার্য্য করা সম্ভব হইবে, ততক্ষণ তাহারা সেই কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। তাহাদিগের মধ্যে এক জনের বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসর,—আর এক জনের বোধ করি পঁয়ত্রিশ,—তৃতীয়ার বোধ করি আশী বৎসর। তাহাদিগের 'ওয়াটার-প্রুফ' কি জন্য লোকে প্রকার নিবারক আচ্ছাদন নাই, আছে কেবল মস্তকে এক এক খণ্ড চটের ঝালা। বৃষ্টিবারির কতকাংশ সেই ঝালা বাহিয়া ভূমিতে পড়িতেছে—আর অবশিষ্টাংশ তাহাদিগের গাত্র সিক্ত করিতেছে!

কিছু ক্ষণ পরে এক জন বলিষ্ঠ যুবক চাষা গাধায় দিয়া—চুক্ষট টানিতে টানিতে একখানি গর্দ্দভ-শকটে আরোহণ করিয়া সেইখানে উপনীত হইল। সে বোধ করি বৃদ্ধার পৌত্র, স্ত্রীলোকদিগের পুত্র, যুবতীর পতি। সে গাড়ীতে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগকে হুকুম করিতে লাগিল, আর হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক তিন জন তাহার হুকুম

নীরবে তামাসা করিতে লাগিল;—তাহারা পাড়ীতে ছয় ঝুড়ী আর্দ্র বস্ত্র তুলিয়া দিল। সেই ঝুড়ীগুলি এতই ভারি যে, বোধ করি এক জন সাধারণবলশালী ব্যক্তি সেগুলি সহজে তুলিতে পারে না। গাড়ী বোঝাই হইলে যুবক অবতরণ করিয়া ছাতা মাথায় সরাইয়ে প্রবেশ করিল; আর ব্রাণ্ডেনবর্গ ফটক ভিজিতে ভিজিতে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে ফিরিল। আমি আসিয়া দেখিলাম, যুবক সরাইয়ে স্নান ও খাদ্য লইয়া বসিয়াছে—তাহার হস্তে একখানি ধর্ম্মপুস্তক রহিয়াছে। দেশে এই দুর্দ্দশা—আর যত দুই শত বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্ট অধীষ্ট অসভ্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেছে! এই বঙ্গীয়দিগের মত অজ্ঞাবশীভূতা-দিগের দুর্দ্দশামোচন কি সহস্রের পরিচায়ক নহে?

একটি কবিতায় আছে যে, ভারতবর্ষে সকলই সুন্দর, কেবল মানবই নীচ। তাহার কারণ এই যে, ম্যাসেডিয়ার, অষ্ট্রিয়ার ও ফ্রান্সের 'সভ্যতা' আজও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে আর অধিক বিলম্ব নাই। সে 'সভ্যতা' আসিতেছে। সে 'সভ্যতা' ভারতবর্ষকে 'উদ্ধার' করিবে—তাহার 'নীচতা' বিদূরিত করিবে।

ইহার পর লেখক সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্নদর্শনাভিলাষে কানপুরে ও লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করেন। পরে রত্নাভিরাম তাজমহল দেখিবার জন্য তিনি আগ্রায় উপনীত হন। তাজমহলে ইংরাজগণ সময়ে সময়ে ভোজ ও নাচ দিয়া থাকেন শুনিয়া, লেখক বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

সত্য কথা বলিতে কি—আমরা যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুতেই আমরা অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; সেই সকল বস্তুই যে অপরে পবিত্র বলিয়া মনে করে তাহা আমরা একবার মনেও করি না। কিন্তু একটা রহস্য দেখুন—আমরা যাহাকে শ্রদ্ধা করি, কেহ তাহাতে অশ্রদ্ধা দেখাইলে আমরা বিস্মিতস্তব্ধ হই। যদি এক দিন সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, এক জন অভিজাতবংশীয় ইংরাজ (আমেরিকার) 'মাউণ্ট ভারননে' যাইয়া ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে ভোজন ও নৃত্যগীতাদি সম্পন্ন করিয়াছে, তবে আমরা (আমেরিকানরা) কতই ক্রুদ্ধ হই—সেই ইংরাজদিগকে কত শক্ত কথা শুনাই। আবার যদি ইংরাজগণ এক দিন শুনে যে, এক দল আমেরিকান 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে'তে যাইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছে, তবে তাহারা কতই ক্রুদ্ধ হয়—সেই আমেরিকানদিগকে কতই কুকথা কহে।

'মাউণ্ট ভারনন' আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের দেহাবশেষ রক্ষিত, 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে' ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণের সমাধিমন্দির। তাজমহলের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বহুমূল্য উপাদানে রচিত সমাধিমন্দির আর কোথাও নাই। এখানে যে রাজরাজেশ্বরীর দেহাবশেষ সংরক্ষিত—তিনি এক দিন নরপতির জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাঁহার পবিত্র প্রেমে পতির হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্রা—আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। আমেরিকানের পক্ষে 'মাউণ্ট ভারনন' যাহা, ইংরাজের পক্ষে 'ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবে' যাহা,

আবহমানের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে এই তাজমহল তীর্থই, তাহাদিগের নিকট ইহা যথার্থ ভক্তিপবিত্র স্থান।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মেজর স্লীম্যান লিখিয়াছেন,—এই সম্রাটসমাধি সম্বন্ধে স্থানীয় ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বৈঠক ও ভোজ দিয়া থাকেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। নাচ ও ভোজ ব্যাপার মন্দ নহে, কিন্তু সমাধিমন্দিরের পক্ষে শোভনও নহে।

স্লিম্যানের বিনয় এই যে, ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে বা ওয়েষ্টমিনষ্টার এবেতে নাচ বা ভোজ দিলে যাহারা সেই বর্ব্বরোচিত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়, তাহারাই আমার হৃদিন পাইলে তাজমহলে সেই সকল বর্ব্বরোচিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

দিল্লী, লাহোর, জয়পুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গ্রন্থকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। যে সকল স্থান সম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমরা এইখানেই বিদায় লইলাম। বক্তব্য হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার ভারতবাসীদিগের প্রতি অন্ধ নহেন, বরং তাহাদের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বন্যা।

সাহেব! আজ রাত্রে নদী পার হওয়া দুষ্কর। একখানা বয়েল-গাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। আপনার আসিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে এক্কা ভাড়িয়াছে, সে এখনও ওপারে যাইতে পারে নাই। সাহেবের কি বড় তাড়াতাড়ি? আচ্ছা আমি পারের হাতীটা সম্মুখে লইয়া যাইতেছি। মাহুত! রামপ্রসাদকে এ দিকে নিয়ে আয়! স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে ত ভালই। সাহেব! হাতী কখনও মিথ্যা কথা বলে না। রামপ্রসাদ দুই কামানাকে দেখিতে পাইতেছে না। তাই ওপারে যাইবার জন্য বড় উৎসুক। সাবাস্! সাবাস আমার বাঘা! মাহুতখো! অর্দ্ধেক দূর গিয়া দেখ, নদী কি বলিতেছে। সাবাস্ রামপ্রসাদ! মাসিক আমার! একবার জলে নাম। বোকা! পালাস্ নায়। আরে, অতুল কি শুধু তোর বোঁটা পিঠ ফুলকাইবার জন্য? যা, যা! পাথরে রামপ্রসাদের কি করবে? আমার কলম্, আমার বোম্বের পাহাড়! হুং! হুং!

না সাহেব। সব বৃথা! আপনি ডাক শুনিতে পাইতেছেন। সে কালা নাগকে বলিতেছে—তাহার চলিবার ক্ষমতা নাই। দেখুন সে কিরিয়া মাথা নাড়িতেছে। ও নিষেধ নয়, বাহির রাগের কথা বেশ বুঝে। সেনাম রাম-প্রসাদ বাহাদুর সাহেব। রামপ্রসাদকে গাছের নীচে নিয়ে গিয়ে মশা লাগাও। বলই ত্যা রামপ্রসাদজী! সরকারকে সেলাম দিয়ে ঘুমাওগে।

কি হবে? জল না কমা পর্য্যন্ত সাহেবকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গোনার বর্জ্জিতে কাল সকালে বা পরশু জল কমিয়া যাইবে। সাহেবের এত রাগ কেন? আমি সাহেবের নফর। খোদা থাকিতে আমি কিছু এই নদীর সৃষ্টি করি নাই। আমি কি করিব? আমার কুঁড়ে ঘর ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই সাহেবের। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখোদাবন্দ! ভাই দিকে আসুন। নদীকে গালি দিলে কি ভুল করিবে? সেকালে সাহেবলোকেরা এমন ছিল না। আগুন-গাড়ীতে সমস্ত মাটী করিয়াছে। সেকালে সাহেবরা যখন দিনরাত ঘোড়ার পিছনে পিছনে যাইত, নদীতে পথ আটকাইলে বা একখানা গাড়ীর চাকা কাদায় বসিয়া গেলে তাহারা কিন্তু এ রকম করিত না। গোবার মর্জ্জি! এ রকম আগুন গাড়ীর মতন নয় যে চলবেই চলবেই—দেহের সমস্ত ভূতগুলো প্যাঙ্কে বাঁধিয়া দিলেও তবুও চলে। আগুন-গাড়ীতে সত্য সত্যই সাহেবলোককে নষ্ট করিয়াছে। এক দিন না হয় দু দিন গেলেই বা কি ক্ষতি? সাহেব কি সাদী কর্ত্তে যাচ্ছেন? ভাই এত ব্যস্ত? হো হো হো! আমি বুড়া হইয়াছি এমন বেড়ে একটা সাহেব দেখিতে পাই না। খোদাবন্দ! গোস্তাকী মাফ করিবেন আপনার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া থাকি। সাহেবের গোসা হয় নাই ত?

সাদী! নিজের সাদী! হো হো হো! বুড়ার মন সুমা সাহেব মতন কত কুঁড়ি ফুল আর পুরান বছরের ঝরা পাতা, সব এক সঙ্গে আছে। পুরাণ নূতন, আর যা ভুলিয়াছি, সমস্তই এক স্থানে। সাহেব চারপাইতে বসে না হয় একটু ভিজে থান। সাহেব! একবার আমার তামাকটা খেয়ে দেখুন। তামাকটা বড় সরীফন এ মুল্লুকের তামাক। আমার ছেলে সেখানে চাকরী করে—সে আমায় পাঠাইয়াছে। সাহেব, যদি নল ধরিতে ঘৃণা হয় তবে টানুন না কেন? সাহেব ত মুসলমানের মত তামাক খাইতে পারেন! বাহবা! কোথায় শিখলেন?

নিজের গাদী। হো হো হো। সাহেব বলছেন বিয়ের কথা কিছুই নয়। কালা আদমীদের কি সাহেবরা কখনও সাচ্চি কথা বলেন? তবে তাড়াতাড়ির আর আশ্চর্য্য কি? প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পারঘাটায় আমি খেয়া বাহিতেছি, কিন্তু কোনও সাহেবকে এত তাড়াতাড়ি যাইতে দেখি নাই। ত্রিশ বৎসর! ওঃ! অনেকদিনকার কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘাটে অনেক বেনিয়া পার হইত। একরাত্রে দুই হাজার বোঝাই বলদ পার হইতে দেখিয়াছি। এখন রেল হইয়াছে—আগুন-গাড়ীতে বস্ত বস্ত শস্য যাচ্ছে—মাথা লাখো মন মাল এখন ঐ সাঁকোর উপর দিয়া যায়। খুব আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু পারঘাটা এক প্রকার ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। বেনিয়ারা আর গাছতলায় তাঁবু ফেলিয়া থাকে না।

আকাশ মেঘিয়া আর লাভ কি? সকাল অবধি বৃষ্টি হবে। শুনুন; জলের ভিতর পাথরে কথা কহিতেছে। সাহেব আজ যদি পার হইবার চেষ্টা করিতেন, তা হলে, পাথরে আপনার হাড়গুলি তুবড়াড়া করিত! আমি ছুয়ার বন্ধ করিতেছি। বোধ হয়, আর বৃষ্টি হইবে না। আঃ! ত্রিশ বৎসর এই নদীর ধারে বুড়া হইয়াছি···চেরাগের তেল কোথায়?

খোদাবন্দ মাফ করিবেন! কুকুরের মত আমারও ভাল ঘুম হয় না। সাহেব দুয়ারের কাছে গিয়াছেন, একবার তাকাইয়া দেখুন আর শুনুন—ঐ পার হইতে ও পার এখন পুরা আধ কোশ। আপনি ঐ দূরে তারার কাছে দেখিতে পাইতেছেন—জলও সাত আট হাত গভীর। আপনার চক্ষে রাগ দেখিয়া জল কমিবে না; গালাগালিতেও নদী শান্ত হইবে না। কোন-টার বেশী জোর সাহেব? আপনার গলার, না নদীর? শুইয়া ঘের ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। পাহাড়ের নীচে যখন বৃষ্টি হয়, তখন বাহির রাগ আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি একবার রাত্রে এর চেয়ে দশগুণ ভয়ঙ্কর নদী পার হইয়াছি। সে দিন শুধু খোদার মেহেরবানীতে জাহান্নমের দরজা হইতে ফিরিয়াছিলাম।

আমি সেদিনকার কথা বলিব কি? বেশ সুন্দর গল্প! আর একবার তামাক সাজিয়া দিতেছি।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে,—আমার তখন বয়স কম—এইখানে আসিয়াছি—দেহে অসীম শক্তি। আমি যখন বসিতাম—এমন পার হওয়া যাইবে, তখন বেনিয়ারা আমার কথা অবিশ্বাস করিত না। আমি সমস্ত রাত্রি কাঁধ পর্য্যন্ত

স্রোতের জলে ডুবাইয়া এক পত ভয়ব্যাকুল বলদ পার করিয়াছি—একখানি খুনও খেঁড়িল যায় নাই। ইহার পর লোকগুলাকে পার করিতাম। যাইবার সময় সেরা বলদটা আমাকে বকশিস করিয়া যাইত। আমার এতই খাতির ছিল। আজ বৃষ্টি পড়িতেছে—নদী বাড়িতেছে—আর আমি কুকুরের মত ভেউ কেউ করিয়া ঘরে ঢুকিতেছি। সে তাকত নাই—আমি বুড়া হইয়াছি—আর আগুন-গাড়ীর জন্ম ঘাট খালি হইয়া গিয়াছে। গরুকে আমাকে খরিদ করিতে নাহির খোয়ান।'

সাহেব, আমার মুখ দেখুন। বালকের মতন। হাড়-বুড়ীর হাতের মতন। খোয়াব কিনা, এক দিন এক সুন্দরীর এই মুখ ভাল লাগিত। এই বাহাত্তরে এক জন মাথা রাখিত। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সাহেব। বিশ্বাস করুন। কিছুই মিথ্যা বলিতেছি না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে!

ডুবারের কাছে আসিয়া নদীর ওপারে দেখুন দেখি। অনেক দূরে নদীর তীরে একটা আলো দেখিতে পাইতেছেন কি? পাতিরা গ্রামের হনুমান-মন্দিরের আলো। ঐ বড় তাবাটার নীচে উত্তর দিকে পাতিরা গ্রামের নদীর বাঁকে গ্রামখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অনেক দূর সাঁতার দিয়া যাইতে হয় সাহেব। কাগজে চোপড় খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? আমি সাঁতার দিয়া পাতিরাতে গিয়াছি একবার নয়—অনেক বার। নদীতে মগরের অভাব নাই।

ভালবাসার কাছে জাতির বিচার নাই। না হ'লে আমি এক জন মুসলমান, এক জন মুসলমানের ছেলে, এক হিন্দু রমণীর জন্য—পাতিরার লবববাবের বিধবা ভগিনীর জন্য, এত আকুল হই কেন? কিন্তু ঘটিয়াছিল তাই। ঈশ্বর-দর্শনে পরিবারের তীর্থদর্শন উপলক্ষে মথুরাতে আসিয়াছিল। সে তখন নববিবাহিতা বধূমাত্র। গরুর গাড়ীর চাঁদোয়ার কপার হাল। বেশমী পর্দা দিয়া গাড়ীখানা ঢাকা। সাহেব, আমি তাহাদিগকে শীঘ্র পঁহুছিয়া দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হই নাই। কারণ, ঝাঁতালে পর্দা উড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম। যখন তাহারা তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বালক স্বামী মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে পুনর্ব্বার গাড়ীর ভিতর দেখিলাম। খোদার দোহাই! হিঁদুয়ানী অতি নির্ব্বোধ! সে হিন্দু হৌক, আর যেন হৌক,—সে কুষ্ঠাগ্রস্ত হউক বা সুস্থ হউক, তাহাতে আমার কি? আমি নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিয়া এই নদীতটে মনোরম কুটীর বাঁধিতাম। নবম দণ্ডের সপ্তম দণ্ডে লেখা আছে—মুসলমানকে বিবাহ করিতে নাই। তাহা কি সত্য?

শিয়া ও সুন্নি উভয়বাই কি বলে মুস্‌রিকিন্‌কে বিবাহ করিতে নাই? সাহেব কি তবে মোল্লা? নতুবা এ সমস্ত কথা কেমন করিয়া জানিলেন? কিন্তু আমি দুই একটা কথা বলিব,—যাহা সাহেব জানেন না। প্রেমের কাছে মিশা সুন্নি, মুমিন ও মুস্‌রিকিন্ নাই। নয় 'দণ্ড' শুধু প্রেমের অগ্নি জ্বালিবার জন্য দণ্ডমাত্র। সত্য সত্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু আমি কি করিব? লম্বরদারের লোকেরা হয় ত পাঠাইয়া আমার মাথা গুঁড়া করিত। আমি দু' পাঁচ জনের ভয় রাখি না। কিন্তু অর্দ্ধেক গ্রাম আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি করিতে পারি?

প্রত্যহ রাত্রে আমি পাতিবার এক শস্যক্ষেত্রে তাহার সহিত দেখা করিতাম। এ কথা কেহ জানিত না। আমি এইখানে নদী পার হইতাম। তাহার পর জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদীর বাঁকে যেখানে রেলের সাঁকো, সেইখানে যাইতাম। তাহার পর একখানা মাঠ পার হইয়া পাতিবাতে পঁহুছিতাম। রাত্রি ঘনান্ধকার হইলে মন্দিরের আলো দেখিয়া গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইতাম। নদীর নিকটে জঙ্গল সর্পে পরিপূর্ণ। বালির উপর ছোট ছোট কেঁচুটা ঘুমাইত। আর তাহার ভাইরা আমাকে সেখানে দেখিলে হয় ত মারিয়াই ফেলিত। কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া এ কথা কেহই জানিত না। বালি উড়িয়া আমার পায়ের দাগ ঢাকিয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে পারবাটা হইতে পাতিরাতে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার। বর্ষার প্রথমেও তাই। শরীরের বল দিয়া নদীর বলের সহিত যুঝিতাম। এবং প্রত্যহ রাত্রে কুটীরে আসিয়া করিয়া পাতিরাতে গিয়া স্নান করিতাম। সে এক দিন বসিয়া, হিরনাম সিং নামে এক জন বদমাইস্ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তাহার বাটী পাতিরায় পাবে। কিন্তু কিছু দূর উজানে। শিখরা কুকুর; তাহা না হইলে খোদার শ্রেষ্ঠ প্রসাদ ভামাক তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? হিরনাম সিংকে শমন-ভবনে পাঠাইবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। বিশেষতঃ হিরনাম শাসাইয়াছিল, তাহার কথায় রাজি না হইলে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া লম্বরদারকে ভগিনীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা বলিয়া দিবে।

এই খবর শুনিয়া অবধি একখানা ধারালো ছুরী কোমরে বাঁধিয়া সাঁতার দিতাম। আমাকে কেহ বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয় তাহার দিন ফুরাইত। আমি হিরনাম সিংকে চিনিতাম না। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে কেহ ব্যবধান করিলে কখনই তাহার মঙ্গল হইত না।

বর্ষার প্রথমে এক দিন রাত্রে পাতিরাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু নদী ক্রোধকুপিতা। সাহেব। বাহির হইবামাত্রই কুড়িয়ার নিশ্বাসের মধ্যে পাহাড় হইতে বাহির হইয়া দেড় হাত উঁচু দেওয়ালের মত ছুটিয়া আসে। আগুন বরানো ও চাপাটী রান্নার মধ্যে এক ক্ষুদ্র নালা হইতে বাহির যমুনার নহিনু হইয়া দাঁড়ায়। এক গোঙিয়া ভাটীতে একটা চর আছে। প্রথমে সেখানে থামিয়া দম লইতাম। নদী খরস্রোতা। কিন্তু ভালবাসার জন্যে ছোঁড়া কি না করিতে পারে? তারার আলো—অতি সামান্য, চরের মাঝামাঝি সাঁতার দিবার সময় মুখ ঘসিয়া একটা দেবদারুর ডাল ভাসিয়া গেল। দেবদারু খুব শক্ত গাছ—সহজে পর্ব্বতগাত্র হইতে উৎপাটিত হয় না। দেবদারু শাখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, পর্ব্বতের পাদদেশে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সাঁতার দিতেছিলাম। স্রোত আমার বিশের সমান হইতেছিল। কিন্তু চরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই চারি দিকে বেল নদীর যমনীর শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। কোনখানে আর চর নাই—শুধু এ পার ও পার জুড়িয়া একটা বড় ঢেউয়ের সাপার উপর ভাসিতেছিলাম। সাহেব কি কল্পনাও এমন জলের পাল্লায় পড়িয়াছেন?

জলের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হইতেছিল, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত যেন জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্রোতের মুখে গাছপালার সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। পঞ্জাব গর্ভে মানুষ যেন কিছুই নয়। সেই বারের বন্যার কথা লোকে এখনও গল্প করিয়া থাকে। ভয়ে আমার পিত্ত গলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর অপেক্ষায় কাঠখণ্ডের ন্যায় অসাড় হইয়া ভাসিয়া ছিলাম। জলে জীবন্ত জীবেরও অভাব ছিল না—তাহাদের আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতেছিলাম। একবার শুনিলাম, এক জন লোক যেন সাহায্যের জন্য চেঁচাইতেছে। বৃষ্টির জল চাবুকের মতন পড়িয়া নদীকে শুভ্র ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি নীচে পাথরের ও উপরে বৃষ্টির শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতেছিলাম না। এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে ভাটীতে চলিয়াছিলাম,—নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। অল্প বয়সে মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। সাহেব কি এখানে দাঁড়াইয়া রেলের সাঁকো দেখিতে পাইতেছেন? পেশোয়ার যাত্রী ডাকগাড়ীর ঐ আলো দেখা যাইতেছে। নদী হইতে সাঁকো এখন প্রায় তের হাত উঁচুতে। কিন্তু সে রাত্রে জাক্কির উপর আসিয়া জল গর্জ্জন করিয়া পড়িতেছিল। আমার পা জাক্কিতে আসিয়া ঠেকিল। সেইখানে ৩

থামের উপর অনেক গাছপালা আসিয়া জমিয়াছিল। সেই জন্য আমার বড় একটা বেশী আঘাত লাগিল না। শক্তিশালী লোক যেমন দুর্ব্বলকে চাপিয়া ধরে, বাহির সেই প্রকার আমাকে চাপিতেছিল। কোনও ক্রমে জাফ্রি ধরিয়া উপরে উঠিলাম। সাহেব। রেলের উপরও প্রায় আধ হাত জল। ভাবুন দেখি কি প্রকার বন্যা! আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছিলাম না। শুধু শুইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

কিছু অর্থ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশে দুই একটা বৃষ্টিধৌত তারা দেখা গেল। সেই অস্পষ্ট তারার আলোকে দেখিলাম, যত দূর দৃষ্টি যায়, তত দূর শুধু কালো জল। থামের উপর স্রোতোবিক্ষিপ্ত গাছপালার উপর মৃত জন্তু। অনেকটার গলা জাফরির মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। যাহারা তখনও ডুবিয়া যায় নাই, তাহারা জাফরি ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল—মহিষ ও গরু, বন্য শূকর, দুই একটা হরিণ। আর সর্প ও শৃগালের গণনা হয় না। সেতুর বামভাগ মৃত জন্তুর দেহে পরিপূর্ণ। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী জাফরির ভিতর দিয়া গলিয়া স্রোতের মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতেছিল।

তাহার পর তারা ডুবিয়া গেল—পুনর্ব্বার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদী ক্রমশই বাড়িতেছিল। নিদ্রা হইতে জাগিবার পূর্ব্বে মানুষ যেমন গা মোড়া দেয়, সেই প্রকার সাঁকোটা আমার পায়ের নীচে কাঁপিতেছিল। কিন্তু ভয় ছিল না সাহেব। শরীরে বল না থাকিলেও দিব্য করিয়া বলিতে পারি আমার বিন্দুমাত্রও ভয় হয় নাই। আমি জানিতাম, তাহাকে আর একবার না দেখিয়া মরিব না। আমার খুব শীত করিতেছিল, এবং বোধ হইতেছিল—সাঁকোও বুঝি শীঘ্রই ভাসিয়া যাইবে।

জল কাঁপিতেছিল—বড় একটা তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে যেরূপে কাঁপে। জলের বেগে সেতুর বামভাগ উত্থিত হইল—দক্ষিণ দিকের জাফ্রি জলের ভিতর ডুবিয়া গেল। আমি দাড়ি ছুঁইয়া বলিতে পারি—এ সমস্তই সত্য। শিবজাপুরের পাথরবোঝাই নৌকা বাতাসে যেরূপ ঘুরিতে থাকে, বাহির সাঁকো সেই প্রকার ঘুরিয়া গেল। ঠিক এই রকমে গিয়াছিল সাহেব। অন্য রকমে নহে।

আমি সাঁকোর উপর হইতে গভীর জলে পড়িয়া গেলাম। আমার পশ্চাতে ক্রোধকম্পিতা বাহির বিশাল তরঙ্গ। বাহির গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছিলাম। এবং সেই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম, সাঁকোর মধ্যদেশের স্তম্ভ স্খলিত হইয়া

জলে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ। তাহার পর
উঠিবার পূর্ব্বে আর কিছুই জানি না। সাঁ
গিয়া জটাবদ্ধ কেশ হাতে ঠেকিল। লোকট
সাঁতারে বাহির জোয়ান ভিন্ন আর কে
মড়াটা দুই দিকের আমার হাসি আসিল।
পাইব। আঙ্গুল দিয়া তাহার চুল জড়াইয়া
ছিল না। দুই জনে ভাঁটিতে ভাসিতে ভাসিতে
সে মৃত। এই অবলম্বন না পাইলে আমি ডু
মজ্জায় হিম প্রবেশ করিয়াছিল—হাড়ের উ
দাঁড়া হইয়াছিল। বাহির প্রবল প্রতাপ যাহা
আর ভয় কি? তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা ভা
দক্ষিণতীরাভিমুখ একটা প্রবাহ ধরিয়া ভে
যায়। কিন্তু মড়াটা একটা ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়
ভাবিলাম, গাছের ডালে লাগিয়া বুঝি এমন
শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে। হঠাৎ ঝাউ গাছের
লাগিল। বুঝিলাম, বন্যাজলমগ্ন শস্যক্ষেত্রে আ
মাটী পাইলাম। বোধ হইল, একটা মাঠে
একটা ঢিপির উপর মড়াটা বাধিয়া রহিল।
উপরে উঠিলাম।

বন্যার জলে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিল
পূর্ব্ব সীমানায় একটা চিতির কাছে। উপকার
দরকার হইতে পারে ভাবিয়াই হউক, বা
আনিলাম। শম্বরদারের বাটীর নিকটে নির্দি
তিনবার চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রিয়তমা
বাহির প্রবল বন্যায় আমার কুটীর ভাসিয়া গি
আমার কাঁদিতেছিল। আমি হাঁটু-জল ভাঙ্গিয়া
হইলে, ভূত ভাবিয়া সে পলাইবার উপক্রম কা
বাহু দিয়া বেষ্টন করিলাম..... সেকালে আ
এখন যদিও বুড়া হইয়াছি বটে।

আমি তাহাকে বাহির সাঁকো আমার

আমি দেবতা! ভরা বন্যার সময় বাহির পার হওয়া মানুষের অসাধ্য। তাহার হাত ধরিয়া টিপির কাছে গিয়া যাহার সাহায্যে নদী পার হইয়াছিলাম, সেই মৃতদেহ তাহাকে দেখাইলাম। রাত্রের শেষভাগে আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল;—অস্পষ্ট তারার আলোতে সেই শবদেহ দেখিয়া সে মুখ ঢাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'এ যে হিরনাম সিং!' আমি বলিলাম, 'জীয়ন্ত অপেক্ষা মরা শূকরই বেশী কাজের।' নিশ্চয়ই; কারণ পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমকে সে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যাই হোক্, মড়াটা সরাইয়া ফেলাই উচিত। নতুবা লোকে আমাকে নিন্দা করিবে।' দেহটা বলিতে গেলে প্রায় তাহার ঘরের দুয়ারের নিকটই পড়িয়াছিল।

দেহটা গড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'খোদার মর্জ্জি,—তোমার বক্তে আমার হস্ত কলঙ্কিত হইবে না। এখন তোমাকে দাহঘাট হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি কি না, সে বিষয়ের মীমাংসা তোমার ও বারসদিগের মধ্যেই হউক।' বন্যার জলে তাহাকে ভাসাইয়া দিলাম। মিম্বার-বোর্ডে মোল্লার দাড়ীর মত তাহার দাড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছিল।

হিরনাম সিংকে আর দেখি নাই। ভোর হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। জঙ্গলের ভিতর যেখানে জল দাঁড়ায় নাই, সেইখান দিয়া চলিলাম। অন্ধকারে যাহা করিয়াছি, প্রভাতের আলোতে তাহা দেখিয়া অস্থি শিথিল হইয়া আসিল। পাতিরা গ্রাম ও সুদূর অপর পারের বৃক্ষ-সমূহের মধ্যে দুই-ক্রোশ-ব্যাপী ফেনোচ্ছ্বসিত জলরাশির ব্যবধান হইয়াছিল। মধ্যে বৃক্ষের মাড়ির উপর জন্তুর দন্তের ন্যায় বাহি-পুলের স্তম্ভ জাগিতেছিল। জলের উপর জীবন্ত প্রাণীর—পাখীর—কি নৌকার চিহ্নমাত্র ছিল না। শুধু দলে দলে মরা জানোয়ার—মরা ঘোড়া, গরু—মানুষ ভাসিয়া যাইতেছিল। পর্ব্বতের নিম্নদেশের রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় সমস্ত জল লাল হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেমন বন্যা আর দেখিলাম না। সে রাত্রে আমি যাহা করিয়াছিলাম, অন্য মানুষে তাহা করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি সে দিন ফিরিতে পারিলাম না। লস্করদারের সমস্ত জোড়া জমা পাইলেও আমি অন্ধকারে ভিন্ন এমন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। অন্ধকারে বিপদ প্রচ্ছন্ন থাকে। নদীর এক ক্রোশ উজানে এক জন চামারের ঘরে আশ্রয় লইলাম। বলিলাম, বন্যার জলে আমাকে কুটীর হইতে ভাসাইয়া আনিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে নৌকাযোগে ঘরে পঁহুছিলাম।

কুটীরের বেওয়ারিশ, চাল কি মেঝের চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল শুধু—কাদা। সাহেব! বুঝিতে পারিবেন, জল কত বাড়িয়াছিল।

অদৃষ্টে ছিল—গৃহে, বাহি-গর্ভে, বা বাহি-পুলের নীচে মরণ হইবে না। সেই জন্য দুই দিনের বাসী মড়া হিরনাম সিংকে খোঁদা মিসাইয়া দিয়াছিলেন। আজ কুড়ি বৎসর হিরনাম সিং নরকে পচিতেছে, নিশ্চয় সেই রাত্রের স্মৃতিই তাহার নরকযন্ত্রণার চরম যন্ত্রণা।

শুনুন সাহেব! নদীর স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভাতের পূর্ব্বে সে ঘুমাইয়া পড়িবে। ভোর হইতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার তেজ বাড়িবে। এ কথা কেমন করিয়া জানিলাম? আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছি—বাপ যেমন ছেলের আওয়াজ চিনিতে পারে, আমি কি বাহির স্বর তেমনই চিনিতে পারি না? প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার রূপ পড়িয়া যাইতেছে। খোদা মালুম, এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু সকালের কথা আমি বলিতে পারি না। সাহেব! জল্‌দি করুন—আমি রামপ্রসাদকে আনিতেছি—এবার সে আর ফিরিয়া আসিবে না। মোটঘাটের উপর ভাল করিয়া ত্রিপল বাঁধা হইয়াছে ত? যাহুভ! বেটা গাধা! সাহেবের জন্যে শীঘ্র হাতী লইয়া আয়! ও পারে বলিস্—সকালে আর পার হওয়া যাইবে না।

টাকা? না সাহেব, আমি সেরকম নই। না না, ছেলেপুলেকে মিঠাই কিনিয়া দিবার জন্যও চাহি না। আমার গৃহ শূন্য—আমি বৃদ্ধ।

দূর রামপ্রসাদ! দূর! দূর! দূর! সাহেব তোমার ভালো হোক—বিদায়!*

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

---

* ক্লিপ্‌লিং হইতে ভাষান্তরিত।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ব্রেটহার্ট।

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রেট হার্টের The Luck of Roaring Camp প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি সাহিত্যজগতে এক জন নূতন প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব সূচিত করিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রেটহার্টের সমগ্র গ্রন্থাবলী চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর আয়তন প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ গল্প আছে। গল্পগুলির প্রধান ঘটনাস্থল, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরদেশ; কিন্তু নিউ ইংলণ্ড, ওল্ড ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কয়েকটি গল্পের ঘটনাস্থলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মিঃ চার্লস্ ওয়ারেণ ষ্টডার্ড, "আটলাণ্টিক মন্থলি" নামক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যশিল্পচাতুরী, মনোহারিতা ও লোকরঞ্জনতার হিসাবে তারতম্য আছে, তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, তাঁহার কোনও রচনাই অসার, অলীক ও অপদার্থ মনে করা যায় না।

১৮৫৪ সালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রেটহার্ট কালিফর্ণিয়ায় প্রথম আগমন করেন। সেই সময়ের কয়েকটি ঘটনা আমরা মিঃ ষ্টডার্ডের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।—যখন ব্রেটহার্টের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর, এবং দৃষ্টশক্তি তীক্ষ্ণ, তখন তিনি যৌবনসুলভ উৎসাহে কষ্টসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় শীঘ্রই তাঁহার প্রতিভার অনুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তিনি কিছু দিন পল্লীগ্রামে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং শিক্ষকের ব্যবসায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, কতিপয় অতি সুন্দর গল্পে তাহার নিদর্শন দিয়াছেন। তাহার পর কিছু দিন তিনি মুদ্রাকরের ব্যবসায়শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন; পরে পাড়াগেঁয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন ডাক সংবাদবাহকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে বন্দুকধারী দস্যুসঙ্কুল গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বরং আনন্দ উপভোগ করিতেন; সৌভাগ্যক্রমে কোন বিপদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ যৌবনসুলভ স্বাস্থ্যের কল্যাণে তিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেন। এই সময়ে যদিও তিনি প্রায়ই বিপদে পড়িতেন, তথাপি তাঁহার জীবনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের অভাব ছিল না। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকারের অনুকূল কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি মানবজীবনের যে ছায়ালোকসম্পাত, যে বৈচিত্র্য, যে ভাববাহুল্য দেখিয়াছিলেন, অতি অল্প লেখকই সে সকল লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

প্রথম জীবন।

ইহার পরে ব্রেটহার্ট কিছু দিন সানফ্রান্সিস্কো-নগরীতে "গোল্ডেন ইরা" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কম্পোজিটারের কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার "ক্লিস" নামক প্রথম রচনা "গোল্ডেন্ ইরা"য় প্রকাশিত হয়। পরে তিনি ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত "দি কালিফর্ণিয়ান" নামক সংবাদপত্রের লেখক হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে তাঁহার প্রকৃত গ্রন্থের আরম্ভ, ইহা হইতেই তাঁহার অক্ষয় যশের সূত্রপাত।

১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে "দি ওভারল্যাণ্ড মন্থলি" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ব্রেটহার্ট এই মাসিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এটন রোমান নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া, সে সম্বন্ধে নানা লেখকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পরামর্শেই তিনি পত্রপ্রতিষ্ঠিত হন। ব্রেটহার্ট এই সময়ে "গোল্ডেন ইরা" নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। ষ্টডার্ড, ব্রেটহার্টকে "ওভারল্যাণ্ড মন্থলির" সম্পাদক পদের যোগ্য স্থির করিয়া, রোমানকে তাঁহার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন। এই মাসিকের অষ্টম সংখ্যায় তাঁহার "দি ব্লাক সার্কলের সূত্রপাত" অফ রোরিং ক্যাম্প" প্রকাশিত হয়। জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সংশয় ছিল, এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সফলতালাভ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না। এই রচনায় অসাধারণ মৌলিকতা, পুরুষোচিত তেজ ও মানসিক বলের সমন্বয় দর্শন করিয়া, এক জন স্ত্রী-কম্পোজিটার এই রচনার বিরুদ্ধবাদিনী হইয়া উঠে। পত্র সম্পাদক হইতে কম্পোজিটর, কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ম্মচারী হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যাঁহারা এই রচনা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ব্রেটহার্টকে অনেক ভুগিতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য, সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ও সুরুচি সম্বন্ধেও নানা জনে বিবিধ জল্পনা করিয়াছিল। ব্রেটহার্ট বলিলেন, যদি পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার গল্প প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভয়প্রদর্শনের ফলে পরিশেষে, তাঁহারই জয় হয়। "দি ওভারল্যাণ্ডের" স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ব্রেটহার্টের কীর্ত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বায়রন লিখিয়াছেন, এক দিন প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম, আমি যশস্বী হইয়াছি। ব্রেটহার্টের ভাগ্যেও প্রায় সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এই রচনায় তাঁহার যশ সহসা অপসৃতজলদাবরণ দীপ্ত প্রভাকরের মত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

রচনা যাহাতে নিখুঁত হয়, ব্রেটহার্টের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি। এমন কি, একটি সামান্য শব্দের জন্যও তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দটির ব্যবহার করিতে পারিলে পদের লালিত্য বর্দ্ধিত হয়, রচনা-শক্তিশালিনী হয়।

ভাষা।

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি"—ইহাই তাঁহার আদর্শ,—রচনার মূলমন্ত্র। ব্রেটহার্টের রচনা তাঁহার অন্তরের কথা। এক বার এক জন ব্রেটহার্টের রচনার এক অংশ পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; ব্রেটহার্টের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন উহা লিখিয়াছিলাম, তখন আমিও কাঁদিয়াছিলাম।'

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

নবদ্বীপ।

পৃথিবীর জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাম সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। মানবের সুখসমৃদ্ধিবিস্তারে, জ্ঞানের সার্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানে, আমাদিগের যুগ দৃষ্টান্তস্থল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভূত উন্নতির প্রধান কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরসম্মিলন। অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ স্বয়ং আমাদিগের বাহন,—এই গমনাগমনের সুবিধার দিনে, সুদূর সিন্ধুসলিলবিধৌত শস্যপল্লবশ্যামল মধুর

জলকল্লোলমুখরিত দ্বীপভাগে ভ্রমণ করিয়া, অনির্ব্বচনীয়সুন্দরী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কাহার মন না ব্যাকুল হয়? শত বৎসর পূর্ব্বে দেশভ্রমণ বিলাসের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা অন্নবস্ত্রের ন্যায় আবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। আমাদের দেশে পূজা ও বড়দিনের অবকাশে "পশ্চিমে" যাইবার পদ্ধতি, ইহারই উদাহরণ। যাঁহাদিগের জ্ঞান গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাঁহারাও এখন পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তস্থিত ঔপন্যাসের নবাবিষ্কৃত স্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিতে পারেন। সুতরাং কোনও ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা এখন একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ ঘটনাকে গ্রন্থকারের কল্পনার রঙ্গিন কাচফলকের মধ্য দিয়া দেখাইতে পারিলে, তাহা গুণগ্রাহী পাঠকের নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারে, কিন্তু দেশবিশেষ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিয়া পাঠকের প্রসাদলাভ আজকাল সহজ নহে। অল্প দিন হইল, কুমারী অগষ্টা ডি উইট Facts and Fancies about Java নামে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পুরাতন যবদ্বীপ আমাদিগের পরিচিত এবং ঐতিহাসিক স্থান। ইহার সৌরকরমণ্ডিত পর্ব্বতমালাচুম্বিত সুনীল আকাশ ও স্বর্গীয়-সুষমাময়ী বনদেবী ভ্রমণকারীর হৃদয় ভাবরসে আপ্লুত করিয়া তুলে। অনুবাদে কুমারী ডি উইটের রচনার ভাষামাধুর্য্যের রক্ষা করা কতকটা অসম্ভব হইলেও, তাঁহার পুস্তকের দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিব।

জাহাজ লাগিবার পর আধ ঘণ্টা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক ভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু এই নূতন দেশে এই প্রথম ব্যাপারেও কিছু নূতনত্ব আছে। জাহাজে বিশাল জনতা, কিন্তু গোলমালমাত্র নাই। অনেক লোকের পদশব্দ, হুড়াহুড়ি, চীৎকার, কলহ, কোলাহল নাই, মুটেরাগণ বৃহৎ বৃহৎ গাঁইগুলা কাঁধের উপর ফেলিয়া প্রায় নিঃশব্দে যাইতেছে। প্রত্যেক কুলি তাহার পালার প্রতীক্ষায় আফিসে অথবা প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। যখন কোনও য়ুরোপীয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহাদিগের মধ্য দিয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের সরল শান্ত মুখমণ্ডলে যুগপৎ ঘৃণা ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, দিনের ভিতর আরও ত কত সময় রহিয়াছে, আরও ত কত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, তবে ইহারা এত ব্যস্ত কেন? অমঙ্গল হইতেই ব্যস্ততার জন্ম, ইহারা কি তাহা জানে না?

অবতরণ।

ভারতীয় ইংরাজগণ রেলওয়ে ষ্টেশনে কোলাহলপ্রিয়তাসহ কুলিদিগের অশিষ্ট ব্যবহারে যেরূপ অভ্যস্ত, তাহাতে কুমারী অগষ্টার অবতরণকাহিনী, তাঁহাদের নিকট বিশেষ আমোদজনক বলিয়া বোধ হইবে। ভারতের সহিত যবদ্বীপের অনেক বৈষম্য আছে তন্মধ্যে ইহার হোটেল একটি। যবদ্বীপের হোটেলগুলি এমনই অসুবিধাজনক যে, গ্রন্থ-কর্ত্রীর অভিজ্ঞতা এখানে কাহারও অসূয়ার বিষয় হইবে না।

হোটেল।

গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতেছেন,—ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছি। সহরের প্রখর রৌদ্র, বিচিত্রবেশ-সজ্জিত জনতা, নূতন নূতন দৃশ্য ও নানা প্রকার অদ্ভুত শব্দ, এই সকলের মধ্যিতা যেন আমাকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল;—কেবল মদই যে মত্ততার কারণ নহে, এ সম্বন্ধে হোমারের সহিত আমিও সম্পূর্ণ একমত। গৃহের পশ্চাৎভাগ দিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত প্রবেশ করিলাম। আহারস্থলের দিকে চাহিয়া দেখি,—অন্ন, মৎস্য, মাংস ও ফলের পাত্রে টেবিল পূর্ণ। আমার সম্মুখে যাহা পড়িল, তৎসমস্তই নিজের পাত্রখানিতে রাশীকৃত করিলাম। আমি আহার-করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর যে কি হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে। এইটুকু লিখিতে যত

সময় লাগিয়াছে, তদপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে আমি অতীব যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। পরম চামচের সংযোগে আমার ওষ্ঠাধর জ্বলিতে লাগিল, এবং সেই জ্বালানিবারণ করিবার জন্য যে জল পান করিলাম, তাহাতে আমার গলা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। আমার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল, কষ্টে অশ্রুধারার গতিরোধ করিলেও,—যন্ত্রণা নিতান্তই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমার পার্শ্বে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন; তিনি আমাকে জিহ্বায় কিঞ্চিৎ লবণ দিতে বলিলেন। দুই এক মিনিট দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভোগের পর একটু আরাম বোধ করিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও ভুলিয়াও এরূপ আহারের দিকে চাহিব না। বলা বাহুল্য, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই।

পোষাক ও ভ্রমণ।

যবদ্বীপবাসী ডাচগণ গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য ও আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মহিলাগণ গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান দেশের ক্লেশদায়ক বেশের পরিবর্ত্তে দেশীয় পোষাকই পছন্দ করেন। এখানে বাধ্য হইয়া শ্রীমতীদিগকে বেশের বিলাস ত্যাগ করিতে হয়। ইংরাজগণ উষ্ণপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নকালে বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করেন, কিন্তু এখানকার ওলন্দাজগণ সে বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমান, সন্ধ্যার সুশীতল ছায়ায় ইঁহারা বহির্গত হন।

ছয়টার সময় সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে বারান্দায় যাঁহারা বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারা চা পান শেষ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, কতকগুলি য়ুরোপীয় ভদ্রলোক, তাঁহাদিগের সামাজিক পরিচ্ছদে, ও তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি মহিলা পারিস নগরীতে প্রস্তুত পোষাকে সজ্জিত হইয়া, বাহিরে আসিলেন। আমি তখনই প্রথম শুনিলাম যে, বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার এই প্রশস্ত সময়। আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল স্তম্ভোপরি স্থাপিত হোটেলের বিস্তৃত কক্ষ আলোকমালায় উদ্ভাসিত। একটি বালিকা পিয়ানোর সঙ্গে তাহার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া একটি গান গাহিতেছে।

রাত্রি আটটার সময় যখন আহার করিতে গেলাম, তখন প্রাতের সেই ভোজনব্যাপারের দুর্দ্দশা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে আমার ভোজনপাত্র পরিবর্ত্তনার্থ প্রসারিত একখানি হাত দেখিয়া আমার সেই ভ্রম অপনোদিত হইল।

চীনাম্যান।

পূর্ব্ব দেশের সমস্ত সহরের ন্যায় ব্যাটাভিয়াতেও চীনাম্যানগণ আপনাদিগের সংখ্যা ও পশার বিস্তার করিতেছে। সহরের মধ্যে ইহাদিগের কতকগুলি পল্লী আছে। এক দিকে উদ্যমশীল পরিশ্রমী চীনাম্যান অর্থোপার্জ্জনে ব্যতিব্যস্ত, অপর দিকে আলস্যপ্রিয় চিন্তাশীল যবদ্বীপবাসী আতপতাপোপভোগ করিয়া স্বপ্নরাজ্যে কুহকে মগ্ন। যবদ্বীপে চীনাম্যান কায়মনঃপ্রাণে বাণিজ্যে নিরত। মাতৃক্রোড় হইতে সমাধি পর্য্যন্ত, আহারে বিহারে, আমোদে প্রমোদে, শয়নে স্বপনে, অহিফেন-সেবনে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, চীনাম্যান বাণিজ্যের অবতার। ইহাদের চিন্তা ও বুদ্ধি 'টাকা আনা'য় প্রকাশ করা যায়। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা ইহাদের নিকট অর্থোপার্জ্জনের একটা প্রকাণ্ড সুযোগমাত্র, এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই ইহাদের পণ্য দ্রব্য। ইহাদের ভাষায় বাণিজ্য বলিতে খ্রীষ্টানের পক্ষে লাভ ও অন্যান্য সকলের পক্ষে লোকসান বুঝায়! ইহাদের অভাব অতি অল্প; উপায় ও সুযোগ অসংখ্য, এবং ব্যবসায়কুশলতা সম্বন্ধে আত্মনির্ভর যথেষ্ট। সুতরাং ইহারা যে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ইহাদের এক জনের জীবন মনঃসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমে দেখিবে, কোন এক সহরে আসিয়া, চীনাম্যানি ভলিউটা, চিকণী ও দেশাওলাইএর এক ব্যাগ স্কন্ধে করিয়া চলিয়াছে।

কয়েক মাস পরে দেখিবে, সে হয় ত তোমার বাড়ীতেই ভৃত্যবর্গের নিকট পোষাক ও রেশমী আপ্পা বিক্রয় করিতেছে। এক বৎসর যাইতে না যাইতে দেখিতে পাইবে, তাহার বোঝা-মস্তকে লইয়া এক জন মুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাতে চলিয়াছে। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে, সেই চীনাম্যান একখানি ছোটখাট দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে, এবং তখন একখানি বড় কৌচ ও দেয়ালে একখানি বড় আয়না তাহার দোকানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। কয়েক বৎসর পরে দেখিবে, সে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন একখানি বড় নূতন দোকানে অর্দ্ধোত্থিত ও অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া অতি সুরুচির সহিত অহিফেন সেবন করিতেছে। এবং যদি তোমার ভাগ্যে তাহার অর্দ্ধোদ্গিরণীর দর্শনলাভ ঘটে, তাহা হইলে তুমি সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপার উচ্ছল অলকাবলীতে উজ্জ্বলতর হীরার ফুল দেখিয়া বিস্মিত হইবে। বন্ধুবর এখন উন্নতির পথে অগ্রসর! সত্বরই তাঁহার কারুকার্য্যখচিত সুষমা সুসজ্জিত আবাসহর্ম্ম্য রাজবর্ত্মশ্রীর সুষমা-বর্দ্ধন করিবে।

ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণের সমাজে নৈতিক বল ও দুর্ব্বলতা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন সমাবেশ প্রচলিত, সেখানে শুজন একটু আধটু থাকিবেই।

দেশবাসিগণ।

যবদ্বীপবাসিগণ বিশেষ শান্ত, মিতাচারী ও সরলপ্রকৃতি; শিল্পাদি প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদিগের উৎসাহ ও দক্ষতা থাকিলেও, অলসতা তাহাদিগের স্বভাবগত ব্যাধি। ইহাদিগের ধারণা,—যত অমঙ্গল হইতেই ব্যস্ততার সৃষ্টি। ইহাদের কতকগুলি গার্হস্থ্য আচারপদ্ধতি পাশ্চাত্য রুচির নিতান্ত বিরোধী।

যবদ্বীপবাসিগণ তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে কিরূপে আহার করাইয়া লয়, তৎসম্বন্ধে জুমারী অগষ্টার বর্ণনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক।

অন্যান্য অনেক বিষয়ে শিশুসন্তানদিগের স্বাধীনতা থাকিলেও, ইহাদের আহার সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুদিগকে কখনও ইচ্ছামত খাইতে দেওয়া হয় না। জননীগণের সংস্কার, তাহারা নিজে খাইতে গেলে কিছুমাত্র পাইবে না। অভ্যাসের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যগ্র। জননী অন্নের থালা সম্মুখে রাখিয়া, শিশুসন্তানকে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ের উপর ফেলিয়া, অন্নের গুটি পাকাইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সেই অন্নপিণ্ড শিশুর গলনলীর অভ্যন্তরে চালান দেন।—অবশ্য এইরূপ ব্যাপারে শিশুর আহারস্পৃহা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে চীৎকার করিয়া হাত আটকাইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একরকমে যখন সমস্তটা গলাধঃকরণ করে, তখন মার মনে হয় যে, শিশু যথেষ্ট আহার করিয়াছে। অর্থাৎ, যখন তাহার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, আর একটু অন্নকণারও স্থান নাই, তখন বেচারীর নিষ্কৃতি।

শিশুসন্তানগণের আহার।

জননী।

জননী-হৃদয় তুমি না জান তা' নয়
জগত-জননী, তুমি মা জননী-পরা—
তোমার যে স্নেহ রাশিয়ীর সুধাময়
আনন্দ-হিল্লোলে তপন শশাঙ্ক ধরা
বিকশিত সৃষ্টি-স্রোতে—সুষম নিটোল
বসন্ত-মাধুরী যাহার প্রথম তান—
পূর্ণ-পূর্ণিমায় তার আপন বিভোলা,
সুর নন্দী-ভৃঙ্গী নিয়ত তারের প্রাণ।

আছে কি কোথাও দেবি, এমন কোমল?—
অসম্বল ছায়া পথে ব্যথিতা হরিণী—
আছে কি এমন দেবি, সুদৃঢ়—সবল?
প্রিয়-শুভ তরে বুকে ধরে যে অশনি—
মা বলে তোমারে ডাকে মানব-হৃদয়
শুদ্ধ যবে পায় তব স্নেহ-পরিচয়।

২

মা হয়ে যাহার প্রাণ কোন প্রাণে তুমি
কাঁদাও জননি তবে? জ্বালাও মৃত্যুর
অলঙ্ঘ্য বিরহ দাহে—অসীম মধুর
আনন্দময়ীর হৃদয়-ধরণী-ভূমি
নির্ব্বাপিত কর অনির্ব্বাণে হলাহলে।
শুষ্ক ক্রোড় অভিশাপ মার, তিরস্কার
নহে কি তোমার? পরদিন মুখ তার
ঊষা আসি কেমনে দেখায়? অশ্রুজলে
না মুছায়ে লয় সন্ধ্যা কেমনে বিদায়?
জ্যোৎস্নাবাস নিশীথিনী পরাণ কেমনে
সে শোক-আঁধার-স্পর্শ-অশুচি আপনে,
যে আঁধারে রবি-শশী আলো না জুয়ায়?
নাহি সামঞ্জস্য দেবি, তোমার ধরায়—
মার প্রাণে মৃত্যুশোক—অ-শোক ভুবনে।

৩

অপূর্ণ সৃষ্টির মাঝে সম্পূর্ণা জননী,
স্নেহ-কর্ত্তব্যের ভার নাহিক স্খলন।
নিঃস্বার্থের এক মূর্ত্তি।—মিটায় তখনি
জাগায় যে সাধ স্নেহ।—উদার পাবন
নিজের জীবন দিয়া রক্ষিছে জীবনে।
লুপ্ত করি ধূলি নত স্বার্থ জগতের
সে স্নেহ করেছে জয় দুর্জ্জয় আপনে।
এ কি ঘোর উপহাস সে মাতৃস্নেহের!

এ কি ঘোর উপহাস!—সে অসীম স্নেহ
পারেনি ক্ষমতা হায়, সৃষ্টির নীতিতে,
মৃত্যু যবে আসে নিতে, অন্ধ করি গেহ,
প্রাণ দিয়া প্রাণাধিকে বুকেতে রাখিতে।
মরত-জননী—তুমি দরিদ্রা আমার!—
জগত-জননী হতে শ্রেষ্ঠ পরবার।

৪

এ কি রে প্রলাপ মূঢ়—পাপ অভিমান—
অন্ধ করিছেছ সূর্য্যে তিমির আরোপ।
স্নেহের আকরে দেখ স্নেহের বিলোপ!
মা হতে মায়ের প্রাণ তার নাই প্রাণ!—
ভাবিলি না হায় মূঢ়, নিজে কি জননী
গড়িয়াছে সঙ্গোপনে সে স্নেহ অচল
যাহার অমৃত-স্রোতে জীয়ে ধরাতল?
শিশু কি গড়িল নিজে সে স্নেহের খনি?

কত দূর দৃষ্টি চলে অন্ধ মানবের!
কে দেখেছে জীবনের পরিণাম হায়!
যখন আসিলে অন্ধ—রিক্ত—অসহায়,
মা দাঁড়াল অযাচিত স্নেহ-দাসত্বের
অপেক্ষায়! আছে পুনঃ পারে মরণের
মাতা হতে মাতৃতমা তব প্রতীক্ষায়।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

মাধবী দেবী।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'শ্যামানন্দ পুরী নিজকে দুঃখিনী ও শিবানন্দ আপনাকে 'শিবাসহচরী' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। পাঠক মেয়েলী নাম পাইয়া স্ত্রীকবির খোঁজ করিতে করিতে দেখিবেন ভক্তির ইন্দ্রজালে পুরুষগণ স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছেন।"—১৬৯পৃঃ।

আমরা দেখিতেছি, দীনেশ বাবু স্ত্রীকবির সন্ধান বিষয়ে তাঁহার পাঠকগণকে এইরূপ সতর্ক করিয়া দিলেও, তিনি নিজেই জনৈক পুরুষ কবির কীর্ত্তিহার একটি স্ত্রীলোককে অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত বৈষ্ণব-গ্রন্থরহস্যাভিজ্ঞ তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাধবী দেবীকে পদকর্ত্তা মাধবীদাসের কীর্ত্তিবাস পরাইয়া, অপ্রতিভাতস্ত্রীপ্রতিকৃতি পুরুষনামধারী পুরুষ কবির বনবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতরত্নাবলী, প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রভৃতি পদাবলী-সংগ্রহের মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি পদকর্ত্তৃগণের ও তাঁহাদের রচিত পদাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তালিকায় কোনও স্ত্রীকবির নাম নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহার ১৭৪ ও ৩২১ পৃষ্ঠায় শ্রীখণ্ডনিবাসিনী ভগিনী মাধবী দেবীকে অনেকগুলি পদের রচয়িত্রী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই, এবং সম্প্রতি "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় (৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা) "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাধবী দেবীর বিবরণ ও তাঁহার পদাবলীর সমালোচনা সহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়, মাধবী দেবীর যে পরিচয় ও তৎকৃত পদাবলীর যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহার সহিত আমার সংগৃহীত বিবরণের তুলনা করিয়া, সেই সকল পদ মাধবী দেবী বা অন্য কোনও স্ত্রী কবির রচিত কি না, তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সন্দেহ কত দূর সমূলক, তাহার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দীনেশ বাবু পদকল্পতরুগ্রন্থেই মাধবীর পদ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন, এবং তিনি পদকল্পতরুর ৭৮৮। ১৮৪। ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদগুলিকে শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলেন। * বটতলায় মুদ্রিত কয়েকখানি পদকল্পতরুতে দেখিলাম যে, ২১৯৩ সংখ্যক পদটিতে "মাধবী," এবং অপর তিনটি পদে "মাধবী দাস" এই ভণিতা আছে। সমগ্র পদকল্পতরুগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, "মাধবীদাস" এই ভণিতাযুক্ত আরও দুইটি পদ পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয়ও পরিষৎ-পত্রিকায় "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে এই দুইটি ও দীনেশ বাবুর উক্ত চারিটি, সর্ব্বসমেত এই ছয়টি পদ, মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য পদকল্পতরুর সংখ্যা সহ উক্ত ছয়টি পদ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

১

অঙ্গ মোড়াইয়া কান্থ নিরখই রাইতনু
রাধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ। হেরি সখী চমকিত ভেল॥
তনু তনু সরস পরশ রস-পিরই চিত্রপুতলী হেন বেঢ়ল সখীগণ।
কমলিনী মধুকর রাজ॥ নিরখই শ্যাম-মুখচন্দ্র।
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশখা আলী
শিথিল কবরী সব অঙ্গ। সব জনে লাগল ধন্দ॥
গদগদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ শ্যামর সুন্দর বদন-সুধাকর
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥ সুমুখী নেহারই সাধে।
সো ধনি চাঁদবয়নি কিয়ে হেরব উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
শুনব অমিয়াসম বোল। বিদগধ মাধব রাধে॥
ইহ মঝু হৃদয়ে তাপ কিয়ে মিটব পদ. ক. ৭৮৯।
সোই করব কিয়ে কোল॥

২

ঐ ছলে অন্তর বিলসয়ে মাধব নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে
সহচরী দূরতহি হাস। আইসে জগদানন্দ।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
কহত হি মাধবী দাস॥ গোকুলপুরের ছন্দ॥
পদ. ক. ৭৮৮। ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।

২

পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
পরশিতে রাই-তনু আপনে ভুলল কানু এই অনুমানে চায়॥
মুরছি পড়িল ধনী-কোর। লতা তরু যত দেখি শত শত
শ্যামক হেরইতে। ধনি ভেল গদগদ, থাকালে খসিছে পাতা।
চরকি চরকি বহে লোর॥ রবির কিরণ না হয় ফুটন,
শ্যাম মুরহিত হেরি চকিতে ললিতা ফিরি সেয়গণে দেখে রাতা॥
রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল। ডালে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩২১ পৃষ্ঠা।

কল কল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে লুকরি লুকরি
গোরাচান্দ নাম লৈয়া॥
ধেনু মুখে মুখে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা॥
প. ক. ১৮০৪।

৪

কলহ করিয়া ছলা আগে পঁহু চলি গেলা
হেটিবারে নীলাচলে রায়।
যতেক ভকতগণ হৈয়া সকরুণ-মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহ আনলে ভেম বন্দ।
আঠার নালাতে হেতে নাচিতে নাচিতে পথে
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ॥
সিংহদুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ হেম জিনি গোরাঙ্গ বরণখানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
এবে ভ্রমে সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্টগৃহে করয়ে প্রবেশ॥
প. ক. ২১৯২।

৫

নিত্যানন্দ যতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গোরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে॥
প্রভুপদারবিন্দকান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ-তিলক শোভিত॥
গোপীনাথ, বাণীনাথ, সার্ব্বভৌম পাশে।
গৌরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী॥
দক্ষিণে নিতাই বামে গদাধর।
মিলিলেন গৌরাচাঁদের যত ভকত॥
সেই দেখে গৌরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥
প. ক. ২১০৩।

আনন্দে নাচত মত্তে ভকত
গৌর কিশোর-রাজ।
কাঁও উঘারি করে কোমাকোলি
নীলাচল পুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরী
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌর পড়িলা নাপরে
বসন চাহিয়া থাকে॥
দু' বাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকতগণের মঝ।
নীলাচলবাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ॥
বাজে করতাল বোলে ভালি ভাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস মনেতে উল্লাস
সদা বোলে হরিবোল॥
প. ক. ২২৮২।

এই পদগুলির মধ্যে, পদকল্পতরুর একমাত্র ২১৯৩ সংখ্যক পদে "মাধবী", ও অপরগুলিতে "মাধবীদাস" এই ভণিতা আছে। পদগুলির মিলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ৭৮৯, এবং ২২৪২ সংখ্যক পদত্রয়ের ভণিতার সকারান্ত পঞ্চাক্ষরযুক্ত নাম (যথা মাধবীদাস) ভিন্ন স্ত্রীবাচিকাপদবীযুক্ত

কোনও নাম (যথা মাধবীদাসী) থাকিতে পারে না, এবং পদকল্পতরুতেও নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধেও উদ্ধৃত পদত্রয়ে "মাধবী দাস" আছে। কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ পদকল্পতরুর ১৮০৪ ও ২১৯২-সংখ্যক পদের ভণিতায় "মাধবী দাস" ভণিতা আছে, এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত পদে সেই-স্থলে "মাধবী দাসী" ভণিতা আছে। এই পাঠান্তর কোন্ গ্রন্থে আছে, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

এ স্থলে আমার মনে এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হইতেছে,—

১ম,—দীনেশ বাবু পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদচতুষ্টয়কে যে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়াছেন, তাহা সমূলক কি না?

২য়,—উক্ত পদগুলির "মাধবী দাস" এবং "মাধবী" এক ব্যক্তি, অর্থাৎ শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী কি না?

৩য়,—উদ্ধৃত ছয়টি পদের রচয়িতা কে? এবং তিনি পুরুষ কি নারী?

পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদত্রয়ে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে দীনেশ বাবু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহার কোন অনুকূল প্রমাণের প্রয়োগ করেন নাই। মাধবী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিতা ছিলেন, কিন্তু তিনি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদির পরিচয়স্বরূপ তাঁহাদের পদাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, রায়ানন্দ স্বরচিত পদ দ্বারা চৈতন্যদেবের আনন্দবিধান করিতেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; গুণরাজ, সনাতন, গোপালভট্ট, স্বরূপ, দামোদরাদির গ্রন্থপ্রণয়নের কথা তাঁহাদের পরিচয়স্বরূপ বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হন নাই, অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের, তাঁহারই বর্ণিত "সাড়ে তিন জন" পাত্রের অন্তর্গত "এক জন" পাত্র শিখিমাহিতির ভগিনী, এবং স্বয়ং "অর্দ্ধ জন" পাত্র মাধবী দেবীর পদাবলীর উল্লেখ করিবেন না, ইহা কিয়ৎপরিমাণে বিস্ময়জনক। মাধবী দেবীর রচিত গান থাকিলে, সেই পদ কোন না কোনরূপে চৈতন্যদেবের শ্রবণপ্রীতি সম্পাদন করিত, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা ব্যাসাবতার বৃন্দাবন

দাস তাহার উল্লেখ করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্যে গোবিন্দ দাসাদির পদাবলীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মাধবী দেবীর পদাবলীরচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত আমার বিশ্বাস,—মাধবী দেবী কোনও পদাবলীর রচনা করেন নাই।

মাধবী দেবী যে শিক্ষিতা ছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মাধবীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার স্বল্পাক্ষরগ্রথিত রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, মাধবীকে এই সম্মানিত পদে (লিখনাধিকারীর পদে) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" (১)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় কোন্ গ্রন্থে মাধবী দেবীর রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, ও বুদ্ধিগৌরবের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থে মাধবী দেবীর এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। অপর দিকে চৈতন্যচরিতামৃতকারের—

"শিখিমাহিতি নাম এই লিখনাধিকারী।" (২)

এই বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে, শিখিমাহিতিই প্রতাপরুদ্রের সময় লিখনাধিকারী ছিলেন। শিখিমাহিতির ভগিনী লিখনাধিকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রবীণ লেখক নিশ্চিত তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে,

"শিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহ পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখাকার যাঁরে রাধিকার গণ।"

এইরূপ বর্ণনা আছে। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ্বরগুপ্ত, ভূধর চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত ও বটতলার প্রকাশিত সকল সংস্করণের চরিতামৃতেই উক্ত পংক্তিত্রয়ের শেষ চরণের "যাঁরে" স্থলে পাঠান্তর নাই, কিন্তু তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে ঐ "যাঁর" স্থলে "যেই" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃতে এই জন্যই (মাধবী দেবী লিখনাধিকারীর পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া) মাধবী 'প্রভুলেখাকার' বলিয়া লিখিত আছে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় সম্ভবতঃ মাধবীর লিখনাধিকারী পদপ্রাপ্তির প্রমাণ জন্য উক্ত পংক্তিত্রয় স্বপ্রণীত প্রবন্ধে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত রূপ উক্তি করিয়া-

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ১৬০ পৃঃ। (২) দশম পরিচ্ছেদ।

ছেন। কিন্তু এ স্থলে পাঠকগণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, উক্ত পংক্তি-ত্রয়ের শেষ চরণে "যাবে" স্থলে "যেই" দিলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোনও অর্থ হয় কি না, এবং "প্রভুলেখাকার" বর্ণনা হইতে মাধবীর লিখনাধিকারীর পদপ্রাপ্তি সূচিত হয় কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের অন্য স্থল হইতে

"মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধিকার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥"

এই চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন বিবেচ্য এই যে, "লেখাকার" ও "গণি" সমার্থপ্রতিপাদক কি না? আমার বিশ্বাস, 'প্রভুলেখাকার' বচনের দ্বারা মাধবী দেবীর লিখনাধিকারীর পদপ্রাপ্তি বা তাঁহার লেখাপড়া জানা প্রতিপন্ন হয় না।

'উড়িয়া' ও 'বাঙ্গালা' এই দুই ভাষার প্রকৃতিগত বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বৈলক্ষণ্য আরও অধিক ছিল। তখন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বাঙ্গালী ও উৎকলবাসীর সম্মিলন বেশী হইত না, এবং সম্বন্ধও ঘনিষ্টতর ছিল না; সুতরাং উৎকলীয় পুরুষ বা নারীর বাঙ্গালা শিক্ষা বা বাঙ্গালা রচনার আবশ্যকতা ছিল না। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যদেবের সময় এক জন উৎকলবমণী, পদকল্পতরুর উক্ত দুইটি পদের ন্যায় উড়িয়াভাষার গন্ধবিহীন অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণ ভিন্ন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ তত্ত্বনিধি মহাশয় মাধবী দেবীকে উৎকলবমণী বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাঁহাকে বাঙ্গালা-পদ-রচয়িত্রী বলিয়া বিনা সন্দেহে সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন।

পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে উপরিউদ্ধৃত দুইটি পদ বা 'মাধবী' বা 'মাধবী দাস' ভণিতাযুক্ত কোন পদ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, আচার্য্যবংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের যে পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থ দেখিয়া পদকল্পতরু সংগৃহীত হয়, (১) তাহাতেও মাধবী বা মাধবী দাসের ভণিতাযুক্ত কোনও পদ পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত, 'জগতের মধ্যে সাড়ে তিন জন পাত্রের' অন্তর্গত শিখিমাহিতির ভগিনীও, স্বয়ং 'অর্দ্ধ জন' পাত্র মাধবী দেবীর কোন পদ থাকিলে, তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজে সেই

(১) আচার্য্য প্রভুর বংশে শ্রীরাধামোহন। জমিল আমার লোভ তাহা করি গান।
সেই মূল গ্রন্থ অনুসার ইহা কৈল।
গ্রন্থ কৈল পদামৃতসমুদ্র আখ্যান। —পদকল্পতরু

পদ অবশ্যই প্রচলিত থাকিত, এবং রাধামোহন ঠাকুর তাহার অন্ততঃ একটিও স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, মাধবীদাস-ভণিতাযুক্ত পদাবলী পদামৃত-সমুদ্র ও পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার মধ্যসময়ে রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদকল্পতরু এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃতসমুদ্র সংগৃহীত হয়; সুতরাং মাধবী বা মাধবীদাসের ভণিতাযুক্ত পদাবলীর বয়স ২৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই। মাধবীদেবী চৈতন্যের সময়, অর্থাৎ উক্ত পদাবলীর রচনায় অন্ততঃ ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান ছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত দূর আলোচিত হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশেষ প্রমাণ-ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯১ এবং ২১৯২ সংখ্যক পদ মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

পদকল্পতরুর ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদের বর্ণিতব্য বিষয় এক, এবং ভাষা বা রচনারও বিশেষ পার্থক্য নাই। দুইটি পদে একই ব্যাপারের বিভিন্নাংশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই দুইটি পদ একই কবির রচনা বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং মাধবী ও মাধবীদাস এক ব্যক্তি হইতেছেন। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও 'মাধবী' ও 'মাধবীদাস' ভণিত পদগুলিকে একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাধবীদাস ব্যবহারিক ভাবে পুরুষবাচক নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাসোপাধি 'মাধবী'-গণের নামান্তে ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবদীনভাব যুগেও, স্ত্রীলোকে আপনার নামের সহিত পুরুষের দাসোপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মাধবী দেবীকে বিনা-প্রমাণে মাধবীদাস বলিয়া "সনাক্ত" করা সঙ্গত নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরি-উদ্ধৃত পদাবলীর রচয়িতা, মাধবীদাস বা মাধবী, শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবীদেবী বা কোনও স্ত্রী-কবি নহেন।

সত্যনির্ণয় আমার উদ্দেশ্য, দীনেশ বাবু বা তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভ্রমপ্রতিপাদন নহে। যদি এ স্থলে আমারই ভ্রম হইয়া থাকে, তাঁহারা বা অপর কেহ সেই ভ্রমের অপনোদন করিলে, সত্য সুপ্রকটিত হইবে।

শ্রীরামেশচন্দ্র শেঠ।

কবিতাকুঞ্জ।

বসন্ত।

আসো নিশি-অবসানে উষা-হাসি সম
হিম ঋতু-অয়নানে ;
মধু যৌবন-নব জাগায়ে তুলিতে
ধরার বিবশ প্রাণে।
তুমি অমল তরি আম পাণে করি
আধফোটা ফুল-কলি ;
তাই পবনের পথে শুভ্রতরে তব
অযুত নম্র অলি।
তব কুসুমজালে খেলা করে সদা
লুব্ধ মলয় বায় ;
তব চরণ-আলোকে পলকে পুলকে
প্রভাগতি পায় পায়।
শ্যাম জলদ-মুক্ত নীল গগন,
জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল রাতি ;
তব অঙ্গে মদন-ভাতি
মধুর মাধুরীভাতি।
তুমি ধরার মলিন অধরযুগলে
ফুটাও মধুর হাসি ;
তুমি বিমল তরুণী-তরুণী-হৃদয়ে
ঢেল নিজ রূপরাশি।
তুমি বিহগকণ্ঠে তুল জাগাইয়া
সুপ্ত মধুর রব ;
ওই ঐন্দ্রজালিক পরশে তোমার
পুলকিত চরাচর।
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটাও হরষে
আকুল প্রণয়ালা ;
তুমি চরাচর সব কর আলোকিত
ঢালি নিজ রূপ-আলা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সাধ।

সে উঠেছে ফুটি' স্বর্ণকমল
আমার মানস-সরসে ;
সাধ যায় তাই, হয়ে মধুব্রত
সৌরভে তার ভাসি' অবিরত
তার চারিধারে উড়িয়া নিত্য
গুঞ্জন করি হরষে।

সে আমার বনে কুসুম গুচ্ছ
ফুল্ল যূথিকা যামিনী ;
তাই চাহি, হয়ে বালরবিকর
ফুটাই তাহার শোভা মনোহর,
শিশিরবিন্দু হয়ে করি তারে
সিক্ত সারাটি যামিনী।

সে শোভিছে একা পূর্ণ ইন্দু
নির্ম্মল নীল আকাশে ;
সাধ যায়, হয়ে সিন্ধু অতল
বক্ষে রাখিতে সে ছবি অমল,
চকোরের মত উড়িতে ঊর্দ্ধে
তাহার অমিয় সকাশে।

সে যে বসন্তশোভার প্রতিমা—
মাধুরী-আকুল ভুবনে ;
সাধ-ভাই, হয়ে কোকিলস্বরব,
গাহিতে তাহার গুণগৌরব,
অশোকের মত চরণ-পরশে
শোভিতে কুসুম-ভূষণে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নিশীথে।

আমি অনাথিনী, চির একাকিনী,
তোমায় ডাকি,
করুণা পাথার! এক বিন্দু তার
দিবে হে না কি?
কবে প্রকাশিবে হৃদয়-আকাশে,
শ্রীমুখ-ইন্দু?
করুণা-কিরণে, কবে উছলিবে
পরাণ-সিন্ধু?
ধূলিকণা সরে, পড়েছি হৃদয়ে—
যে ছবি, আমি;

কনক বরণে কবে সাজাইবে
তাহারে তুমি?
গভীর আঁধারে সংসার-পাথারে
পড়ে একেলা,
ওহে কর্ণধার! পাব না তোমার
চরণ-তেলা?

শ্রীসরলাবালা সরকার।

কাল আঁখি।

কালি আঁখি তব সখি, সরসীর জল
অতল, অশরিমেয়, প্রশান্ত, নির্ম্মল,
শোভা তার;—তটশোভা, আম-কুঞ্জবন
উপরে আকাশ নীল চিত্রিত যেমন
সরসীর স্বচ্ছ বারি-মাঝে, ওগো প্রিয়ে,
তেমনি সুন্দর শোভা রয়েছে ফুটিয়ে
তোমার নয়ন মাঝে, স্নেহ, ভালবাসা,
মৌন লজ্জা, প্রীতি, দয়া, হৃদয়ের ভাষা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাকচী।

সংসারের পথে।

এসেছি দু' জনে হেথা
সুদূর হ'তে,
হারায়ে ফেলেছি তাহে
এ কূট পথে;
আমি নাক কোথা যাব
এ দূর বনে,
এসেছি যে কোথা হ'তে—
নাই তা' মনে।
খুঁজিতেছি কত তারে,
পাই না দেখা;
বঁধু আর কত কাল
এখানে একা।

শ্রীকুঞ্জবিহারী রসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ ও মাঘ। "ষ্টুডেণ্ট মেস" প্রবন্ধটি "সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট কৌতূহলজনক" হইয়াছে বটে। লেখক ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল অংশটুকু উজ্জ্বলতর প্রভাবাগস্থিরে উত্তোলিত করিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, কলিকাতার ছাত্রজীবনে কি কেবলই রৌদ্র? তাহাদের জীবন কি মেঘসম্পর্কশূন্য? বর্ত্তমান লেখক এক অংশের ছবি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু আর এক অংশের চিত্রাঙ্কন এখনও অবশিষ্ট। "দুর্দ্দিনে" গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। গল্পটির অত্যুগ্র সৌন্দর্য্য ও ভীষণ ভয়ঙ্করতার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর মত করুণরসের স্নিগ্ধ পুতধারা বহিয়া যাইতেছে। সুদক্ষ কবি, কঠোর দার্শনিকের মত কঠিনভাবে নায়িকার চিত্তবৃত্তির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আবার অশ্রুকোমল কবির ন্যায় সমবেদনাপূর্ণহৃদয়ে সেই ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় হইতে প্রেমের সুকোমল কমলদলে আবৃত করিয়া দিয়াছেন। "বাঙ্গালার বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। "ছবি-জন্ম" একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা,—কবিতা নহে, ছড়া। "গৃহকোণ" প্রবন্ধটি সকলেরই পঠনীয়। লেখক বঙ্গনারীর অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্যহীন চিত্র আঁকিয়া পরিশেষে আক্ষেপ করিয়াছেন,—"সেই জন্য এই বাহুল্যবিবর্জ্জিত সকল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অন্যান্য কৌচক্যাবিনেট্‌কণ্টকিত আধুনিক কোনও সভ্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বসিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষে গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই এক জন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী

মামবী, না, বিলাতী সাহেবের অদৃষ্টচারবিনির্মিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ, অনভ্যস্ত চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহাদের গুরু গাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্যনিকীরণ, তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা সকলই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে। এবং খানিকক্ষণ সেই চুরোটিকাধূমকুণ্ডলিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে অভিনয়ও বড় সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন্ কোন্ ভঙ্গীটি বেদস্তুর হইয়া পড়ে। কারণ, ও ভঙ্গীকলাপের মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে অবলীলা-ভাবে পরিচালিত করে—আছে কেবল কতক পরিমাণে নেপথ্যের ভাবওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিলপ্রকৃতি কয়েকটি দেশী পুত্তলিকার হস্তপদ ও রসনা সঞ্চালন। লেখকের ভাষা কাদম্বরী-বিজয়িনী,—কিন্তু তাঁহার আক্ষেপের আদ্যোপান্ত সত্য।

পূর্ণিমা। শ্রাবণ। "নব্য-ভারতে"র সম্পাদক বিগত অগ্রহায়ণ মাসে মাসিক-সাহিত্য-সমালোচকগণের প্রতি যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে "পূর্ণিমা"র সম্পাদক বলিতেছেন,—"আমরা নব্যভারত লেখকের কথায় বলি 'বাবুর সাহস, কৃতিত্ব এবং গবেষণায় পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।' দেখিতেছি আমরাও আসামী শ্রেণীভুক্ত। চেষ্টা করিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখিয়াও কবুল জবাব দিতে পারিলাম না। তুই একটি উদাহরণ দেখিয়াও তাহা হইতে সাধারণ নিয়মের সূত্র করা কঠিন। লেখক যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার সেই চিত্র পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না এবং বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। সকল সমালোচকই বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী ও হিংসা প্রণোদিত হইয়া বিষদিগ্ধ ছুরিকা হস্তে পরস্পরকে জবাই করিবার জন্য বসিয়াছেন, কল্পনায় সাহিত্য-কসাইখানার এ চিত্র মন্দ নহে, কিন্তু সত্যের বাজারের দরে ইহার ডিস্‌কৌণ্ট। তবে নব্যভারতের ষোড়শ খণ্ডের অষ্টম সংখ্যায় এ আবিষ্টুষা সহসা কেন হইল—সেটা ভাবিবার কথা। 'সমালোচনা' যতদিন ব্যবহারে থাকিবে ততদিন সমালোচক দোষ গুণ দেখাইতে ন্যায়ানুসারে বাধ্য। আমরা অনেক দিন সাহিত্যের বাজারে ঘুরিতেছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সমালোচনায় বঙ্গদর্শনের কশাঘাত আর নাই—উঠিয়া গিয়াছে। সমালোচনায় সত্য সত্য বঙ্গদেশে কাহারও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। লেখক সে সংবাদ দেন নাই কিন্তু বিলাতে এক দিন তাহা হইয়াছিল। * * * সমালোচনা একেবারে উঠাইয়া দিলে আর কোন আপদ থাকে না। স্বর্ণের অগ্নিপরীক্ষায় কোন ভয় হইতে পারে না। বেন্না রাঙ্গ পিতল শীসা তাহা ভাবিবে। * * *" ইহার টীকা অনাবশ্যক।

মুকুল। শ্রাবণ। মুকুলের ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রিন্স রাঞ্জিত সিংহের হরিণানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। 'শিয়ার বাহাদুরের পাগলামি" গল্পটি মনোরম। পড়িতে পড়িতে কিপ্‌লিংএর জঙ্গল-কাহিনী মনে পড়ে। গল্প-কল্পনা লেখকের নিজের উদ্ভাবিত, না সংগৃহীত? যদি গল্পটি মৌলিক হয়, তাহা হইলে লেখকের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। "বিড়ালের জাত" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিত্রিত;—আমোদের সঙ্গে শিক্ষা-বিধান করিবে। "গুণ করিবার সহজ উপায়" সম্পূর্ণ অভিনব। বালকবালিকার অভিভাবক-গণও এই কৌতুকজনক তথ্যে আকৃষ্ট হইবেন।

ভানুমতী।

বিজয়া।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমেষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্ত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর, শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তিছায়া পাইয়াছেন; কি যেন এক সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চির-অভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার এক জন প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখদুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিত। সকলের মুখে সেই একই কথা,—"মা! তুই কোন দেবকন্যা?" সেও জাতি-নির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত, এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করিত। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইত।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য করিতেন।

তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন, পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই; কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া সেরেস্তার হাগুনপত্র গোছাইয়া লইতেছেন; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কি বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোন বৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে, উপলখণ্ডে কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে; সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাহিতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা!
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন;
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে; ক্ষুদ্র জ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যামনামে মুখরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য

দেখিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি? তিনি উঠিয়া উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই। তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি বাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, রুদ্ধাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজার তীরে উহা আরও কত সুন্দর। অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি প্রতি-কৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও একপ একটি শান্তসলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম পরমমণির' দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথনাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা! ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই পুণ্যতিথিতে আমার পূর্ব্বপুরুষের এইন্দ্রাবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত

শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রুনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, যে কর্ম্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবারপ্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতেই বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।" কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি 'তুম্পট' কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালি গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিনী মা একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছে একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা আপনার বজরার ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোনি লক্ষণ ছিল না। সে সময়ে ৺পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাঁহার দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন।

আমার বৈরাগিনী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াছে, এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিনীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৺পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা। কোনও মহৎ কার্য্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার রুচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমিও মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজ-কিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিনী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রী হরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস
শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া অনাথনাথ "ভানুমতী আমার অমিয়া! মা অমিয়া! মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। পুরীতে মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, দাস, দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি

দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলেরই মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কলরবে, বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে বহিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় ভানুমতী কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদীতীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতায়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনসদৃশ গিরিপাদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুৎবেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা ও বৈরাগিনী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিনী মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে

চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়—কাঁদিতাম, পিতার সমুদয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান; বলিয়াছি,—'মা! তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেবকন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বন্যার আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিলি; আমরা মহাপাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান। বৈরাগিনী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে এক দল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোনও গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার জাতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা হইলাম। বেদিনী মাতা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। সর্ব্বশেষ তাহাদের পিতৃ পুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক কোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহার

আদরে আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শন লাভ করি। দর্শন-মাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা।' হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণ-তলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি; কত লোক কতরূপ স্নেহ মমতা দেখাইয়াছে; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্রআশ্রয় মাতা দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুলটিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্যে কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সংবাদ শুনিলাম, তোমার স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম! সর্ব্বশেষে আজি আমি পৃথ্বের ভিখারিণী রাজ-নন্দিনী,—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।

কিন্তু বাবা! বৈরাগিনী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার এই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে ওই তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বল-পূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? যে জীবনলতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানা-ন্তরিত করিয়া সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা! এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশী রাজপুরী, তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-দুর্ল্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। বৈরাগী পিতা তাঁহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই

কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি উহার ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে নয়াজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য দৃশ্য স্থান পায় না।

"হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেবদেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি! বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন। আমি উহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজা লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বালগোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি; উহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব পূর্ণী গোস্বামী আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহারই কাছে আদিনাথে গিয়া-

ছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার'। উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি দিয়া পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়েত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তি-বিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্ন শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, বালকবালিকাগণের জন্য সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অন্নপূর্ণানাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং তোমার দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি, সন্ন্যাসী ও আতুর নিবন্নের সেবা হইবে।

আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশমতে সেই পবিত্র স্থানে মহামহীরুহ-অশ্বত্থের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল' নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক ভারতের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে, যেন নানা বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পুরীর তোমার দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা হইবে। সমুদ্র-প্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়-

ভাণ্ডার হইতে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্রতিকৃতি থাকিবে।

বাবা! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমাদের পিতা-পুত্রীর,—মাতাপুত্রের,—আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রমে চলিলাম। তুমিও আসিও, বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। ভগবান্ সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী, 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাঁহার দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা
'ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠসমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি; তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি মেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়া-শ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল' মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

অঙ্গে আপনার উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানু-মতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরি-ধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথ-নাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক।

চতুর্থ প্রস্তাব।

অশোক-রাজত্বের চতুর্থাংশ, ষড়বিংশতি বৎসর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। এই শেষভাগের ইতিহাস প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্তম্ভলিপি (Pillar Edicts) হইতে সংগৃহীত :—

১। দিল্লী সিভালিক বা ফিরোজ সাহার লাট;

২। দিল্লী মিরাট;

৩। এলাহাবাদ;

৪। বাধিঅ বা গৌড়িঅ অয়রাজ, জেলা চম্পারণ;

৫। মধিঅ বা গৌড়িঅ নবগড়, জেলা চম্পারণ;

৬। রামপুরওআ, জেলা চম্পারণ।

সব স্তম্ভলিপিগুলিই প্রায় এক রকম। রামপুরওআর কতকটা প্রোথিত থাকার দরুণ চারিটি লিপিমাত্র পাওয়া গিয়াছে; দিল্লী সিভালিকে সাতটি, এবং বাকি কয়টিতে ছয়টি লিপি আছে। এই সব লিপির শেষ পাঠ ডাক্তার বুলার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১) তাঁহার পাঠ সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে; সুতরাং তাহাই এ রচনায় গৃহীত হইবে। সপ্তম লিপি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ সপ্তবিংশতি বৎসরে) আজ্ঞাপিত। সপ্তম লিপিটি এক বৎসর পরে, অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি বৎসরে লিখিত।

স্তম্ভলিপির সময়ে অশোক সম্পূর্ণ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা দেখাইয়াছি। তবে স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশতঃ জনসাধারণের উদ্দেশে খোদিত অনুশাসনগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির সারাংশমাত্র নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ মতগুলির (dogmas) উল্লেখ করেন নাই। অতএব স্তম্ভস্থ অনুশাসনসমূহ গিরিলিপিমালার ক্রমিক পরিণতিমাত্র, সারাংশে অতি সামান্য প্রভেদ।

স্তম্ভীয় অনুশাসনগুলির মর্ম্ম দুই চারিটি উদাহরণ হইতে পাঠক কতকটা উপলব্ধি করিবেন। ধর্ম্মপালন করা উচিত; কিন্তু ধর্ম্ম কি? ভাই, দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে অশোক বলেন,—

(১) Ep. Ind. vol. II, pp. 245-274.

"ধর্ম্ম কি? অপাসিনব (পাপরাহিত্য), বহুসৎকার্য্য, দয়া, দান, সত্যতা, শুচি।"

পাপ কথাটা কিছু অস্পষ্ট; সুতরাং তৃতীয় লিপিতে অশোক ব্যাখ্যা করিলেন,—

"আসিনব কি? চণ্ডত্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, ঈর্ষ্যা।"

এই ত অশোকের নৈতিক ব্যাখ্যা; তদনুযায়ী উপদেশ। কর্ত্তব্য কার্য্যের তালিকা গিরিলিপির তালিকা হইতে পৃথক নহে। তবে এখন অশোক কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সাধ্যমতে নিজ কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিচারকার্য্যে অনবরত হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে ব্যাঘাত হইবে; সুতরাং চতুর্থলিপিতে অশোক আজ্ঞা করেন যে, উচ্চপদস্থ "রাজুক"গণকে দণ্ড-করণ ও শাস্তিদানবিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত; সুতরাং পঞ্চম লিপিতে অশোক অনুজ্ঞা করেন যে, সেই সকল কয়েদীকে হুকুমের পর তিন দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে যে, তৎকালে তাহারা ও তাহাদিগের জ্ঞাতি বন্ধুরা দান বা ধর্ম্মচিন্তা দ্বারা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। সামান্য সামান্য দোষে দণ্ডিত বন্দিগণকে দয়া করিয়া খালাস দেওয়া রাজধর্ম্মের উচিত; তাই অশোক প্রতি বৎসর একবার করিয়া কতক কয়েদীকে খালাস দিতেন, এবং পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে লিখাইয়াছেন,—"ষড়বিংশতি অভিষেক পর্য্যন্ত পঞ্চ-বিংশতি বার আমা কর্ত্তৃক বন্দিগণ মুক্ত হইয়াছে।"

অশোকের দয়া কেবল মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না; পশুদের জন্যও তাঁহার হৃদয় করুণাপূর্ণ থাকিত। ইহার নমুনা প্রথম গিরিলিপির "জীবহিংসা অকর্ত্তব্য" এই উপদেশে ও দ্বিতীয় গিরিলিপির পশুচিকিৎসালয়স্থাপনে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে তাহা বিস্তারিত করিয়া, কোন কোন জীব কোন কোন সময়ে অবধ্য, ইহার তালিকা দিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল-নিবারণার্থ সেই তালিকাটির অবিকল নকল নিম্নে দিলাম। পাঠক দেখিবেন, অশোকের দয়া ও সহানুভূতি কত দূর বিশ্বব্যাপিনী।

"দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ আমা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে—শুক, সারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গেলাট, জাতুকা, অম্বাকপীলিকা,

দধী, অনঠিকা, মৎস্য, বেদবেয়ক, গৃধ্রপুপুত্রক, সংকুস্য মৎস্য, কফটশল্যক, পয়সস, সুমর, যণ্ডক, ওরগিণ্ড, গলগুত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল যাহা প্রতিভোগে আসে না বা খাদিত হয় না। অজকা (গাবী ছাগলী) এড়কা (মাদী ভেড়ী) ও শূকরী গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী অবস্থা; এবং তাহাদের ছয় মাসের ন্যূনবয়স্ক শোভকেরাও তদ্রূপ। বধি-কুক্কুট কাটা হইবে না; জীব সহিত তুষ দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থে বা হিংসার্থে বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না; জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চাতুর্মাস্যায়, গৌষপূর্ণিমাতে, (মাসের) তিন দিবসে চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে, এবং প্রত্যেক উপবাসদিনে মৎস্য অবধ্য ও বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিবসে নাগবনে এবং কেউট-ভোগে যে সমুদায় অন্য জীব থাকিবে, তাহারাও হন্তব্য নয়। অষ্টমীপক্ষে, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তদিনে, তিন চাতুর্মাস্যায়, ও (অন্য) সুদিবসে ষাঁড় খাসি করা হইবে না; এবং অজ, মেষ, শূকর বা অন্যান্য জীব, যাহাদিগকে লিঙ্গরহিত করা হয়, তাহা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসু দিনে, চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায়, চাতুর্মাস্য পক্ষে, অশ্ব বা গো যাচিত হইবে না।" (২)

ফিরোজশাটের সপ্তম স্তম্ভলিপি সুপ্রসিদ্ধ। ইহার প্রথমাংশ সোজা লেখা; দ্বিতীয়াংশ বাঁকা করিয়া দুই পার্শ্বে লেখা; এই জন্য পূর্ব্বে ইহা দুইটি স্বতন্ত্র লিপিরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। এই লিপিতে প্রিয়দর্শিন্ কি কি ধর্ম্মকার্য্য কি কি উদ্দেশে করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অতএব সব ধর্ম্মলিপির মধ্যে এইটি সুদীর্ঘ। ইহা স্থানে স্থানে অস্পষ্টভাবে পঠিত; এবং ইহাতে মোটামুটি কোন কৃতিত্ব বা লিপিকুশলতা নাই। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপ্রচার ও তদনুযায়ী ধর্ম্মকার্য্যাবলীতে যদি কোন যশ থাকে, তবে সে এই লিপি-আজ্ঞাপক প্রিয়দর্শিনের। যাঁহারা লেখকের জড়িত, পুনরুক্তিপূর্ণ বাক্যে বিরক্ত না হন, তাঁহাদের জন্য সমস্ত সপ্তমলিপিটি পরিশিষ্টে নকল করিয়া দিলাম।

অশোক কবে রাজা হন, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহা দেখা যায় যে, লিপিলেখার বৎসর সর্ব্বত্র অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, রাজা হওয়ার বৎসর অভিষেকের বৎসর হইতে পৃথক। কত পৃথক, তাহা জানিবার কোন নিশ্চয়নীয় উপায় নাই; অন্ততঃ এখনও পাওয়া

(২) Buhler, Epi Ind. vol. II. pp. 257-8.

যায় নাই। সিংহলদেশীয় বিবরণ গ্রহণ করিলে অশোক পঞ্চম বৎসরে রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েন। ইহাতে কোন অসম্ভবতা দেখিতেছি না। অভিষেক কখন হয়? গিরিলিপি হইতে দেখা যায় যে, অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) বিদেশীয় রাজগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবার অনুজ্ঞা হয়। সেই সময় কিরিনি-রাজ মগ ও ইপায়রস-রাজ আলিকসুদরো জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যু অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৮ বৎসরে হয়। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫৯ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে অশোকের ত্রয়োদশ বৎসর (অভিষেকের) পড়িয়াছিল, ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। সেই হিসাবে তাঁহার অভিষেকের প্রথম বৎসর ২৭১ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে পড়িতেছে। যদি পালি ইতিহাস ঠিক হয়, তবে অশোক ২৭৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে রাজা হইয়াছিলেন।

অশোকের প্রকৃত মৃত্যুকাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। সপ্তম স্তম্ভলিপি হইতে দেখা যায় যে, তিনি অভিষেকের অষ্টাবিংশতি বৎসরে জীবিত ছিলেন। সপ্তম স্তম্ভলিপির সময় ২৭১—২৭=২৪৪ খৃঃ পূঃ। তাহার পর তারিখবিশিষ্ট কোনও লিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৌরাণিকমতে তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ২৩৯ (২৭৫-৩৬) খৃঃ পূঃ বৎসরে পড়িতেছে। সাইত্রিশ বৎসর রাজত্ব অসঙ্গত বোধ হয় না।

অশোকের বংশাবলীর বিবরণ অতি অস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী এই যে, ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রায় সকলকে তিনি বিনাশ করেন; ইহা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। পঞ্চম গিরিলিপিতে ভ্রাতৃবর্গকে সাধারণতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ধউলী ও জটগড়ের প্রথম নম্বর বিশেষ লিপিতে "কুমারগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অবরোধে বহু মহিষী ছিল, সন্দেহ নাই। পঞ্চম গিরিলিপি ও সপ্তম স্তম্ভলিপিতে তাঁহারা "দেবীগণ" ইতি শব্দে উল্লিখিত। কিম্বদন্তীমতে অসন্ধিমিত্রা তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পরে নববিবাহিতা তিষ্যরক্ষিতা প্রধানা মহিষী হয়েন। সন্তান অনেকগুলি ছিল। সপ্তম স্তম্ভলিপিতে অশোক নিজে সেপাইয়াছেন,—"দারকানাম্ চি চ মে" (এবং আমার পুত্রগণেরও)। কোনও পুত্রের নাম লিপিমালায় পাওয়া যায় না। হিন্দু পুরাণ মতে সুবলা নামক পুত্র তাঁহার পরে সম্রাট হয়েন। হাওনথসাঙ শুনেন যে, অশোকের ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক পুত্র গান্ধারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দীপবংশ ও মহাবংশমতে অশোকের পুত্র মহিন্দ ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রেরিত

হন। কিন্তু হিউএনথসাঙ্গ বলেন, মহেন্দ্র অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (৩) অবদানমতে কুণাল নামে অশোকের একটি পুত্র ছিল। তাঁহার গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অশোকরাজের এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার লোচনযুগল অতি সুন্দর, কুণাল পক্ষীর ন্যায়; এই হেতু লোকে তাঁহাকে কুণাল বলিয়া ডাকিত। যৌবনাগমে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত মৃদু থাকায় তিনি রাজাবাটীর গোলমালে মিশিতে চাহিতেন না; দূরে থাকিয়া সংসার অনিত্য বুঝিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন। ঘটনাক্রমে অশোকমহিষী অব্যরাষ্ট্রিতা তাঁহাকে দেখিতে পায় ও দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়ে। তখন মহিষী তাঁহাকে অবৈধ প্রণয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্থিরচিত্ত টলাইতে পারে না; ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় রাণীর প্রেম ক্রোধে পরিণত হয়। তাহার ষড়যন্ত্রে কুণাল রাজধানী হইতে অতিদূরে তক্ষশিলায় শাসনকর্ত্তৃস্বরূপে প্রেরিত হন। কিয়ৎকাল পরে রাণী কৌশলক্রমে সম্রাটের হস্তিদন্তনির্ম্মিত মোহর যোগাড় করে ও সেই মোহরাঙ্কিত এক হুকুমনামা সম্রাটের নামে তক্ষশিলাস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট পাঠায়। তাহাতে আজ্ঞা ছিল যে, কুণালের দুই চক্ষু উপড়াইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে কুণাল সুশাসনের দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং রাজাজ্ঞা পাইয়াও কেহই এমন নির্দ্দয় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল না। কুণাল কিন্তু রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তাহাদের অনেক বোঝান ও অবশেষে যথেষ্ট পুরস্কারের ঘোষণা দেন। পুরস্কারলোভে অবশেষে এক জন কদাকার কুষ্ঠরোগী স্বীকৃত হয়। রোরুদ্যমান প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সেই চণ্ডাল প্রথমে এক চক্ষু উপড়ায়; উৎপাটিত চক্ষু হস্তে করিয়া কুণাল বলিলেন,—

"হতভাগ্য মাংসপিণ্ড, কেন এই সকল মূর্ত্তি, যাহা কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দেখিতেছিলে, আর দেখিতে পাইতেছ না? যাহারা তোমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে 'আমি', তাহারা নিজেকে কতই না প্রবঞ্চিত করে, তাহারা কতই না নির্ব্বোধ!"

দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটিত হইলে তিনি বলেন যে,—"এই মাংসচক্ষু যাহা এত কষ্টে পাওয়া যায়, আজ আমা হইতে উৎপাটিত হইল; কিন্তু দোষ-

(৩) Beal's Si-Yu-Ki, vol. II. pp. 91-3, 246-7.

শূন্য সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞান-চক্ষু পাইলাম। রাজা আমাকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু আমি মহৎ ধর্ম্মরাজের পুত্র হইলাম। সকলে আমাকে তাঁহার সন্তান বলে। যদিও আমি উচ্চ পদ হইতে চ্যুত হইলাম, যাহাতে এত কষ্ট ও শোক লিপ্ত আছে, তবু আমি ধর্ম্মরাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, যাহাতে কষ্ট ও শোক বিলুপ্ত হয়।"

কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি জ্ঞাত হন যে, সম্রাট নিজে কোন আজ্ঞা দেন নাই, মহিষী ঋষ্যরক্ষিতার প্রবঞ্চনায় সেই জাল আজ্ঞাপত্র আসিয়াছিল। তখন কুণাল উত্তর দেন:—"তিনি বহু দিন সুখ, আয়ু ও ক্ষমতা ভোগ করুন, যাঁহা হইতে আমার এই উপকার হইল।"

তৎপরে অন্ধ রাজপুত্র সস্ত্রীক পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা করেন ও ভিক্ষা দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। কালক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ও বীণাবাদন করিতে করিতে পিতার প্রাসাদের নিকট আইসেন। সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া অশোক তাঁহাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে ডাকান, কিন্তু প্রথমতঃ চিনিতে পারেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অবশেষে সর্ব্ব ঘটনা শুনিতে পান। ক্রোধে রাণী ঋষ্যরক্ষিতাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। আজ্ঞাশ্রবণে রাজপুত্র বারণ করেন ও বলেন, "রাজন্, তাঁহাকে বধ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। নিজ পদ ও মন অনুযায়ী কার্য্য করুন; নারীহত্যা করিবেন না। দয়ার অপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার নাই; তথাগত ধৈর্য্য আজ্ঞা করিয়াছেন।" পুনশ্চ অশোকের পদতলে নিপতিত হইয়া বলেন, "পিতঃ, আমি কোন যাতনা ভোগ করিতেছি না, ও রাণীর নির্দ্দয় ব্যবহারে কোন ক্রোধাগ্নি অনুভব করিতেছি না। আমিই আমার দুঃখের জন্য দায়ী; বোধ হয়, কোন প্রাক্তন পাপকর্ম্মের জন্য এ জন্মে এই শাস্তি ভোগ করিতেছি। আমার বাক্য সত্য; যদি বিশ্বাস না করেন, তবে, হে চক্ষু, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হও।" ইহা বলিতে বলিতে চক্ষুতে পুনরায় দর্শন-শক্তি ও পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্য আসিয়া পড়িল। (১৭)

---

(১৭) Burnouf's Introd, p. 403 etseq. L. C. Oldenberg's Buddha (Eng. trans.) pp, 296 8 and B. st Hilaire's Buddha (Eng. trans.) pp. 110-2. "Buddhist poetry has nowhere glorified in more beautiful fashion, forgiveness and the love of enemies than in the narrative of Kunala" (Oldenberg, p. 298.)

পঞ্চম প্রস্তাব।

পাঠকের সুবিধার্থ অশোকের জীবনচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তদীয় জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিবার নিমিত্ত এই কয়টি দলীল ব্যবহৃত হইয়াছে :—

গুহালিপি	তিনটি	ফাহিয়েনের ফো-কো-কি (৩৯৯-৪১৪ খৃষ্টাব্দ)
গিরিলিপি	চৌদ্দটি	হিউএছসাঙ্গের সি-ইউ-কি (৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)
স্তম্ভলিপি	ছয়টি	

দীপবংশ	(সিংহলদেশীয় পালি ইতিহাস)	বায়ুপুরাণ
মহাবংশ	ঐ	মৎস্যপুরাণ
অট্ঠকথা	ঐ	বিষ্ণুপুরাণ
		ভাগবতপুরাণ

দিব্যাবদান
শোকাবদান

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

খৃঃ পূর্ব্ব বৎসর	বিবরণ
২৭৫ ...	সিংহলবৃত্তান্তমতে সিংহাসনে আরোহণ।
২৭১ ...	অভিষেক।
২৬৩ ...	কলিঙ্গ-বিজয়।
২৬২ ...	অশোকের অনুশোচনা। বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক হওয়া।
২৬১ ...	ধর্ম্মযাত্রার আজ্ঞাপ্রদান।
২৫৯ ...	"সংঘকে উপগত" হওয়া। অধিকাংশ ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ। স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারক প্রেরণ। বরাবর দুই গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৫৮ ...	ধর্ম্মমহামাত্য নিয়োগ।
২৫৭ ...	কোণাকমনের পূর্ব্বস্তূপবৃদ্ধি।
২৫৩ ...	সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের লিপিমালা প্রকাশিত। মহাসংঘকে বৌদ্ধপাত্র সম্বন্ধে অনুজ্ঞা। পালি বিবরণ মতে তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির সংবেশ।
২৫২ ...	খলাতিকের তৃতীয় গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৪১ ...	ধর্ম্মযাত্রায় শাক্যমুনির জন্মস্থান লুম্বিনি গ্রামে পূজা।
২৪৫ ...	প্রথমলিপি ব্যতীত অন্যান্য স্তম্ভলিপি আজ্ঞাপিত।
২৪৪ ...	সপ্তম স্তম্ভলিপির প্রচার।
২৩৯ ...	পৌরাণিক মতে অশোকের মৃত্যু।

মৃত্যুকালে অশোকের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সুবিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার গিরিলিপি সিদ্ধাপুরে উৎকীর্ণ হওয়ায় দেখা যায় যে, মহীশূরের উত্তরাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। পড়েরিঅ ও নিগ্লীবস্থ স্তম্ভলিপি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, নেপালের দক্ষিণাংশ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; অনুমান, ব্রহ্মপুত্র নদী পর্য্যন্ত। পশ্চিমে গান্ধার ও কাম্বোজ তাঁহার অধীনস্থ ছিল; সুতরাং বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অধিকাংশ তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী ছিল, এমন সম্ভব। অতএব মোটামুটি চতুঃসীমা এই :—

উত্তরে হিমালয় ও হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালা; পশ্চিমে হেলমন্দ নদী, বেলুচিস্থান ও আরব্য মহাসাগর; দক্ষিণে মহীশূর, ১৪° অক্ষাংশ; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদী।

ইহার অতি দীর্ঘতা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় পঞ্চদশ শত মাইল; অতিপ্রস্থতা উত্তর-দক্ষিণে অনুমান চতুর্দ্দশ শত মাইল। এই বিশাল সাম্রাজ্য আয়তনে সার্দ্ধ বার লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না; এবং ইহাতে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা বিংশতি কোটীর ঊর্দ্ধ। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এত বড় প্রকাণ্ড জনপদ ভারতে কখনও একচ্ছত্রীকৃত হয় নাই। ইহা অশোক প্রিয়দর্শিনের যুদ্ধকৌশল ও সুশাসনের জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেক্সপীয়রের সহিত আমরাও বলিতে পারি,—

"His life was gentle, and the elements
So mixed in him that Nature might stand up
And say to all the world 'This was a man'."

আর দুই চারিটি কথায় এই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, কিম্বদন্তীময় অশোকচরিত শেষ করিব। কি বীর্য্যবত্তা, কি কার্য্যকুশলতা, কি ধর্ম্মবিবর্দ্ধিনী সমদর্শিতা, সর্ব্ব বিষয়ে অশোক বনাম প্রিয়দর্শিন্ ভারতীয় রাজগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার একমাত্র সমতুল মোগল সম্রাট জেলালুদ্দিন্ আকবর। উভয়েই তেজস্বী পিতামহের পৌত্র; এক জন চন্দ্রগুপ্তের,—আর এক জন বাবরের। উভয়েই স্বীয় ভুজবলে পিতৃ-রাজ্য অধিকার করেন; উভয়েই নিজ যুদ্ধনিপুণতায় সুবৃহৎ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংগঠিত করেন; উভয়েই মনুষ্য চিনিতে বিচক্ষণ ছিলেন; সুদক্ষ কর্ম্মচারী রাখিয়া ও রাজ্যশাসন-প্রণালী সময়োচিত পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজ নিজ বিশাল সাম্রাজ্য সুশাসিত করেন; উভয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও

সমুজ্জ্বল বুদ্ধি বলে স্বরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বহিঃস্থ রাজ্যমালা ও তত্রত্য ধর্ম্মাবলির সংবাদ রাখিতেন; অশোক গ্রীক রাজগণের সম্বন্ধ রাখিতেন; আকবর পোর্টগিজ ও ইটালিয়ানগণের সংস্পর্শ রাখিতেন। উভয়েরই নিকট বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ যথেষ্ট মান্য পাইতেন; তাহার চিহ্ন অশোকের লিপিমালায় ও ত্রিপিটকসমূহে, এবং আকবরের সভাস্থ আবুল-ফজল, বদাওনি ও ফৈজির পুস্তকাবলীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্নতভাবে সমদর্শী ছিলেন। অশোক বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতে বলিতেন; আকবর মুসলমান হইয়াও হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি ইত্যাদি ধর্ম্মকে মান্য করিতেন, এবং সাদরে তাহাদের যুক্তি শুনিতেন।

অবশ্য, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও দেখা যায়। অশোক অপেক্ষা আকবরকে পিতৃরাজ্য অধিকার ও বিস্তৃতির জন্য অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিয়া অশোক অপেক্ষা অধিক বর্ষ রাজত্ব করিয়াও অশোক-সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার করিতে পারেন নাই। তথাপি রাজকার্য্যজ্ঞান, হিতকারিতা, যুদ্ধকুশলতা, ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে, আমার ধারণা, তিনি অশোকের অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। সেই কারণে, পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য, পাঠান ও মোগল কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু মুসলমানের ঘোরতর শত্রুতা সত্ত্বেও, এত বড় বৃহৎ সাম্রাজ্য রাখিয়া যান; এবং সেই সাম্রাজ্য পুত্রপৌত্রাদিগণের অক্ষমতা ও গৃহবিবাদ সত্ত্বে ও এক শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী ছিল, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, অশোকের বংশধরেরা পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিককাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, এবং অনুমান হয়, অল্প দিনে তাঁহার সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায়। পরন্তু ইহাও আমার বিশ্বাস যে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আকবর অপেক্ষা অশোক উচ্চস্থানীয়। অনবরত যুদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের কঠোরতাবশতঃ আকবর অশোকের সপ্তদশ শত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াও তাঁহার ন্যায় নৈতিক উদারতা, ধর্ম্মবিষয়িণী সমদর্শিতা ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবলসহৃদয়তাপূর্ণ চেষ্টা দেখাইতে পারেন নাই। নিজের অনবরত চেষ্টা, স্বরাজ্যে প্রতিরেদক ধর্ম্মমহামাত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীর নিয়োগ, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক-প্রেরণ, অন্য ধর্ম্মে সহানুভূতি ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে এত বিস্তৃত করিয়া ফেলেন

যে, অন্য কোন রাজা কোন ধর্ম্মবিশেষের জন্য এত করেন নাই। সেই কারণে, অশোকের নাম, স্বদেশে বা বিদেশে, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্ন আছে, সেখানে এখনও ভক্তির সহিত উল্লিখিত হয়।

স্থূল কথায়, উভয়েই শ্রেষ্ঠ নরপতিশ্রেণীতে গণনীয়। এক জন সাম্রাজ্য-সংগঠক বোদ্ধা নরপতি; অপর জন ধর্ম্মপ্রচারক ধার্ম্মিক ভূপতি। আকবর, পার্শী কায়রস্ (Cyrus) মাকিডনাধিপতি এলেক্‌জাণ্ডার, রোমক কাইজর (Caesar), জর্ম্মান্ সার্লেমেন্ (Charlemagne) ফরাসিস্ চতুর্থ হেনরি, রষিয়ান্ পিটার, প্রুসিয়ান্ ফ্রেডরিক্ প্রভৃতির সমকক্ষ; অশোক য়িহুদি সলোমন্, রোমক মার্কস্ অরিলিয়স্ ও কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন, ফরাসীস্ লুই দি পায়স্ (Louis the Pious), প্রভৃতির সমকক্ষ। উভয়েই জগৎপূজ্য, মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ।

অশোকচরিত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক মসিয়র সেনার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া রচনা শেষ করিলাম। (১৮)

"It cannot, I think, be denied, without injustice, that he (Piyadasi) exhibits, in his edicts, a spirit of moderation, a moral elevation, a care for the public good, which merits every praise. He possessed from his birth a taste for enterprise and energetic qualities, borne witness to by the conquest of Kalinga.. .....That intellect (of his) was not perhaps very vast or very decided, but it was certainly animated with excellent intentions and full of the idea of moral duty and of the sentiments of humanity. By the various efforts with which he was inspired in his religious zeal, by his relations with nations not subject to his empire, nay—with peoples the most distant from the Peninsula, and finely by the monuments epigraphic or otherwise of which he was the creator, Piyadasi certainly rendered services to the general civilisation of India, and the credit of these merits we are in justice bound to render to him."

পরিশিষ্ট।

সপ্তম স্তম্ভলিপির অনুবাদ; ডাক্তার বুলারের পাঠ।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই বলিয়াছেন,—

(১৮) Ind. Ant, vol. xx. (1891), pp. 266-7.

অতিক্রান্ত অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া জনগণ-মধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় নাই।

এই (বিষয়ে) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

এই (চিন্তা) আমার হইল "অতিক্রান্ত ও অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন—কেমনে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারা যায়—কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় নাই।" কি প্রকারে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে; কি প্রকারে ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য (অন্ততঃ) কতকটা অভ্যুন্নতি হইতে পারিবে। এই (সম্বন্ধে) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই (ভাব) আমাতে আসিল,—ধর্ম্মশ্রবণ সকল ব্যাপ্ত করিব; ধর্ম্মানুশাসন সকল জ্ঞাত করাইব; জনেরা ইহা শ্রবণ করিয়া অনুপ্রতিব্রত হইবে ও অভ্যুন্নত হইবে। ধর্ম্মবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি হইবে। এতদর্থে আমি ধর্ম্মশ্রবণসমূহ ব্যাপ্ত করিয়াছি; বিবিধ ধর্ম্মানুশাসনগুলি আজ্ঞাপিত করিয়াছি; যে আমার পুরুষেরা বহুজন মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে প্রতিবর্দ্ধিত ও পরিবোধিত করিবে। রাজুকেরাও আমা কর্ত্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, বহুপ্রাণী শত-সহস্রে যাইয়া ধর্ম্মযুক্ত জনগণকে এই প্রকার এই প্রকার প্রতিবোধ কর।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই সকল অনুবেক্ষণ করিয়া আমি ধর্ম্মস্তম্ভাবলী করিয়াছি, ধর্ম্মমহামাত্য-গণ (নিযুক্ত) করিয়াছি, ধর্ম্মশ্রবণসমূহ (ব্যাপ্ত) করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মার্গসমূহে ন্যগ্রোধাবলি রোপিত করিয়াছি যে, তাহারা পশু মনুষ্য সকলকে ছায়ার উপভোগ দিবে; আম্রবাটিকাসমূহ রোপিত করিয়াছি; প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশে বাপী খনন করিয়াছি; ধর্ম্মশালা সকল করাইয়াছি; বহু বহু আপণাবলী করাইয়াছি—মনুষ্য ও পশুগণের প্রতিভোগ জন্য। এই প্রতিভোগে নাম (কিন্তু "লঘু")। পূর্ব্ব রাজগণও আমার ন্যায় বিবিধ সুখবস্তু জগৎ সুখায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মানুপ্রতিপত্তি অনুপ্রব্রিভ হউক—এতদর্থে আমি এই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মমহামাত্যেরা প্রব্রজিত ও গৃহস্থগণের মধ্যে বিবিধ অনুগ্রহিক বিষয়ে তৎপর আছে। পাষণ্ডগণের মধ্যেও তৎপর আছে। আমি (বন্দোবস্ত) করিয়াছি—তাহারা (বৌদ্ধ) সংঘ মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে (হিন্দু) আজীবিকগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা (জৈন) নিগ্রগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা নানা পাষণ্ডদলের মধ্যে তৎপর থাকিবে—যে সেই সেই মহামাত্যগণ যথাযথ প্রতিবিষ্ট থাকিবে। সেই ধর্ম্মমহামাত্যগণ আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) যে এই সকল দলে তৎপর থাকিবে, এবং অন্য পাষণ্ড দলেও তৎপর থাকিবে।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

ইহারা এবং অন্য বহুমুখ্য (কর্ম্মচারীরা) আমার ও দেবীগণের (মহিষীগণের) দানবিষয়েও তৎপর আছে। সকল (কর্ম্মচারীরা) আমার অবরোধীগণের (অন্দর মহলের) মধ্যে বিবিধ প্রকারে সন্তোষের উপায় (দেখাইতেছে), এখানে (পাটলীপুত্রে) এবং সর্ব্ব দিকেতে। আমি (এখন ইহা) করিয়াছি যে, (তাহারা) আমার পুত্রগণের ও অন্যান্য দেবীকুমারগণের দানবিষয়ে তৎপর থাকিবে—ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি নিমিত্ত। ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি এই যে দয়া, দান, সত্যতা, শুচিতা, মৃদুতা, সাধুত্ব, এই সব লোকে বৃদ্ধি পাইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ রাজা ইহা বলিয়াছেন,—

(নিম্নলিখিত) যে কিছু সাধুকার্য্য আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) হইয়াছে, লোকে তাহাকে অনুপ্রতিপন্ন করিয়া অনুবিধান করিয়াছে, তাহাতে বাড়িয়াছে ও বাড়িবে—মাতা পিতার প্রতি শুশ্রূষা, গুরুর প্রতি শুশ্রূষা, ব্রাহ্মণ শ্রমণ দরিদ্র ও দুঃখী, এমন কি, দাস ভৃত্যের প্রতি সম্প্রতিপত্তি।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মনুষ্যগণের মধ্যে এই ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে দ্বিবিধ প্রকারে, ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা ও নিধ্যাসন দ্বারা। তাহার মধ্যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা অল্প, নিধ্যাসন দ্বারা বহু। ধর্ম্মনিয়মে আমা দ্বারা ইহা কৃত হইয়াছে—এই এই জাতি অবধ্য; অন্যান্য বহু নিয়মও আমি করিয়াছি। নিধ্যাসন (একাগ্রচিত্ততা) কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে ভূয়সী ধর্ম্মবৃদ্ধি করিয়াছে—ভূতগণের অবিহিংসায় ও প্রাণিগণের অনালম্ভায়। এতদর্থে ইহা কৃত হইয়াছে যে, পুত্রপৌত্রাদিকাল

পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য (স্থিতি) পর্য্যন্ত ইহা থাকুক, ও তদনুযায়ী (সকলে) অনুপ্রতিগমন করুক। এবংবিধ অনুপ্রতিগমন করিলে ইহতঃ ও পরতঃ আনন্দ হইবে। সপ্তবিংশতিবর্ষাভিষিক্ত আমা দ্বারা এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইল।

দেবপ্রিয় এই বলিয়াছেন,—

যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে, সেখানে এই ধর্ম্মলিপি লেখাইবে, যে তদ্দ্বারা ইহা চিরস্থায়ী হইবে।

সম্পূর্ণ।

ভারত-যুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি।

গত দুই মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় যুধিষ্ঠিরের কালনিরূপণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত কালনিরূপণের পক্ষে জ্যোতিষিক উপজীব্য-গুলি আলোচনা করিয়া ১৩০১ সালের পৌষ মাসের 'নব্যভারতে' আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই। তদবধি সময়ে সময়ে ঐ বিষয়টি মনে হইয়াছে। নিখিল বাবুর দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আরার দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হইল। এই প্রবন্ধে তাঁহার কোন কোন অনুমানের প্রতিবাদ আবশ্যক হইবে, এবং কোন কোন প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে।

ভূমিকায় একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রাচীন কালের ইতিহাস-প্রকটন-সময়ে পদে পদে প্রমাণ আশ্রয় করিতে হয়। ইতিহাসে আপনার আমার অল্পনা কল্পনার মূল্য কিছুই নাই। আমাদের জ্যোতিষ-বিষয়ে নিখিল বাবু এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহার প্রত্যেক উক্তিরই প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা হয়। তর্ক করিবার উদ্দেশে এ কথা বলি না; নিরর্থক তর্ক করিবার সময়ও নাই, রুচিও নাই। এইরূপ দুই একটা উক্তির উল্লেখ করিতেছি।

(১) সপ্তর্ষিকে কৃত্তিকা মনে করা নিতান্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির কার্য্য। সংহিতায়, সিদ্ধান্তে সপ্তর্ষির বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৺বাপুদেব শাস্ত্রী কৃত্তিকাকে সপ্তর্ষি মনে করিতেন? কথাটা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

(২) কোন কোন প্রাচীন সংহিতাকার সপ্তর্ষির একটা গতির উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তর্ষি না কি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। কোন সিদ্ধান্তে এই গতি অঙ্গীকৃত হইতে দেখি নাই। সংহিতা ও ব্যবহার-গ্রন্থে এবং পুরাণেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, কোন নিরপেক্ষ গণিতবিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিচার করেন নাই। কথাটা ঠিক নহে। নিরপেক্ষ জ্যোতিষী অর্থে য়ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করিলে, বেণ্টলী, ব্যাপ্তীত কোলব্রুক এবং সম্প্রতি ব্রেনাণ্ড সাহেব যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। আমাদের জ্যোতিষী মনে করিলেও দুই এক জন করিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তী করেন নাই; বোধ করি, কেহই এই গতি বিশ্বাস করিতেন না। সংহিতা ও পুরাণে যাহাই হউক, প্রত্যক্ষাসিদ্ধ বিষয় সিদ্ধান্তকারগণ বিশ্বাস করিতেন না। সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌমে মুনীশ্বর, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেকে কমলাকর, এবং সম্প্রতি সিদ্ধান্তদর্পণে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির উক্ত গতি বিচার করিয়া, কেহ বা কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কেহ বা অর্থান্তর ঘটাইয়া সংহিতাকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন। বিদেশীয় জ্যোতিষী অপেক্ষা স্বদেশীয় জ্যোতিষীর ব্যাখ্যার আমরা অধিক সমাদর করি। এ জন্য সিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিবেকে ইহার যে বিচার আছে, তাহার সারার্থ দেওয়া যাইতেছে।

কমলাকর লিখিয়াছেন, শাকল্যমুনি সপ্তর্ষি তারকার বিক্ষেপ ও ধ্রুবক চল বলিয়াছেন। এই সকল তারা এক রবিবর্ষে ৮ লিপ্তা করিয়া গমন করে। যুগাদিতে ক্রতু তারা শ্রবণায় ব্যবস্থিত ছিল। * * * কিন্তু

ইত্থং ভগোলে বসতির্মুনীনাং নৈব সঙ্গতা। অস্মদাদ্যুপপত্ত্যাতঃ সার্ব্বভৌমেঽত্রযোদিতা॥

* * * * * *

মুনির্বর্ষশতেনৈকং প্রাগ্গত্যা ভং ভুনক্তি বৈ। অবৃত্তত্বাদ্যুগোদ্বেন কল্পনেয়ং বুধৈঃ স্মৃতা॥

শেষে বলিতেছেন, এই সকল মুনি লোকপ্রসিদ্ধ মুনি নহেন, অন্য মুনিও নহেন। তবে, কাহাদের গতি লিখিত আছে? না অঙ্গীকৃত দেবাংশের!

স্থূল কথা, কমলাকর সপ্তর্ষির পূর্ব্বগতি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অথচ সংহিতার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্যও নহে। তাই এক কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়া বিষয়টি ঢাকিতে চাহিয়াছেন।

ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ইদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির গতি আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাই সিদ্ধান্তদর্পণে লিখিতেছেন,—

প্রত্যব্দং প্রাগ্গতিঃ প্রোক্তা পুরাণৈরষ্টলিপ্তিকা। তথায়ন
তেষাং নো নিশ্চিতা পূর্ব্বানুভবাদর্শনান্নয়া॥ তৎসর্ব্বং ক

অর্থাৎ, পুরাণে সপ্তর্ষির ৮ কলা করিয়া গ
পূর্ব্বে অনুভব-অদর্শন হেতু আমি নিশ্চয় করি
গতি থাকে, তাহা আমার সময়ে সপ্তর্ষির
করিবেন।

এই গতি সম্বন্ধে আমরা যেমন বুঝিয়াছি,
পরেও কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের
চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ গতি
৮ কলা, এবং পূর্ব্বাভিমুখে। ঐ গতি এমন
বিদেশীয় আলিবেরুনী উহাকে উপলক্ষ করিয়া
হাস্য করিতে ছাড়েন নাই। নিখিল বাবু লিখি
দিলে, গর্গ, পরাশর, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির
জ্যোতিষিগণ এই সপ্তর্ষির গতির বিষয় নিজ
সংহিতাকার বৃদ্ধগর্গ এই গতির উল্লেখ করিয়া
এই কথা রটাইবার মূল। বরাহ তাঁহার সংহি
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। পরাশর সংহিত
উল্লেখ করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন।
কাল দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন, আ
বা আধুনিক সিদ্ধান্তী সপ্তর্ষির গতির বিষয়
বলিয়া জানি না। এমন গুরুতর বিষয়ে প্র
আবশ্যক। স্মরণ করিবেন, সিদ্ধান্ত ও সংহি
প্রভেদ।

(৩) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "রা
জ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারে
এমন নহে। সচল (?) রাশিচক্রের ২৭ ভাগে
একটি নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষ
সেই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে
স্বীকার করেন, এরূপ বলা যায় না।" বোধ ক
দুইটি অর্থ আছে দেখিয়া, তারা শব্দেরও দু

যথা তারা চিরকালই স্থির নক্ষত্র, এবং যথা নক্ষত্রও বহুকাল পর্য্যন্ত বা চিরকালই স্থির নক্ষত্র। সপ্তর্ষির গতি বলিয়া প্রাচীনেরা বর্ষ সংখ্যা করিতেন। এতদ্‌বিষয় পরে বক্তব্য।

(৪) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "(৫৪০পৃঃ) সুতরাং সে সময়ে [পূর্ব্বকালে] যে দিন সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন হইত, সেই দিনকেই তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা] উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি বলিতেন।" প্রমাণ? "পূর্ব্বকালে দৃগ্‌গণিত প্রচলিত ছিল, এবং অয়নচলনও যে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঠিক।" 'পূর্ব্বকালে' বলিতে অবশ্য মহাভারতাদি গ্রন্থের রচনাসময়ে। সে সময়ে অয়নচলন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাই না। এমন কি, বরাহের সময়েও ৪২৭ শকে অয়নচলন এ দেশে অজ্ঞাত ছিল। তাই তিনি অয়নচলন প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। "নিরয়ণের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা ?] উত্তরায়ণকে ৬৭ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপ পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়নচলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না।" দুইটি উক্তিরই প্রমাণ আবশ্যক। শেষের উক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অয়নচলন দেখিয়া ঠিক সময় অবগত হইতে পারা যায় না বটে, কিন্তু নির্ণেয় সময়ের পূর্ব্বাপর সীমা পাওয়া যাইতে পারে। তাহাও অন্য কারণে। সায়ন গণনা চলিত ছিল না বলিয়াই পাওয়া যায়, নিরয়ণ গণনা চলিত থাকিলে পাওয়া দুর্ঘট হইত।

নিখিল বাবু আরও অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাদের সম্বন্ধে প্রমাণ দিলে সুখী হইতাম। যথা, আর্য্যভট্ট ও পরাশরের মতেও কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয় (৬১৮ পৃঃ) কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরের শক (?) (৬২০ পৃঃ); রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয় (৬২১ পৃঃ) ইত্যাদি। অন্য দুই একটি সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। প্রথমে দেখা যায়, মহাভারত-বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি আদৌ ছিলেন কি না, তাহাতেই মতভেদ আছে। যদি না ছিলেন, মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের যে ইতিহাস মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে বহু বিঘ্ন আছে। এই প্রবন্ধে মহা-

ভারতকে ভারত যুদ্ধের ইতিহাস বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইবে, এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ত্যাগ করিয়া কেবল তথাকথিত জ্যোতিষিক প্রমাণ বিচার করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, মহাভারতরচনার কালনিরূপণ এক কথা, এবং ভারতযুদ্ধের কালনিরূপণ আর এক কথা। এটুকু স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ কেহ মহাভারতরচনার কাল এবং ভারতযুদ্ধকাল এক মনে করিয়া থাকেন।

কোন্ অতীত কালে বেদব্যাস মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। পরে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তবে, মহাভারতের যে আকার আমরা দেখিতেছি, তাহার উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাভারতে লিখিত জৈন ম্লেচ্ছাদির নাম দেখিলেই এ কথা প্রমাণিত হইবে।

মহাভারতগ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও, ঐতিহাসিক যুধিষ্ঠিরাদি আধুনিক নহেন। এই উক্তির পক্ষে অনেকগুলি প্রমাণ আছে। তাহাদের আলোচনায় দেখা যাইবে, ভারতযুদ্ধের দুই প্রকার কাল পাওয়া যায় (১) খৃঃ পূঃ ১২।১৩শ শতাব্দী, এবং (২) ২২।২৩শ শতাব্দী। এই দুই সময়ের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। শেষোক্ত সময়ই কতকটা ঠিক বলিয়া বোধ হয়। (১) মহাভারতে লিখিত প্রমাণ। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম বলিতেছেন,

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥

এই শ্লোকের 'সৌম্য' পদটি বর্দ্ধমান মহারাজার মহাভারতে আছে, এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে তৎপরিবর্ত্তে 'পুণ্যঃ' পাঠ আছে। যে পাঠই হউক, শ্লোকটির অর্থ সম্বন্ধে কোন গোল নাই। যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা নীলকণ্ঠের টীকায় তিরোহিত হইয়াছে। রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু না হইয়া যাহাতে উত্তরায়ণে হয়, এই নিমিত্ত ভীষ্ম কিছু দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে দেখিলেন, চান্দ্র (বা পবিত্র) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে, এবং সেই মাসের প্রথম ভাগও গত হইয়াছে। অর্থাৎ দেখিলেন, মাঘ শুক্লাষ্টমী আগত, এবং রবির উত্তরায়ণও আরম্ভ হইয়াছে।

* 'নব্যভারতে' ঐ দুই সময়ের মধ্য লইয়া যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ১৬শ শতাব্দী বলিয়াছিলাম।

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম দেহ ত্যাগ করেন। এই নিমিত্ত উক্ত অষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। যথা বাজসার্ত্তণ্ডে,

শুক্লাষ্টম্যাং তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে॥

রঘুনন্দনধৃত ভবিষ্যোত্তরে,

শুক্লাষ্টম্যাস্তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

বঙ্কিমবাবু চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস কল্পনা করিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। পরন্তু পূর্ব্বকালে দৈনিক কালগণনায় চান্দ্রমাসই প্রচলিত ছিল। আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে চান্দ্রকাল হইতে সৌরকাল গণনার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি তিথি দ্বারা দিন গণিত হইয়া থাকে। মহাভারতরচনার সময়ে চান্দ্রমাসগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এখানে এ বিষয়ের একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দেখা যায়, কৌরবেরা অর্জ্জুনকে দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, হয় ত প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তখন ভীষ্ম এইরূপে ত্রয়োদশবর্ষ গণনা করিলেন,

পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তঃ॥
এষামপ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ॥

অর্থাৎ, প্রতি পাঁচ বর্ষে দুই মাস অধিক হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বর্ষে পাঁচ মাস বার রাত্রি (বা দিন) অধিক হইয়াছে।

উক্ত গণনাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে। পাঁচ বৎসরে (সৌর) ১২×৫=৬০ সৌরমাস, এবং ২ অধিমাস হয়। ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিন অধিক হয়। তবেই, ১৩ সৌর বৎসর গণনা করিতে ১৫৬×৫=১৬১ চান্দ্রমাস ও ১২ দিন (তিথি) গণিতে হইয়াছিল।

অবান্তর হইলেও, এই গণনার সহিত আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। দেখা যায়, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ও পৈতামহ সিদ্ধান্তে বর্ষগণনার ঠিক ঐ প্রকার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। পৌষ অমাবস্যার দিন রবি দক্ষিণায়ন ত্যাগ করিয়া উত্তরাগতি আরম্ভ করিতেন। এই নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে মাঘ শুক্লপক্ষ চিরদিন প্রশস্ত ছিল। শুক্লপক্ষের মধ্যে উত্তরার্দ্ধ প্রশস্ত, তখনই চন্দ্রের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপরঞ্চ, কৃষ্ণাষ্টমীর পর শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং অন্যত্র পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দেখা যায়,

মাঘশুক্লপ্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ। যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

অতএব উক্ত বেদাঙ্গের সময়ে পৌষ অমাবস্যান্ত (মাঘী শুক্ল প্রতিপৎ) হইতে বর্ষ গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণারম্ভসময়ই বর্ষের আদি ছিল।

যাহা হউক, পৌষ অমাবস্যার ১৪ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমার দিন চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে থাকেন, এবং তথা হইতে চতুর্দশ নক্ষত্রে—শতভিষায়—রবি থাকেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন রবি শতভিষায়, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় ধনিষ্ঠায় থাকেন। ধনিষ্ঠার রবির উত্তরায়ণ হওয়াতে তরণীর শেষ পাদে বিষুবস্ এবং অশ্লেষার অর্দ্ধে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত।

এই সমস্তই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুযায়ী। বস্তুতঃ, মহাভারতে ভীষ্মের দেহ-ত্যাগের যে কাল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে বেদাঙ্গজ্যোতিষ পঞ্জিকার মত। অতএব বোধ হইতেছে, মহাভারত-রচনার সময়ে উক্ত প্রাচীন পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল, এবং তদনুসারে কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। উক্ত জ্যোতিষ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বহুকাল পরেও তাহার গণনাক্রম চলিত ছিল। এ নিমিত্ত উহার সময় হইতে মহাভারত-রচনার সময় অবগত হইতে পারা যায় না। তবে বলিতে পারা যায়, অত বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত ছিল না। অয়ন-চলন অবলম্বন করিয়া এই কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। অয়নের বেগ নিশ্চিতরূপে জানা নাই। কাজেই এই সময় খৃঃ পূঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পারে।

(২) পুরাণ ও ইতিহাসের প্রমাণ। সে যাহা হউক, এই সময়ের সহিত পুরাণোক্ত যুধিষ্ঠির-কালের ঐক্য আছে।

বিষ্ণুপুরাণমতে পরিক্ষিতের সময় হইতে নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর; নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল; তার পর মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে রাজা হন। অতএব ১০১৫ + ১০০ + ৩১৫ = ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ের সহিত পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ-নির্দ্ধারিত কালেরও সমতা আছে। অন্য প্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা খৃঃ পূঃ ১২শ হইতে ১৪শ শতাব্দী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হইতে নিখিল বাবু পৌরের 'সাহিত্যে' এই সকল প্রমাণ বলিয়াছেন। এখানে পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

(৩) সংহিতার প্রমাণ। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে সপ্তর্ষিচার লিখিয়াছেন। যথা,

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্ দ্বিপঞ্চদ্বিযুতঃ শকালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥ *
একৈকস্মিন্ যুক্তে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুদয়তোঽপ্যবিরাদ্যুদয়ন্তি তদা সংযুক্তাঃ॥

অর্থাৎ, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বীশাসনকালে মঘানক্ষত্রে ছিলেন। শকারম্ভের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যকাল। সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ বিচরণ করেন। পূর্ব্বদিকে সমুদয় নক্ষত্রের নিরন্তর উদয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নক্ষত্রের উদয় হইলে সপ্তর্ষিপংক্তির স্পষ্ট প্রকাশ হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, পরিক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে দুইটি (পুলহ ও ক্রতু) প্রথমে উদিত হন, তাঁহাদের সমদক্ষিণোত্তর রেখায় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের যেটি দৃশ্য হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়। * ইহারা এক এক নক্ষত্রে শত মানুষ বর্ষ থাকেন।

বৃদ্ধ গর্গ লিখিয়াছেন, (উৎপল)

কলিদ্বাপরসন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্। মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ॥

অর্থাৎ, কলি ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমুনি থাকিতেন।

কশ্যপ লিখিয়াছেন, (উৎপল)।

শতং শতং তু চরন্ত্যেতে নক্ষত্রে নিবসন্ত্যেতে সসাঙ্কীকা মহাতপাঃ॥

অর্থাৎ, সারুন্ধতীক মহর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শত বৎসর নিবসতি করেন।

এইরূপ আরও অনেক বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল বচনে দেখা যায়, (১) দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি ছিলেন, (২) মঘানক্ষত্রে থাকিবার সময় যুধিষ্ঠির ও পরিক্ষিৎ ছিলেন, (৩) শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ছিলেন, (৪) সপ্তর্ষির একটি পূর্ব্ব গতি আছে, বৎসরে ৮ কলা। কিম্বদন্তী আছে, এবং কিম্বদন্তীর মূলে লিখিত প্রমাণ আছে যে, দ্বাপরের শেষে এবং কলির প্রারম্ভে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। শকের ৩১৭৯ বৎসর, এবং খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কলির আরম্ভ। সুতরাং সেই সময়ে ভারত যুদ্ধ হয়। বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে বরাহ বলেন, শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে। গর্গসংহিতার অভাবে বলা যায় না, এই গণনা গর্গ নিজে করিয়াছিলেন, কি

* পুরাণান্তরের বাস ২৭। ৫২ অশ্বিন্যাদির দক্ষিণে না হইলে তিনি ক্রতুর উদয়ান্ত দেখিতে পাইতেন না। মধুরায় অশ্বিন্যাদি ২৭। ৫০; সম্ভবতঃ তাঁহার বাস মগধদেশে ছিল।

বরাহ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে, গর্গ শকারম্ভের অনেক পূর্ব্বে ছিলেন। সুতরাং বোধ হয়, তিনি ২৫২৬ বৎসর বলেন নাই। উৎপলোদ্ধৃত গর্গ-বচন হইতেও জানা যায়, গর্গ মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতি মাত্র বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতে বরাহ স্বয়ং বৎসরগণনা করিয়া যুধিষ্ঠির নৃপতির কাল শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৎসর-সংখ্যার নির্দ্দেশ দেখিলেই বোধ হয় যে, উহার মধ্যে জ্যোতিষগণনা ছিল। এতদ্‌বিষয় পরে বক্তব্য।

কাশ্মীর দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে ভারত-যুদ্ধকাল বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতযুদ্ধ ঠিক দ্বাপরান্তে হয় নাই, কলির ৬৫৩ বৎসর পরে হইয়াছিল। কলির যে সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন, সেই সময়ে কাশ্মীরে গোনন্দ রাজা ছিলেন। এই গোনন্দ (তৃতীয়) আরম্ভ করিয়া ২৩৩০ বৎসর গিয়াছে, এবং ১২৬৬ বৎসরে ৫২ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শকের ১০৭০ অব্দে কহ্লণ এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন। তবেই ঐ অব্দের পূর্ব্বে ২৩৩০ × ১২৬৬ = ৩৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের গোনন্দ ভারত-যুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। শক ১০৭০ অব্দ = কলির ৪২৪৯ বৎসর। ৪২৪৯ হইতে ৩৫৯৬ হীন করিলে ৬৫৩ বৎসর থাকে। কাজেই কহ্লণের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির ছিলেন।

এই প্রকার বর্ষ সংখ্যা করিতে দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যেন, কহ্লণ কাশ্মীরের কোন প্রাচীন ইতিহাস দেখিয়া গত রাজগণের আধিপত্যকাল গণনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন শকের একাদশ শতাব্দীতে, অথচ তাঁহার পূর্ব্বের তিন চারি সহস্র বৎসরের রাজগণের আধিপত্যকাল নিঃসন্দেহে বলিতেছেন! এমন কি, বলিতেছেন, কলির ঠিক ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন।

এই সকল স্মরণ করিলেই মনে হয়, তাঁহার প্রমাণ গত রাজগণের আনুপূর্ব্বিক আধিপত্যকাল সংখ্যা নহে। তাঁহার কি প্রমাণ ছিল, তাহাও তিনি পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

> ষট্‌সপ্তদ্বয়ব্দসংযুক্তং সপ্তর্ষীণাঞ্চ চিত্রশিখণ্ডিষু।
> ৩চ্চারে সংহিতাকারৈরেবং দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ। ৫৫
> আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
> ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য। ৫৬

তাঁহার প্রমাণ তবে সংহিতা। শেষের শ্লোকটি অবিকল বারাহী সংহিতার। বলা বাহুল্য, তাঁহার পূর্ব্বে সংহিতার উৎপত্তি হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে, সংহিতার উক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। অবশ্য যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কল্যব্দ এক নহে, কিংবা যুধিষ্ঠিরাব্দ অপ্রচলিত হইলেই শকাব্দ প্রচলিত হয় নাই। আর্য্যভট্টের সময়ে শকাব্দ তত প্রচলিত হয় নাই, তাই তিনি নিজ সময় কল্যব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকের দশম শতাব্দীতে—কহ্লণের পূর্ব্বে আলবেরুণী কাশ্মীরের একখানা পঞ্জিকায় তৎকালের যুধিষ্ঠিরাব্দ লিখিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাশ্মীরে এই অব্দ গণিত হয় কি না, বলিতে পারি না। মনে হইতেছে যেন, দাক্ষিণাত্যের কোন পঞ্জিকায় এই অব্দানুসারে গত বর্ষ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি। *

বোধ করি, এই প্রসিদ্ধিবশতঃ রত্নমালায় শ্রীপতি নক্ষত্রবিশেষে সপ্তর্ষির স্থিতি অনুসারে দেবতাবিশেষের প্রতিষ্ঠার বিধি দিয়াছেন। রত্নমালায় দেখা যায়, শকারম্ভে সপ্তর্ষি পুষ্যানক্ষত্রে ছিলেন। কেন না, ৩৫২৬ বৎসরে সপ্তর্ষি মঘা হইতে পুনর্ব্বসু শেষ করিয়া পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, মঘা নক্ষত্র এই গণনার আদি; এবং যখন সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন, তদবধি কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তাহা সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া, কোন্ নক্ষত্রে সপ্তর্ষি আছেন, তদ্দ্বারা প্রাচীনেরা গত কাল জ্ঞাপন করিতেন। পুরাণেও এই গণনাক্রম লিখিত আছে। কোন প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব বোধ হইতেছে, জ্যোতিষ-সংহিতা ও পুরাণের রচনাসময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দগণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রকৃত-সিদ্ধান্ত-রচনার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল।

---

* এই অব্দগণনক্রম বুঝা সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ বৎসরের (শক ১৮২০) যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা করা যাউক। শকাব্দ সংখ্যার সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়। অতএব ১৮২০ শক=৪২৪৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর থাকেন, এবং যুধিষ্ঠিরাব্দের প্রথমে তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অতএব তদবধি সপ্তর্ষি ৪৩ নক্ষত্র পার হইয়া ৪৪ম নক্ষত্রের ভোগ্য ১০০ বৎসরের মধ্যে ৪৬ বৎসর গত হইয়াছে। মঘা হইতে অশ্লেষা অনুলোমক্রমে ২৭ নক্ষত্র উক্ত লব্ধ ৪৩ হইতে হীন করিলে ১৬ অবশেষ থাকে। মঘা হইতে গণিয়া গেলে ১৬শ নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুনী হয়। অতএব, এ বৎসর উত্তরফল্গুনীতে সপ্তর্ষির ৪৬ বর্ষ স্থিতি গত হইয়াছে।

ভারতযুদ্ধকাল-নিরূপণ পক্ষে প্রায় সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করা গেল। দেখা গেল, উহার দুইটি সময় পাওয়া যায়, এবং সেই দুইটি সময়ের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসর অন্তর আছে। অবশ্য দুই সময়ই কদাপি সত্য হইতে পারে না। অন্ততঃ একটিতে নিশ্চয়ই ভুল আছে। এই ভুলের উৎপত্তি কি, সপ্তর্ষির গতির অর্থ কি, এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

অবশ্য বিষয়টি গুরুতর। প্রাচীনকালের গণনায় দোষ ধরাও যেমন কঠিন, বলাও তেমনই কঠিন। এ স্থলে আমাদের অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যাইবে না। সপ্তর্ষির গতি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল। শত বৎসরে এক নক্ষত্র গতি; সুতরাং শকারম্ভের পূর্ব্বে সপ্তর্ষি ২৫২৬ নক্ষত্র পার হইয়াছিলেন। মঘা হইতে অনুলোমক্রমে গণিয়া আসিলে শকমুখে সপ্তর্ষি পুষ্যাতে ছিলেন। শ্রীপতিও তাহাই বলিয়াছেন।

এ দিকে দেখা যায়, মঘা হইতে অয়ন ২৭—২৫.২৬=১.৩৪ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বকালের জ্যোতিষীরা অয়নচলন জানিতেন না। কিন্তু অয়নবেধে তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় অজ্ঞাত ছিল না। বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, পূর্ব্বকালে মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। শকারম্ভসময়ে তাঁহারা দেখিলেন উত্তরায়ণ মঘা হইতে ১.৩৩ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা ইহার বিলোমগতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বিস্ময়প্রকাশের নিদর্শন আছে। এই বিলোমগতি না জানাতেই, বোধ করি, তাঁহারা ভাবিলেন, মঘা নক্ষত্র হইতে অনুলোমক্রমে উত্তরায়ণ পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে অয়নের চলন বলা গেল। কিন্তু অয়নের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ পরে বলা গিয়াছে, কোন অতীত কালে মঘাতে উত্তরায়ণ শেষ হইত, এবং মঘা নক্ষত্রের সহিত সপ্তর্ষির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল ও এখনও আছে। সপ্তর্ষি, মঘা ও রবির উত্তরায়ণনিবৃত্তি,—তিনটিই পরস্পর সংযুক্ত ছিল। যে ধ্রুবসূত্র সপ্তর্ষি ও মঘাকে ভেদ করে, সেই ধ্রুবসূত্রই অয়নান্ত (solstitial colure) ছিল। অয়নান্ত সূত্রের চলন অজ্ঞাত, কিন্তু সপ্তর্ষি ও মঘা-গত সূত্র ঠিক একই থাকে না। অক্ষাংশভেদে সপ্তর্ষি ও মঘার উদয়াস্তের তারতম্য হয়, মঘা নামক তারা থাকিলেও মঘা নামক নক্ষত্র আছে, সপ্তর্ষিরও

সাতটি তারা একই ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত নহে। পরন্তু মরীচি হইতে ক্রতু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মঘা নক্ষত্রের অংশবিশেষের সহিত যুক্ত বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, সপ্তর্ষি মঘাতে অবস্থিত, উত্তরায়ণও মঘাতে অবস্থিত। ইহা হইতে সপ্তর্ষিরেখা ও অয়নান্ত সূত্র কালক্রমে একার্থবাচক হইবার সম্ভাবনা ছিল। অন্ততঃ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না, শাস্ত্রেও কোন অনুমান বা বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই।

অয়নান্ত সূত্র অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বা সপ্তর্ষিমণ্ডল * অঙ্গীকার করিয়া দুই একটি বিষয়ের উপপত্তি দেখা যাউক। উপরে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে মঘাতে উত্তরায়ণ হইত, শকমুখে ১.৩৩ নক্ষত্র পশ্চিমে হইত। প্রতি নক্ষত্র অয়ন পিছাইতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। সুতরাং ১.৩৩ নক্ষত্র পিছাইতে ১২৬৭ বৎসর লাগিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের সময়ে উত্তরায়ণ বা সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে ছিল। তবেই যুধিষ্ঠির শকের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ছিলেন।

আমাদের উক্ত অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বরাহ স্বসময়ে—৪২৭ শকে—উত্তরায়ণনিবৃত্তি পুনর্ব্বসুর তৃতীয় পদে দেখিয়াছিলেন। শকমুখে পুষ্যার ০.২৫ নক্ষত্র বাকি ছিল, এবং ৪২৭ শকে পুনর্ব্বসুর ০.২৫ গত হইয়াছিল। উভয়ে মিলিয়া অর্দ্ধ নক্ষত্রের অন্তর ঘটিয়াছিল। অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছাইতে ৪২৭ বৎসর অপেক্ষা কিছু অধিক হইলেও আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীয় গণনানুসারে প্রায় ঠিক। কেন না, এতদনুসারে প্রতি নক্ষত্র পিছাইতে ৮৫২ বৎসর, এবং বার্ষিক অয়নবেগ ৫৬৩ বিকলা পড়িতেছে। এই বেগ আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিগণের প্রদত্ত বেগের তুল্য।†

কিন্তু আরও কথা আছে। এতদ্দ্বারা ২৫২৬ বৎসরের উপপত্তি পাওয়া গেল না। এক্ষণে এই গণনার মূল অনুসন্ধান করা যাউক। ইহার মূল নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থের মধ্যে একটির পরিবর্ত্তে অন্যটি গ্রহণ। উপরে মঘা নক্ষত্র অর্থে ক্রান্তিবৃত্তের দশম ৮০০ কলা পরিমিত প্রদেশ লওয়া গিয়াছে। কিন্তু মঘা নক্ষত্র বলিলে মঘা তারাও বুঝায়। মঘা তারা মঘা নক্ষত্রের আদিভেও

* মণ্ডল শব্দটি জ্যোতিষে বৃত্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল বুঝিতে সপ্তর্ষি-সমূহ হইতে পারে। কিন্তু রবিমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে জ্যোতিষে গোল বুঝিয়া থাকি। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পরিবর্ত্তে কেবল সপ্তর্ষির প্রয়োগ হওয়া বিচিত্র নহে।

† এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। মৎসম্পাদিত সিদ্ধান্তদর্পণের ইংরাজি মুখবন্ধে যথেষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

অবস্থিত নহে। আমাদের অনুমানে, যে সময়ে মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন হইত, সেই অতীতকালে, নক্ষত্র শব্দের কৃত্রিম অর্থ প্রচলিত ছিল না। নক্ষত্র শব্দ দ্বারা নক্ষত্রচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা জ্যোতিষচর্চ্চার প্রথমাবস্থায় সম্ভাব্য ছিল না। তৎকালে মঘা তারা ও মঘা নক্ষত্র একার্থ-বাচক ছিল। বেদেও ব্রাহ্মণের ঋষিগণ মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন লিখিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী জ্যোতির্বিগণের মধ্যে কেহ বা উহাতে মঘা তারা বুঝিলেন, কেহ বা মঘা নক্ষত্র বুঝিলেন।

মঘা নক্ষত্র বুঝিলে যে সময় পাওয়া যায়, তাহা উপরে বলা গিয়াছে। মঘা তারার অয়ননিবৃত্তি ধরিলে কোন সময়ে আসা যায়, এখন তাহাই বিবেচ্য। দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ২৩০০ বৎসরে মঘা তারার অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। শকাব্দ ধরিলে ঐ সময় ৭৮ বৎসর অধিক হয়। বর্ত্তমান জ্ঞাত অয়নবেগ-সাহায্যে অত দীর্ঘকাল নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা দুরূহ। এতদ্ভিন্ন, উক্ত কালগণনা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের অয়নবেগ অনুসারে করা গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বীরা সেই বেগ গ্রহণ করেন নাই। কত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে দুই এক শত বৎসরের প্রভেদ ধর্ত্তব্য নহে।

আর দুই একটি কথা বলিয়া এই নীরস তত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে। জ্যোতিষসংহিতা মতে ২৫২৬ শকপূর্ব্বে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অর্থাৎ, খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। মঘা তারায় রবির অয়ন পরিবর্ত্তন হইলে আধুনিক গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দ পাওয়া যায়। আমাদের জ্যোতিষানুসারে এই গণনা করিতে হইলে মঘা তারার ধ্রুবক আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদির ধ্রুবক লইলে চলিবে না। প্রাচীনকালে প্রদত্ত ধ্রুবকের মধ্যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার বরাহ কয়েকটি তারার ধ্রুবক দিয়াছেন। তন্মধ্যে মঘার ধ্রুবক ১২৬ অংশ দেখা যায়। মঘা তারাটি উত্তরস্থ এবং ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। সুতরাং ১২৬ অংশই মঘার তাৎকালিক অপাংশ (True Iongitude) ছিল। উহা হইতে ৯০ অংশ হীন করিলে ৩৬ অংশ থাকে, এবং ইহাই পূর্ব্ব-কথিত সময়াবধি অয়নাংশ। ৭০ বৎসরে অয়ন ১ অংশ সরিয়া থাকে। এতদনুসারে আমরা শকের ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িতেছি। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মঘার উক্ত ধ্রুবক শকের প্রথম শতাব্দীতে পরিমিত হইয়াছিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গর্গ বলেন, কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, এবং শক পূঃ ৩১৭৯ অব্দে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ইহার সহিত উপরের লিখিত সময়ের ঐক্য হইতেছে না। এই প্রভেদের কারণ নিশ্চয় করা দুরূহ। তবে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপ্তর্ষি একটি তারা নহে; উহার সাতটি তারা এক ধ্রুবসূত্রেও অবস্থিত নহে। এখন এই বিষয় আলোচনা করা যাউক।

কেহ (পাকল্য) বলেন, ক্রতু দিয়া ধ্রুবসূত্র টানিতে হইবে। ক্রতু তারাটি সপ্তর্ষির সাতটি তারার পশ্চিম। গণনা করিলে দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অয়নান্ত সূত্র ক্রতু দিয়া গমন করিত। এই সময় ইতঃপূর্ব্বে আমরা অন্য উপায়েও পাইয়াছি।

বরাহ বলেন, মরীচি দিয়া ঐ সূত্র টানিতে হইবে। তিনি বা গর্গ এ কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই বটে, কিন্তু মরীচির উদয় না হইলে অন্য ছয়টি তারার প্রকাশ হয় না, কেন না, মরীচি সপ্তর্ষির সর্ব্বপূর্ব্ব ভাগে। যাহা হউক, দেখা যায়, খৃঃ পূঃ চত্বারিংশৎ শতাব্দীতে অয়নান্তসূত্র মরীচি দিয়া গমন করিত।

অধিকাংশের মতে, পুলহ ও ক্রতু দিয়া উক্ত রেখা টানিতে হইবে। পুলহ ও ক্রতু ঠিক এক ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত নহে। সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া টানিতে হইবে। এরূপ করিলে খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ সূত্রটি অয়নান্ত সূত্র ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহের মতও এই। তিনি লিখিয়াছেন, ধ্রুবসূত্রেণ যল্লগ্নৌ তদৃক্ষস্থা মহর্ষয়ঃ। কথ্যন্তে সাম্প্রতং সিংহে ভৃভুজাং ২১ শান্তয়ো হিতৌ। তবে ইহাঁর মতে সিংহ রাশির ২১ অংশে পুলহ ক্রতুগত ধ্রুবসূত্র অবস্থিত। বরাহের সময়ে ৪২৭ শকে কর্কটের আদিতে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। সিংহের ২১ অংশ হইতে কর্কটের আদিতে অয়ন পিছাইতে ৫১ অংশে ৫১×৭০=৩৫৭০ বৎসর গিয়াছিল। উহা হইতে ৪২৭ হীন করিলে ৩১৫৩ থাকে। প্রায় এই সময়ে কলির আরম্ভ হইয়াছিল। * যাঁহারা বলেন, দ্বাপর কলির সন্ধিসময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তাঁহাদের গণনার মূল এই। কিন্তু পাকল্য লিখিয়াছেন;

যুগাদৌ বিষ্ণুতারায়াঃ ক্রতুর্ভাদ্যে ব্যবস্থিতঃ।

* এখানে দৃক্‌কর্ম্মসংস্কার করা আবশ্যক। স্থূলগণনার প্রয়োজন বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

যুগাদিতে শ্রবণার আদিতে ক্রতু ছিলেন। মঘা হইতে শ্রবণার অন্তর ১২ নক্ষত্র। শাকল্যমতেও সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক নক্ষত্র। এইরূপে ১২০০ বর্ষ মাত্র পাওয়া যায়। তার পর, যুগাদি অর্থে কলিযুগাদি ধরিতে হইবে। শ্রবণাদি-গত সূত্র মঘা দিয়া যায় না, পুষ্যার অর্দ্ধাংশ দিয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, শকারম্ভে পুষ্যার প্রথম পাদে সপ্তর্ষি ছিলেন। সুতরাং যুগাদিতেও সেইখানে সপ্তর্ষিরেখা থাকিতে পারে না। অতএব মনে করিতে হইবে, শকারম্ভের পূর্ব্বেই সপ্তর্ষিরেখা ২৭ নক্ষত্র একবার ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে ২৭০০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহার সহিত যুগারম্ভকালের কতকটা ঐক্য আছে। অন্য পক্ষে, যুগাদিতে শ্রবণায় শকারম্ভে পুষ্যায় সপ্তর্ষি-রেখা থাকিলে উভয় সময়ের মধ্যে প্রায় ১৩০০ বৎসরের অন্তর ঘটে।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন-রূপে সপ্তর্ষির অবস্থিতি গণনা করিতেন; সুতরাং কোন্ মত গ্রাহ্য, কোন্ মত অগ্রাহ্য, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে সপ্তর্ষিগত সূত্র দ্বারা গণিত সাহায্যে সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনাবিশেষ। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সপ্তর্ষিগত সূত্র অর্থে অয়নান্ত-সূত্র ধরিলে অনেক উক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে আমাদের বিশ্বাস যে, সপ্তর্ষির গতি দ্বারা প্রাচীনেরা অয়নের গতি স্থূলতঃ ব্যক্ত করিতেন। কালক্রমে ঐ অর্থ পরবর্ত্তী কোন কোন জ্যোতিষী ও পুরাণকার বিস্মৃত হইয়া অর্থান্তর ঘটাইয়াছিলেন। সত্য ঘটনা চিরদিনই সত্য; অর্থান্তরবশতই সত্য অনেক স্থলে কাল্পনিক বোধ হয়।

তবে, সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারার সহিত নক্ষত্রবিশেষের যোগ কাল্পনিক। এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির শত বৎসর স্থিতি দ্বারা কেবল শত বর্ষ জ্ঞাপিত হইত। এই কৃত্রিম অর্থের মূলে অয়নান্ত কালের পরিবর্ত্তন ছিল। কালসহকারে এই অর্থও কেহ কেহ অন্যরূপ ভাবিয়া বিষয়টি অতিশয় জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু সমুদয় অর্থের সঙ্গতির চেষ্টা করিলেও ভারতযুদ্ধকাল দুইটি পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ১২শ শতাব্দী এবং ২২শ কি ২৩শ শতাব্দী। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? আমাদের অনুমানে, যদি ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা শেষোক্ত সময়েই হইয়াছিল। সেই সময়ে, যে সময়ে বেদের কতিপয় মণ্ডল রচিত হইয়াছিল, বেদের সকল না হইলেও যে সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল;

মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত এবং কৃত্তিকায় বিষুবস্
মঘা নক্ষত্রের কৃত্রিম অর্থ ধরিলে ভারতযুদ্ধকাল ও তৎসঙ্গে
নার কাল খৃঃ পূঃ ১২শ বা ১৩শ শতাব্দী হয়, স্বাভাবিক অর্থ ধরিলে
: ২২শ বা ২৩শ শতাব্দী হয়।

াদের বিবেচনায় অত পুরাকালে নক্ষত্র শব্দের কৃত্রিম অর্থ ছিল না।
যোক্ত সময় সত্য বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ গণনায় দুই
ত বর্ষের তারতম্য ধর্ত্তব্য নহে।

তঃ মহাভারতের আদি বৃত্তান্ত বহুপূর্ব্বকালের। এই আদি, শতপথ-
দৃষ্ট হয়। রমেশবাবু এ বিষয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া-
উক্ত ব্রাহ্মণে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের কেবল উল্লেখ আছে, এমন নহে। উক্ত
রচনার পূর্ব্বে পরিক্ষিৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ
রচনার কালনিরূপণ করিতে পারিলে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ
ত পারা যাইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতের যাবতীয় প্রাচীন কাল
কৃত অল্প করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা নক্ষত্র শব্দের
অর্থ গ্রহণ করিয়া অতীত কাল সংখ্যা অল্প করিয়া ফেলেন। তথাপি
সাহেবকে বলিতে হইয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতা খৃঃ পূঃ ১৭৮০—
অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ঐ তৈত্তিরীয় সংহিতা-
প্রথমে নক্ষত্রগণের নাম দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতেই কৃত্তিকা আদি
ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ক্ত আদি কুরুপাঞ্চালযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের
না করিয়া থাকিবেন। যেমন বর্ত্তমান কোন কোন বঙ্গ কবির কাব্য
মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অন্য আকার দেখিতে পাওয়া যায়;
দ্বৈপায়ন ব্যাস আদি যুদ্ধের কতখানি রাখিয়াছিলেন, কবিকল্পনায় কতখানি সৃষ্টি
রিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করা অতীব দুরূহ। তবে, যে সময়ে মহাভারত
থমে প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে নক্ষত্র শব্দের কাল্পনিক অর্থ প্রচলিত
ল। এইরূপে জানিতেছি যে, বর্ত্তমান মহাভারতোক্ত যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ
ব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই প্রবন্ধের অনেক যুক্তি মৎপ্রণীত এবং সম্প্রতি যন্ত্রস্থ "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। বস্তুতঃ প্রবন্ধটি ঐ পুস্তকের অংশবিশেষ। তাহাতে সমুদয় উক্তির প্রমাণ আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে অধিক দিলাম না।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য।

শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ।

বিগত জানুয়ারি মাসের "সুবিচারসমাগম" পত্রে শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোবিন্দ আপ্টে "শিক্ষণপদ্ধতির আদর্শ" ইতি নামধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। লেখক আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। বর্ত্তমান তিনি প্রাচীন গ্রীকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করি ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে প্রাচীন গ্রীকপদ্ধতির পরিণ ফল, এই প্রবন্ধ তাহা অবগত হওয়া যায়। আমরা এ স্থলে উহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে বালকদিগের শিক্ষার জন্য পাঠ বলাদি ছিল না। বালকের পালক, শিক্ষক ও পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। বস্তুতা শৌর্য্য সেকালে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। যুদ্ধকালে যিনি বক্তৃতা করিয়া দিগকে উৎসাহিত, উত্তেজিত ও বাহুযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহারই প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি হইত। এই কারণে ঐ কালকে সাধারণতঃ "বীরত্বশিক্ষার যুগ" (Heroic age) নামে অভিহিত করিতে পারি। রাজপুত্রগণ ও সামন্ত সর্দ্দারের পুত্রগণ ভিন্ন অপর সাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা হইত না। সেনাপতি, বিচারপতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য দেশের শাসনকর্ত্তাকেই হইত। এই কারণে যাহাতে সদসৎবিচারশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, বুদ্ধিবৈভব, বল, সাহস, তেজ ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিতে পারা যায়, রাজকুমারগণকে সেইরূপ শিক্ষা হইত। সেকালে রাজাদিগের শক্তি অপরিমিত ছিল, তথাপি তাঁহাদের ব্যবহারে বিড়ম্বরের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। স্বহস্তে হলচালনা করিতে রাজারা লজ্জা করিতেন না। রাজপ্রাসাদনির্ম্মাণকালে রাজা যিস্ত্রীর নিকট কর্দ্দমপূর্ণ হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। রাণীরা ও রাজকুমারীগণ স্বয়ং পাকনিষ্পত্তি, সূত্রকাতন ও বস্ত্রবয়নাদি করিতেন। হাতুড়ে বৈদ্য, দৈবজ্ঞ ও ভাটগণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া সমাজে হইতেন। হোমারের রচিত ইলিয়ড কাব্য হইতে গ্রীসদেশের তদানীন্তন শিক্ষা এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

বীরত্বশিক্ষার যুগ।

পরকীয়দিগের সংস্রবে ও পারসীকদিগের সহিত সংঘর্ষফলে গ্রীসদেশে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পারসীকদিগের নিকট গ্রীসীয়েরা উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও বিলাসিতা প্রভৃতি আসক্তি লাভ করে। সুতরাং অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তৎস্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাহিত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার প্রথা গ্রীক সমাজে প্রচলিত হয়। এই সময়ে শিক্ষাক্রম সাধারণতঃ যেরূপ ছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা।

জন্মাবধি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালক পিতা মাতার অধীন থাকিয়া গার্হস্থ্যশিক্ষা লাভ করিত। ৮ম হইতে ১৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যালয়ে থাকিয়া শিখিতে হইত। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসর (কেবল স্পার্টায় ৫ বৎসর) নাগরিকতা-শিক্ষার কাল। ব্যবহারশিক্ষা বা বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে আচরণ করা গ্রীক শিক্ষার শেষ ও এক প্রধান অঙ্গ। স্ত্রীলোকের শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই নামমাত্রসার ছিল। কেবল স্পার্টান ও ওলিষানগণ স্ত্রীশিক্ষা-